আমি রুশো বলছি

দি কনফেশান্‌স্‌

বাংলা রূপান্তর : সরদার ফজলুল করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যাঁ জ্যাক রুশো সপ্তদশ শতাব্দীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর একটি নিজস্ব মূল্যবোধ ছিল। মেধা ও মননের চর্চার মাধ্যমে তার প্রতভার যে বিকাশ সাধন হয়, মানবিক শুদ্ধতায় তা আমাদের শুধু বিমুগ্ধ করে না, এই বিশ্বের কল্যাণ সাধনে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। তার বিশ্বখ্যাত আত্মকাহিনী The Confession ফরাসি ভাষায় লিখছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বাংলা ভাষায় এই প্রথম অনুবাদ হলো।

যিনি এই দুঃসাধ্য কাজটি করলেন তিনি হলেন বাংলাদেশের প্রথিতযশা গবেষক ও লেখক সরদার ফজলুল করিম। রাজনীতির শিক্ষা তার যথেষ্ট ছিল, রাজনীতি করেছেনও তিনি। পাকিস্তানের কারাগারে তার বন্দিজীবন কেটেছে। রাজনীতি থেকে সরে এসে তিনি অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজটি শেষপর্যন্ত বেছে নেন। পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তিনি দর্শনের ছাত্র ছিলেন, যুক্তির দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে শিখেছেন তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন ও জগৎকে। তিনি নিজেকে মহামতি রুশোর ভূতগ্রস্ত হিসেবে পরিচয় দিতে খুব আনন্দ পেয়ে থাকেন। রুশোর এই আত্মকাহিনী দীর্ঘসময় ধরে তিনি পড়েছেন, উপলব্ধি করেছেন ও বিচার বিশ্লেষণ করেছেন- তারপর বাংলা ভাষায় লিখেছেন। রুশোর ব্যক্তিজীবন প্রচণ্ড রকম ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ছিল, তারপরও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সত্য কথাগুলো লিখেছেন। সত্য যতই কঠিন ও নিষ্ঠুর হোক না কেন, রুশোর আত্মকাহিনী আমাদের অনেক কিছু ভাবতে সাহায্য করবে। সরদার ফজলুল করিম বড় শান্তিপ্রিয় ও ধৈর্যশীল মানুষ বলেই একান্ত আপনমনে এমন একটি প্রাণবন্ত গ্রন্থের বাংলা রূপান্তর করে পাঠক হৃদয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকবেন। আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে এ গ্রন্থটি একটি অমর কীর্তি হয়ে উঠবে, এ প্রত্যাশা রাখছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জঁ্যা জ্যাক রুশো
আমি রুশো বলছি

বাংলা রূপান্তর

সরদার ফজলুল করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যাঁ জ্যাক রুশো
আমি রুশো বলছি

বাংলা রূপান্তর

সরদার ফজলুল করিম

আগামী প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১৪ জুলাই ২০০৭
প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬
প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১
প্রচ্ছদ মাসুক হেলাল
বইয়ের ব্যবহৃত ছবিগুলো ইন্টারনেটের
মাধ্যমে মূল ফরাসি গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ৬ শ্রীশ দাস সেন ঢাকা
মূল্য : ১৮০.০০ টাকা

The Confessions : by Jean Jacques Rousseau
Translated by Sarder Fazlul Karim/
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100 Bangladesh.
Second Print : July 2007
Price : Tk. 180.00

ISBN 984 70006 0086 8
984 401 949 4

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ
জ্যাঁ জ্যাক রুশো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখবন্ধ

আমি এখনো রুশোর ভূতগ্রস্ত : রুশোর ভূতে পাওয়া। কেমন করে যে কয়েকবছর পূর্বে রুশোর ভূত আমাকে আছড় করেছিল তা আমি আজো বুঝতে পারছিনে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, সেই আছড়ের আচ্ছন্নতায় প্রায় পাঁচ বছর আগে তার সোশ্যাল কন্ট্রাক্টকে বাংলায় নিয়ে আসার কাজ আমি শুরু করেছিলাম। আমাদের বাংলাদেশেই আমার আর এক বন্ধু অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ মিঞা 'সমাজ-সংঘর্ষ' নামে রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের একটি অনুবাদ তৈরি করেছিলেন। সে অনুবাদখানি বেশ কয়েক বছর আগে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও আমি রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট '৯৮/৯৯ সালের দিকে আমার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বাংলায় রূপান্তরিত করতে শুরু করি। এবং প্রখ্যাত শৈলী পাক্ষিক সাহিত্য পত্রিকাটিতে যেমন এক বছরের অধিককাল ধরে ধারাবাহিকভাবে অনুবাদটি প্রকাশিত হতে থাকে, পরবর্তী সময়ে মাওলা ব্রাদার্স : প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে 'রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' নামে অনুবাদটি পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়।

ভেবেছিলাম তারপরে আর রুশোর গায়ে হাত দেব না। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। রুশোর 'দি কনফেশনস্' আমাকে রুশো-মুক্ত হতে দিল না। কিন্তু রুশোর গায়ে হাত দিতে সাহস পাচ্ছিলাম না। রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট অনুবাদ করেও যে রুশোকে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণী তথা আমাদের নতুন প্রজন্ম পাঠকদের কাছে তেমন পৌঁছাতে পেরেছি, তা মনে করিনে। রুশোর নিজের ভাষাতেই এরূপ উক্তি আছে : 'আমাকে বোঝা অত সহজ নয়।' একথা আমি যেন কিছুটা বুঝতে পেরেছি এবং পারছি। তবু রুশোকে ছাড়তে পারছিনে।

এটি কম কথা নয় যে ২০০৩ সালের আজকের ১৮ জুলাই তারিখে ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত পকেট লাইব্রেরির সেই কনফেশন অব জাঁ জ্যাক রুশোকে আবার ডায়েরির পাতায় আমার ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে রূপান্তর করার ভূতগ্রস্ত প্রয়াস এক সময়ে দেখলাম : আমার নিজের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০ অতিক্রম করেছে এবং সামনের পৃষ্ঠাটিতে প্রথম পুস্তকের অন্তে দ্বিতীয় পুস্তকের শিরোনামটি ভেসে উঠেছে। এতদূর আসতে পারব, এমন আমি আশা করিনি। তাই এটি আমার চিন্তার অতীত। প্রায় ঝরে-পড়া নিউজপ্রিন্টের কাগজের এই কপিটি। এর প্রথম পৃষ্ঠায় উৎকীর্ণ অক্ষরে দেখা যাচ্ছে বইটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম : আজ থেকে ৪০ বছর পূর্বে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তখনকার নিউমার্কেটের একটি বই-এর দোকান থেকে।

'পকেট লাইব্রেরি : নিউইয়র্ক' প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। পুস্তক পরিচয়ে প্রকাশক পকেট লাইব্রেরি বলেছিল : দি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কনফেশনস-এর এই ইংরেজি অনুবাদটি নামহীনভাবে একজন অনুবাদকের স্বাক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে : রুশোর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে। পকেট লাইব্রেরির এই সংস্করণটির সম্পাদনা করেছেন বাল্টিমোরের গাওচার কলেজের লেস্টার জি ক্রোকার : (Lester G. Crocker.)

রুশোর 'দি কনফেশনস্'কে আমি বাংলায় অভিহিত করেছি : 'আমি রুশো বলছি' হিসেবে। আমি ফরাসি ভাষা জানিনে। ইংরেজি যাও একটু জানতাম তাও বাংলাদেশের নব্য-মার্কিনীরা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। আমার 'জীবনের চল্লিশ কি পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশে যা একটু আগ্রহ করেছিলাম তাও পাছে একেবারে স্মৃতির পট থেকে মুছে যায় সেই আশঙ্কায় এখন 'আমি রুশো বলছি' বলে রুশোর গায়ে হাত রেখেছি।

এই কর্মে আমার প্রধান ভিত্তি হয়েছে পকেট লাইব্রেরি নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে, লেস্টার জি ক্রোকার-এর সম্পাদিত 'দি কনফেশন্স্ অব 'জা জ্যাঁক রুশো' নামে প্রকাশিত গ্রন্থখানি। আমার ভাগ্য ভাল। এই গ্রন্থ আমি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগের : আজ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের চল্লিশ বছর পূর্বে।

'আমি রুশো বলছি' এই নামে বর্তমান প্রচেষ্টায় আমি রুশোকে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি। রুশোর কোনও আক্ষরিক বা অনাক্ষরিক অনুবাদ নয়, বলতে পারি মর্মানুবাদ। মর্মকে নিয়ে আসাই বড় কর্ম, অনুবাদ নয়। যে রুশো আমার কাছে এখনো মৃত নয়, বিস্মৃত নয় এবং বোধের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় নয়, তেমন এক জীবিত রুশোকে আমার প্রিয় বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রী, পাঠকবৃন্দের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছি কেবল এই সতর্কবাণীটিসহ, যেমন রুশো নিজে বলেছিল তার অবুঝ এক সঙ্গীকে : আমাকে বুঝতে হলে আগে 'রুশোর অভিধান' খানিকে তোমার পাঠ করতে হবে। রুশোর বাইরে রুশোর অভিধানকে সেকাল থেকে একালে কোনও পাঠক শত অনুসন্ধানেও পাননি। আমিও পাইনি। তার ফলে আমাদের এবং আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে যে, আসলে রুশোই হচ্ছে রুশোর অভিধান এবং সেই অভিধান বারংবার পাঠ করা ব্যতিরেকে রুশোকে যে তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না : এ সত্যে কোনও অত্যুক্তি নাই।

'আমি রুশো বলছি' আমার কথাটি যতোই অহঙ্কারমূলক বলে বোধ হোক না কেন, আমি এমন একটি কর্ম শুরু করেছি যার : যেমন কোনও পূর্বগামী নেই, তেমনি তার অনুগামীও কখনো হবে না।

'আমি রুশো বলছি' প্রথমে ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। পাঠকদের কাছে ভীষণভাবে আগ্রহ সৃষ্টি করলে গ্রন্থাকারে প্রকাশের দায়িত্ব নেন আগামী প্রকাশনী।

এ গ্রন্থ প্রকাশে যারা আমাকে শ্রম দিয়েছেন তাদের আমার ধন্যবাদ জানাই।

সরদার ফজলুল করিম
ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠকবৃন্দের প্রতি

এ গ্রন্থ পাঠে পাঠকবৃন্দ যতই বিস্মিত এবং আহত হন না কেন, এ গ্রন্থ যে কোনও উপন্যাসের অধিক। অসাধারণ এবং অনন্য এক ব্যক্তির একটি আত্মপ্রতিকৃতি। এ আত্মপ্রতিকৃতি কেবল একটি মাত্র ব্যক্তির নয়, একজন মাত্র রুশোর নয়; একাধিক এবং বহুমাত্রিক এক রুশোর : যিনি যেমনি অশিক্ষিত, তেমনি স্বশিক্ষিত, যেমন একজন দার্শনিক, তেমনি একজন প্রেমিক, রাজনীতির ভাষায় গুপ্তচরও বটে, আবার অন্যতম সঙ্গীতজ্ঞ তুলনাহীন একজন ঔপন্যাসিক। এমন এক ব্যক্তি যার কাছে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের কোনও ইতিহাসে বিশ্রুত ব্যক্তিত্বই তাদের চরিত্রের অতলে অনাবিষ্কৃত থাকেননি। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম সড়ক নির্মাতা রুশো।

রুশোর আত্মকথা বা 'কনফেশন্স' রুশোর দর্শনের অংশ নয়। তার দর্শন তার গ্রন্থসমূহের মধ্যে লাভ করা যায়। রুশোর আত্মকথা হচ্ছে রুশোর অস্তিত্ব— তার দৈহিক এবং মানসিক অস্তিত্বের প্রকাশ এবং তার দর্শনের ভিত্তিভূমি। এই অস্তিত্বেই তার দর্শন। তার দর্শন তার অস্তিত্ব থেকে অবিচ্ছিন্ন।

পাঠকদের একটিই মাত্র করণীয়। এই মানুষটিকে তার আপাদমস্তকে এবং মননে দেখা : তাকে দর্শন করা।

সরদার ফজলুল করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

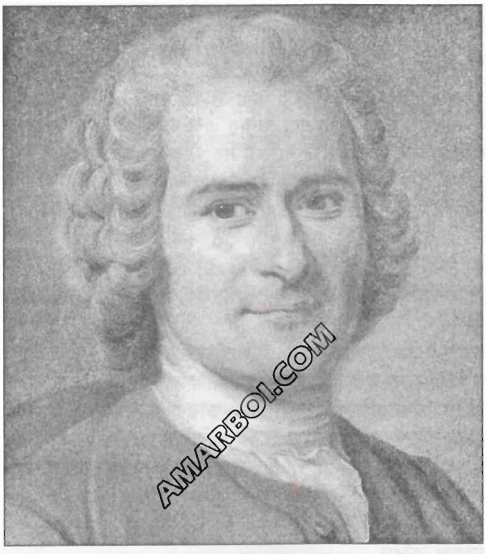
AMARBOI.COM

রুশোর জন্ম ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু ১৭৭৮ খ্রস্টাব্দে। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লবের ১১ বৎসর পূর্বে, ।

রুশো ছিলেন সুইজারল্যান্ডের এক দরিদ্র ঘড়ি নির্মাতার পুত্র। তাঁর জীবনকালের পরিধি ছিল ৬৬ বছর। এ জীবনের বৈচিত্র্যে কোনও তুলনা ছিল না। এ জীবন যেমন ছিল মহৎ, তেমনি অ-মহৎ, যেমন ছিল উত্তম, তেমনি অধম।

সাহিত্যের ইতিহাসেও রুশোর জীবন অনন্য, অনতিক্রমনীয়। কেবল তাই নয় স্বপ্নময়তার রূপকথার এমন অবিশ্বাস্য ব্যক্তি ছিলেন যে রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব সমূহের মধ্যে গণতন্ত্র থেকে সর্বস্বতন্ত্র : সর্বতত্ত্বেরই কিছু না কিছু ঋণ রয়েছে এই জ্যাঁ জ্যাক রুশোর কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম খণ্ড

প্রথম পুস্তক

[১৭১২-১৭১৯]

আমি আজ একটি কর্ম সম্পাদনে হাত দিয়েছি যার কোনও পূর্বগামী নাই এবং কোনো অনুগামী কখনো হবে না। আমার সমকালের সহযাত্রীদের সম্মুখে আমি একটি মানুষকে অনাবৃত করতে চাই : তার স্বভাবের সর্বপ্রকার সত্যতায়। এই মানুষটিকে আমি চিনি। মানুষটিকে আমি আদ্যোপান্ত জানি। সেই মানুষটি আমি নিজে। যার নাম রুশো।

আর কেউ তাকে জানে না। কেবল আমি তাকে জানি। আমার আত্মাকে আমি জানি এবং মানুষকে আমি দেখেছি। আমার অস্তিত্ব, যাদেরকেই আমি দেখে থাকিনে কেন, তাদের কারোর সদৃশ নয়। হ্যাঁ, আমি জোর দিয়েই বলব, যাদের আমি দেখেছি আমি তাদের কারোর মতো নই। কারোর মতো করে আমাকে সৃষ্টি করা হয়নি। আমি তাদের কারোর চাইতে উত্তম না হতে পারি, অন্তত আমি তাদের চাইতে ভিন্ন।

প্রকৃতি যে ছাঁচে আমাকে তৈরি করেছে, সেই ছাঁচটি আমাকে তৈরি করার পরে ভেঙে ফেলে সে কোনও অন্যায় করেছে কিংবা করেনি, তা পাঠকরা নির্ধারণ করতে পারবেন আমাকে পাঠ করার পরেই মাত্র। পূর্বে নয়।

হ্যাঁ, বিচারের দিনের কথা আমি জানি। আমি বলি শেষ বিচারের নিনাদ বেজে উঠুক। বিচারপতি আসন গ্রহণ করুন। আমি আমার দক্ষিণ হস্তে এই পুস্তকখানি তথা আমার আত্মকথাকে ধারণ করে বিচারককে নির্দ্বিধায় বলব : এই দেখ আমার কর্মকাণ্ড। আমার চিন্তারাজি তোমার সমুখে উন্মোচিত। তোমার সম্মুখে এই হচ্ছে আমার অস্তিত্ব। আমার উত্তম এবং অধম : সবকিছুকে আমি সর্বাধিক সংকোচহীনতার সঙ্গে প্রকাশ করেছি। অধম কিছুকে আমি কোনও প্রকারেই গোপন করিনি এবং আমার চরিত্রের বাইরের কোনও উত্তমকেও আমার চরিত্রে অন্তর্ভুক্ত করিনি। দু'এক সময়ে কোনও ঘটনার গায়ে যদি প্রলেপ কিছু দিয়ে থাকি তবে তার কারণ আমার স্মৃতির দুর্বলতা। যা সত্য হতে পারত তাকে হয়তো আমি সত্য বলে প্রকাশ করেছি। কিন্তু যাকে মিথ্যা বলে জেনেছি তাকে কখনো আমি সত্য বলে দাবি করিনি।

আমি যা ছিলাম তাকে আমি উন্মোচিত করেছি : একটা ক্ষুদ্র, ঘৃণ্য, মন্দ নয়, ভাল একটা প্রাণী যার অন্তরের উচ্চতা কম ছিল না। হৃদয় তার মহৎ ছিল। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বিচারপতি, তুমি তো জানো তোমার দৃষ্টিকে আমি লুক্কায়িত করিনি। আমার অন্তরের অন্ত:স্থলকে আমি আবরণহীন করেছি। বিচারপতি, তুমি আহ্বান করো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সমকালের সংখ্যাহীন সহগামীকে। তারা শ্রবণ করুক আমার আত্মঘোষণাকে। আমার পদার্থহীনতাকে তারা করুণা করুক এবং আমার অসম্পূর্ণতাকে তারা ধিকৃত করুক। এবং তার পরে তাদের প্রত্যেকে তাদের সমগ্র অস্তিত্বকে আমার সংকোচহীনতা দিয়ে প্রকাশিত করুক। তারা তাদের অন্তরের গুপ্ত গহ্বরকে তোমার সামনে অনাবৃত করুক, যেমন আমি করেছি এবং তার পরে সে বলুক, এই অধম-আমার চাইতে সে উত্তম।

আমি ১৭১২ সালে জেনেভাতে জন্মগ্রহণ করেছি। জেনেভার নাগরিক আইজাক রুশো এবং সুসেন বারনার্ডের পুত্র আমি। আমার পিতা তার পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করেছিলেন সামান্যই সম্পদ। তাদের পনেরটি সন্তানের মধ্যে তাদের সম্পদের বিতরণ শেষে অবশিষ্ট ছিল সামান্যই। আমার পিতার জীবনধারণের একমাত্র উপায় ছিল একজন ঘড়ি নির্মাতা হিসেবে তার উপার্জন। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ঘড়ি নির্মাণে তার দক্ষতা ছিল অপর সকলের চোখে প্রশংসার বিষয়। সে দিক থেকে একজন প্রটেসট্যান্ট ধর্মযাজকের কন্যা হিসেবে আমার জননীর অবস্থা কিছুটা উত্তম ছিল। আমার জননী বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং সুন্দরী ছিলেন। আমার পিতা যে তাকে বিয়ে করতে পেরেছিলেন, এটা তার ভাগ্যের কথা। আমি বলব, পরস্পরের জন্য তাদের আকর্ষণ ছিল জন্মগত। তাদের কৈশোরকে স্মরণ করে বলতে পারি তারা যখন মাত্র আট বছর বয়সের কিশোর-কিশোরী, তখন তারা দু'জনে পরস্পরের হাত ধরে ভ্রমণে বেরুতেন। দশ বছর বয়সে তারা দু'জনে হয়ে ওঠে অবিচ্ছেদ্য যুগল।

পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি এবং দু'টি আত্মার মিলন তাদের উভয়ের মধ্যে একটা শক্তিবোধের সৃষ্টি করে। তাদের মিলনের পথে বাধা তাদের মিলনের আকর্ষণকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলে। আমার পিতা তার আরাধ্যকে লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে বেদনায় ভেঙে পড়েন। আমার জননী এমন অবস্থায় বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে তাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করতে বলেন। আমার পিতা জননীর এই পরামর্শ গ্রহণ করলেও তার প্রেমিকাকে ভুলে থাকতে অক্ষম হন এবং অচিরে তিনি অধিকতর প্রেমের আবেগে তাড়িত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পিতা প্রত্যাবর্তন করে তার প্রতি তার প্রেমাস্পদকে অনুগত দেখে তার প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করেন এবং পরিণামে তারা পরস্পরের প্রতি জীবনভর আনুগত্যের শপথে গিয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

আমার মায়ের অপর এক ভাইয়ের নাম ছিল গেব্রিয়েল বারনার্ড। তিনি আমার পিতার এক ভগ্নীর প্রেমে পড়েন এবং তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেন। আমার পিতা তার এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন কেবল এই শর্তে যে, আমার পিতার ভগ্নীর এক ভাই আমার জননীর এক বোনকে বিয়ে করতে সম্মত হবেন। তাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা পারিবারিক এই বন্ধনকে সহজ করে তোলে এবং এই দু'টি বিয়ে একই দিনে সম্পাদিত হয়। এমনিভাবে আমার পিতৃব্য আমার মাসির স্বামীতে পরিণত হন এবং তাদের সন্তানরা আমার সঙ্গে দু'টি সূত্রেই আত্মীয়তে পরিণত হন। বছর শেষে তাদের উভয়েরই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা আবার বিবাহ বিচ্ছেদে আলাদা হয়ে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পিতৃব্য বারনার্ড পেশায় ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি সম্রাটের সরকারে চাকরি গ্রহণ করে হাঙ্গেরীতে রাজকুমার ইউজেনীর অধীনে নিযুক্ত হন। বেলগ্রেডের অবরোধের ক্ষেত্রে আমার পিতৃব্য একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। আমার পিতা আমার একটি অনুজের জন্মদান করে কনসট্যান্টিনোপল-এর উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি তুরস্কের সুলতানের অধীনে একজন ঘড়ি নির্মাতার চাকরিতে নিযুক্ত হন।

আমার পিতার অবর্তমানে আমার জননীর বুদ্ধি এবং সৌন্দর্য তার চারপাশে একাধিক অনুরাগীকে আকৃষ্ট করে তোলে। এদের মধ্যে জেনেভায় অবস্থানরত ফরাসি প্রেসিডেন্ট মশিয়ে দ্যা লা ক্লোজার আমার জননীকে লাভ করার জন্য অদম্য হয়ে ওঠেন। আমার জননীর জন্য এই ভদ্রলোকের প্রেমের গভীরতাকে আমার স্বীকার করতে হয়। কারণ এর ত্রিশ বছর পরেও তিনি যখন আমার জননীর কথা স্মরণ করেছেন তখন তার জন্য যথার্থ আবেগে তাকে আমি আপ্লুত হতে দেখেছি। এসব প্রেমিককুলকে প্রতিরোধে আমার জননীর পবিত্র বুদ্ধিমত্তা এবং সাহস আমি আজও স্মরণ না করে পারিনে। এই ঘটনা আমার পিতার জন্য তার ভালবাসার গভীরতাকে প্রমাণিত করে। আমার জননী অবশেষে এই সঙ্কটের কারণে আমার পিতাকে অবিলম্বে জেনেভায় প্রত্যাবর্তন করার তাগিদ দেন। আমার পিতা তার সেই পরামর্শে বিদেশে তার সব কিছুকে পরিত্যাগ করে আমার জননীর কাছে প্রত্যাবর্তন করেন। তার এই প্রত্যাবর্তনেই আমার জন্ম ঘটে। আমি বলি পিতার প্রত্যাবর্তনে দুঃখভরা এক সন্তানের জন্ম, পিতার প্রত্যাবর্তনের দশ মাস অন্তে একটি দুর্বল শিশুর জন্ম এবং তার জননীর মৃত্যু ঘটে। আর আমি তাই বলি : আমার জীবনের শত দুর্ভাগ্যের প্রথম দুর্ভাগ্যটি ছিল আমার জন্ম।

আমার বাবা কেমন করে তার এই শোককে ধারণ করেছিলেন, তা আমি জানিনে। এ কথা তিনি কোনওদিন আমাকে বলেননি। কিন্তু আমি জানি, এ শোক তার জন্য দু:সহ হয়েছিল। তিনি আমার মধ্যে যেন তার স্ত্রীকে খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু একথাও তিনি ভুলেননি যে, আমিই তার স্ত্রীকে হত্যা করেছি। যখনি তিনি আমাকে কোলে তুলে নিয়েছেন, আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন তখনি আমি বুঝতে পেরেছি আমাকে তার আদরের মধ্যে তার মনের একটা তিক্ত স্মৃতিকে তিনি ধারণ করে চলেছেন। কিন্তু তার এমন অনুভূতির সঙ্গে আমার প্রতি তার আদর আরও গভীরভাবে আমি বোধ করেছি। আমার বাবা হঠাৎ বলতেন : জ্যাকি, এসো আমরা তোমার মায়ের কথা বলি। আমি জবাবে বলতাম, বাবা, তাহলে তুমি যে কেঁদে ফেলবে, আমার যে কান্না পাবে। এবং সত্যিই এই কথায় আমাদের দু'জনের চোখেই জল জমে উঠত। বাবা তখন বলতেন : জ্যাকি, তুই তোর মাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দে। পারিসনে? তোর মার শূন্যতাকে তুই ভরে দে। তোকে যদি আমি কেবল আমার পুত্র বলে ভাবতাম, তাহলে কি তোকে আমি এমন করে আদর করতে পারতাম!

আমার মাকে হারাবার চল্লিশ বছর পরে আমার বাবা যখন মারা গেলেন তখন তার মাথা তার দ্বিতীয় স্ত্রীর কোলেই ছিল। তবু একথা সত্য, তার সেই মৃত্যুর মুহূর্তেও আমার মায়ের নামটিই তার ওষ্ঠাধরে মৃদু শব্দে উচ্চারিত হচ্ছিল। তার বুকের গভীরে ছিল আমার মায়ের ছবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার অস্তিত্বের এমনি ছিল শেকড়। আমার জনক জননী। ঈশ্বর তাদের যত সম্পদে ভূষিত করেছিলেন তার মধ্য থেকে তারা আমাকে দান করে গিয়েছেন সে হচ্ছে একটি মমতাভরা মন। এই মমতার মধ্যে তারা তাদের সুখ এবং আনন্দ লাভ করেছেন। আর আমি লাভ করেছি আমার সকল দুর্ভাগ্যকে।

জন্মকালে আমার বেঁচে থাকারই আশা ছিল না। মৃতপ্রায় এক শিশু জন্মেছিল আমার হতভাগ্য জননীর কোলে। জন্মতেই আমি লাভ করেছি অসন্তোষের বীজ। আমার অস্তিত্বের এই বীজই সময়ের স্রোতকে শক্তিমান করে তুলেছে। আমায় যদিও বা সে মুহূর্তের জন্য স্বস্তি দিয়েছে তো পরের মুহূর্তেই সে আমাকে তীব্রতরভাবে দগ্ধ করেছে। আমার বাবার এক মমতাময়ী বোন আমাকে এমন যত্নে লালন করল যে তার সেই যত্নের কারণেই আমার জীবন রক্ষা পেল। আমি বেঁচে রইলাম।

আর আজ যখন আমি এই স্মৃতির কথা লিখছি তখনও তিনি বেঁচে আছেন। এখন তার বয়স আশিতে পৌঁছেছে। তার এখনকার যত্নের পাত্র হচ্ছে তার অসুস্থ স্বামী, যার বয়স তার চেয়ে বেশ কম এবং যে অত্যধিক মদ্যপানে নিজেকে প্রায় নি:শেষ করে এনেছে।

আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমার স্নেহময়ী মাতৃসম পিসীমাকে সম্বোধন করে বলি : পিসী, একদিন যদিও আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তোমাকে অভিযুক্ত করেছি, আজ আমি আমার সমস্ত অভিযোগ থেকে তোমাকে মার্জনা করে দিচ্ছি, আমার সকল কৃতজ্ঞতাসহ। আমার কেবল দুঃখ এবং অনুতাপ এই যে, আমার জীবনের সূচনায় যে মমতায় আমাকে সিক্ত করে দিয়েছিলে, তোমার জীবনের সায়াহ্নে তার কোনও প্রতিদান দিয়েই আমি তোমার ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারছিনে। আমার শৈশবে যে সেবিকা আমাকে আন্তরিকভাবে সেবা করেছিলেন তিনি আজো সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে আছেন। তার নাম জ্যাকুলিন। আমার আজ এই আনন্দ, যিনি একদিন একটি শিশুর চোখের পাতা উন্মুক্ত করেছিলেন তিনি তার সেই হাত দিয়ে আমার মৃত্যুতে আমার চোখের পল্লবকে তিনি মুদিত করে দিতে সক্ষম হবেন।

নিশ্চয়ই চিন্তার আগে আমার অনুভূতি এসেছিল। আমি বলতে পারি এক্ষেত্রে অপর কারোর চাইতে আমার ক্ষমতা অধিক ছিল।

পাঁচ-ছ'বছরের আগে আমার ধারণা হয়নি, কী আমি করছি বা না করছি। আমি জানিনে কেমন করে আমি পড়তে শিখলাম। একেবারে গোড়ার দিকে আমার মনের ওপর আমার পাঠের স্মৃতি কিছুটা ভেসে ওঠে। তখন থেকেই আমার চেতনার সঞ্চার।

আমার মা তার প্রেমময় জীবনের কিছু কথা রেখে গিয়েছিলেন। এবার পিতা-পুত্র আমরা দু'জন নিত্য রাতে খাবার শেষে তার সেই স্মৃতি পড়তে শুরু করলাম। প্রথমটাতে এটার শুরু হয়েছিল এভাবে, যেন বাবা আমাকে পাঠ শেখাচ্ছেন। তার জন্য আমার কাছে মজার মজার গল্প বলতেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে আমরা দু'জনেই ব্যাপারটাতে এত মজা পেতে লাগলাম যে, সারারাতই আমাদের কেটে যেত। আমরা কেউ থামতে পারতাম না। একবার আমি পড়তাম। তারপরে বাবা। তারপরে আবার আমি। মায়ের পুরো লেখাটা শেষ হওয়ার আগে আমরা থামতেই পারতাম না। অনেক সময় রাত শেষ হয়ে যেত। ভোরের পাখি ডেকে উঠত। বাবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন লজ্জা পেতেন, 'দেখছিস ভোর হয়ে গেছে, আয় এবার আমরা থামি।' আসলে তার চাইতে আমিই বেশি ছেলে মানুষ!

মোট কথা এভাবে আমি কেবল যে পড়তে শিখলাম, তাই নয়। আমার পাঠে কোনও আড়ষ্টতা থাকত না। তার চেয়েও অধিক। ঐ বয়সে আমার যা বোঝার কথা নয়– তাও যেন আমি বুঝতে পারছিলাম। অদ্ভুত এক আবেগ।

যা পড়ছি তার ভেতরটা যে আমি বুঝতাম, তা হয়তো নয়। তথাপি বাস্তব জীবনের অনুভূতিটা যেন আমাকে আপ্লুত করত। চিন্তা দিয়ে হয়তো আমি কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনার অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করত। একটার পর একটা অনুভূতি যে আমার যুক্তির বোধকে আলোকিত করত এমন নয়। যুক্তির ক্ষমতা তখনও আমার মধ্যে আসেনি। কিন্তু এগুলো আমার মনের ওপর একটা ছাপ ফেলতে লাগল। এর মধ্য দিয়ে জীবনের যেন এক আবেগপূর্ণ চিত্র জন্ম নিতে লাগল। এই আবেগ থেকে জীবনে আর আমার মুক্তি ঘটেনি।

[১৭১৯-১৭২৩]

বলতে পারি এমন আবেগের যেন শেষ হলো ১৭১৯-এর গরমকালে। এতদিনে আমার মায়ের বই-এর রাজ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার শুরু করলাম আমরা মায়ের বাবার কাছ থেকে পাওয়া বই-এর জগৎ। এবং তার দিয়ে যাওয়া বই-এর রাজ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ বই-এর কোনও অভাব ছিল না। অবশ্য এটি অসম্ভব ছিল না। কারণ বই-এর এই সম্ভারটি সংগ্রহ করেছিলেন উর্ধ্বতন এক রাজকর্মচারী। তিনি কেবল একজন কর্মচারী ছিলেন না। তিনি যথার্থই একজন শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। তার বুদ্ধি এবং অনুধাবন ক্ষমতা ছিল যথার্থই উঁচু দরের।

তার এই সংগ্রহের মধ্যে ছিল 'গির্জা এবং সাম্রাজ্যের ইতিহাস'। এর রচনাকারী ছিলেন লা স্যুর। ছিল বুসেতের রচিত 'সমগ্র সভ্যতার এক ইতিহাস'। ছিল প্লুতার্কের রচিত 'বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের জীবনী।' ছিল ননী রচিত ভেনিসের ইতিহাস। ওভিডের মেটামরফোসিস। লা ব্রুয়ারের বিশ্ব। তাঁরই 'মৃতের সংলাপ' নামে এক গ্রন্থ এবং মলিয়েরের কয়েকটি খণ্ড। এসব গ্রন্থ বাবার ঘরে এনে স্তূপ করা হলো। আর বাবা যখন কাজ করতেন আমি তখন তাকে শুনিয়ে এই বই-এর রাজ্য থেকে এ বই, সে বই পাঠ করে শোনাতাম। এর মধ্য দিয়েই আমার মধ্যে যেন আমার বয়সের অধিক একটা বোধের জন্ম হতে লাগল। এর মধ্যে প্লুতার্কের প্রতি আমার একটা বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। প্লুতার্ক থেকে পাঠের পরে পাঠ আমাকে যেন আমার এতদিনের স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তব জগতে বার করে আনল। ফলে এবার আমার জীবনের নায়ক হয়ে উঠতে লাগল এগোসিলাস, ব্রুটাস, অ্যারিসটাইডিস, অরনডেটিস আর আরটামেলিস এবং জুবা। এরাই হয়ে উঠল আমার আরাধ্য। এ এক আশ্চর্যকাহিনী। আমার পিতার সঙ্গে এই সব গ্রন্থের পাঠের ওপর সংঘটিত সংলাপ আমার মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক বোধের সৃষ্টি করে তুলল। যেন আমার মধ্যে একটা দুরারোধ্য ব্যক্তিত্বের জন্ম হলো যার কাছে দাস এবং দাসত্বের চিন্তা একেবারে অচিন্তনীয় হয়ে উঠল। আর তাই দাসত্ববোধক কোনও ভাবনা আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেবেলায় রুশোর বইপড়া

জীবনে আমি কখনও কল্পনা করতে পারিনি। আমি যেন প্রত্যক্ষ করলাম নিজের পদচারণাকে রোম আর এথেন্সের মহামতিদের মধ্যে। এমন বোধে আমার কোনও অসুবিধা হয়নি। কারণ আমি ছিলাম একটা স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে জন্মলাভ করা মানুষ। আমার বাবা ছিলেন এমন এক দেশপ্রেমিক যার দেশপ্রেম ছিল তার গর্বের বিষয়। আমার পিতা আমার এক আরাধ্য পুরুষ হয়ে দাঁড়ালেন। আমি কল্পনা করলাম যেন আমি সেকালের একজন গ্রীক কিংবা রোমান। অতীত ইতিহাসের কুশীলবদের জীবনী পাঠ করতে করতে আমার নিজের অস্তিত্বকে বিস্মৃত হয়ে সেই বিস্ময়কর চরিত্রসমূহের মধ্যে আমি লীন হয়ে যেতাম। এই সব চরিত্র পাঠ করতে করতে আমার পাঠের ক্ষমতার বৃদ্ধিতে আমি নিজেই বিস্মিত হতে লাগলাম। অনেকের জীবন কাহিনীতে মাঝে মাঝে আমার চোখের পাতা ভিজে উঠত। আর কণ্ঠের আওয়াজ একটা যেন দৃঢ়তা পেত। একদিন স্কাভোলার ইতিহাস পাঠ করতে করতে আমি যখন তার জীবন নিয়ে অভিনয় শুরু করলাম তখন সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। আমি তখন আমার কল্পিত চরিত্রের দৃঢ় হস্তের ধ্বংস ক্রিয়া প্রদর্শনে ব্যস্ত ছিলাম।

আমার একটা ভাই ছিল। আমার চাইতে সাতবছরের বড়। ও আমার বাবার কাজে সাহায্য করত। তার কাছ থেকে কাজের শিক্ষা নিত। কিন্তু আমার ওপর পিতার স্নেহের আধিক্য আমার ভাইয়ের প্রতি কিছুটা অবহেলা যে সৃষ্টি করত না তা নয়। বাবার এই দিকটি আমার পছন্দ হতো না। তার প্রতি অবহেলা তার শিক্ষার দিকটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ফলে বয়সের আগেই সে ভালর চাইতে মন্দ হয়ে উঠল। তার তত্ত্বাবধানকারী শিক্ষককে পরিবর্তন করা হলো। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হলো না। বাড়ি থেকে যেমন সে পালিয়েছিল, এই শিক্ষকের কাছ থেকেও সে পালাতে লাগল। ফলে ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎই ঘটত না। ও যেন আমার কাছে অপরিচিতই রয়ে গেল। কিন্তু ওর জন্য আমার ভালবাসার শেষ ছিল না। ও নিজে ভবঘুরে হলেও, আমার জন্যও ওর ভালবাসার অন্ত ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে আছে, একদিন বাবা যখন রেগেমেগে ওকে বেদম বকুনি দিচ্ছিল আমি তখন ওদের দু'জনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ভাইকে আমি জড়িয়ে ধরেছিলাম। ফলে বাবার দেয়া মারগুলি ওর গায়ে না লেগে আমার গায়ে পড়ছিল। তবু আমি ওকে ছাড়ছিলাম না। ফলে শেষ পর্যন্ত বাবা ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। আমার নিজের কান্না ও চিৎকারে বাবা যেন ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু তারপরে আমার সেই ভাইটি কোথায় যে চলে গেল, আর আমরা খুঁজে পেলাম না। কিছুদিন পরে আমরা শুনেছিলাম যে সে জার্মানিতে চলে গেছে। কিন্তু ওর কাছ থেকে কোনওদিন আমরা একটি পত্রও পাইনি। আর তাই আমি বলতে পারি : আমার বাবার একমাত্র পুত্র আমি।

আমার ভাইয়ের অনাদরের স্মৃতি আমার বুকে বাজে। কিন্তু আমার কোনও অনাদর ঘটেনি। বরং আমি বলি, আমার কৈশোরে একজন রাজপুত্রের অধিক যত্ন লাভ করেছিলাম। চারপাশের সকলেই আমাকে ভালবাসত। আমাকে কেউ খারাপ বলত না।

আমার পিতার কাছ থেকে চলে আসার আগে রাস্তায় সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে ছুটে বেড়ানো আমার জন্য একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। আমার ওপরে অন্য কোনও ছেলের অনাচার কখনও ঘটেনি। আসলে যাদের আমরা দুষ্টস্বভাবের ছেলে বলি তারা স্বভাবগতভাবে যে দুষ্ট এমন নয়। তাদের চরিত্র যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে সে তাদের স্বভাবের জন্য নয়, সে তাদের শিক্ষার জন্য।

অবশ্য আমারও যে বয়সের দোষ ছিল না, তা নয়। আমি যে কিছুটা বাকওয়াজ ছিলাম একথা সত্য। খাবার বেলায় লোভী আর মিথ্যায় ওস্তাদ। অন্যের গাছের ফল বা কোনও খাদ্য যে চুরি করিনি, তা নয়, কিন্তু কারোর কোনও ক্ষতি করেছি এমন আমার মনে পড়ে না। বোবা পশুকে আমি কখনও আঘাত করিনি।

তবে আমাদের পাশের বাড়ির এক মেমসাহেবের একটা সসপ্যানের মধ্যে যে আমি পেশাব করে দিয়েছিলাম, এ কথা সত্য। মাদাম ক্লটের সসপ্যান। সে তখন গির্জায় গিয়েছিল। সেটা আমার জন্য একটা সুযোগ ছিল! ঘটনাটা এখনও স্মৃতিতে এলে আমি না হেসে পারিনে। তবে ভদ্রমহিলার আর কোনও দোষ না থাকলেও সে যে একজন ভয়ানক রকমের ছিচকাঁদুনে ছিল এতে কোনও সন্দেহ নেই। আমার কিশোরকালের গুণাবলীর এমন তালিকাটিতে কোনও মিথ্যা নাই।

আসলে খারাপ হওয়ার আমার উপায় ছিল না। আমার চারদিকে আমি উত্তম ছাড়া অধম লোকের সাক্ষাৎ পাইনি। আমি বলি তারা সবাই ছিল পৃথিবীর মহত্তম মানুষ। আমার পিতা, আমার মাসি, পিসি বা মাসি, আমার দাই-মা, আমার আত্মীয়-স্বজন, আমার বন্ধু-বান্ধব, আমার পাড়া-প্রতিবেশী এবং আমার চারপাশের সবাই। না, তারা যে আমার হুকুমদার ছিল তা নয়। কিন্তু তারা সকলে আমাকে ভালবাসত। আমিও তাদের ভালবাসতাম। কোনও আঘাতের জন্য কেউ আমাকে উত্তেজিত করেছে, এমন কথা আমি বলতে পারিনে।

এই স্মৃতির কথা যখন আমি বলছি, তখন আমি বৃদ্ধ। আজ আমার উদ্বেগ-অস্থিরতার শেষ নাই। কিন্তু সেই আত্মীয়-স্বজনের কণ্ঠ যখন আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে তখন আজকের এই বৃদ্ধ আবেগাপ্লুত কান্নায় ভেঙে পড়ে। অপরের কাছে অবিশ্বাস্য হলেও এ সত্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সেদিনের আমার প্রিয় কাকীমার গীত একটি গানের দু'একটি শব্দ বা সুর যে আমার স্মৃতিতে আটকে আছে তার এই আকর্ষণ আমার কাছেও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

মাদাম লামবার সিয়েরের কথা বললে বলতে হয়, তিনি আমাদের সবাইকে যেমন স্নেহ করতেন তেমনি আমাদের ওপর তার কর্তৃত্বও কম ছিল না। সে কর্তৃত্ব প্রয়োজনে দৈহিক নির্যাতনেও প্রকাশ পেত। তার হুমকিধামকির পরিধি ছাড়িয়ে ক্রমান্বয়ে বাস্তবে রূপ নিতে লাগল। কিন্তু আমার ওপর তার নির্যাতনের একটা প্রতিক্রিয়া এই হলো যে, তার অত্যাচার আমার কাছে উপাদেয় বলে মনে হতে লাগল। প্রত্যেকটি মারের পরে আমি তার পরের মারটির প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে থাকতাম। যে কাজ করলে মার খেতে হবে, আমি যেন সেই কাজ করতে অধিক আকৃষ্ট বোধ করতাম। তার কারণ তার হাতের মারের মধ্যে আমার দেহের মধ্যে যেন এক কৈশোরসুলভ যৌন অনুভূতির সৃষ্টি হতো। ফলে তার হাতে মার খাওয়ার চিন্তায় আমার মনে ভয়ের চাইতে মার খাওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি পেত। যে কাজে মার খাওয়ার আশঙ্কা সে কাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার বদলে সেই কাজ করার আকর্ষণ সৃষ্টি হতো।

আমার জীবনের প্রবেশকালে এগুলোই ছিল আমার মনের আবেগ। এগুলোর প্রকাশই আমার চরিত্রের মধ্যে যেমন গর্বোদ্ধত ভাব, তেমনি আমার একটা কোমলতাকেও সৃষ্টি করেছিল। আমার চরিত্রে ভাই যেমন তৈরি হয়েছিল একটা নারীসুলভ কমনীয়তা, তেমনি আবার সৃষ্টি হয়েছিল একটা দুর্বিনীত ঔদ্ধত্যও। ফলে এই দুই বিপরীত আবেগের মধ্যে আমি সারাজীবন দোল খেয়েছি। কখনো কাদার মতো নরম, আবার সাহসের পরাকাষ্ঠা। তাই আমার চরিত্রে যেমন সঙ্গতিহীনতারও প্রাবল্য আছে তেমনি আছে সংযমের, আবার আনন্দভোগের আকাঙ্ক্ষা। আবার বিচক্ষণতার প্রকাশও যে ঘটত না তাও নয়।

আমাদের পরিবারের ছোটদের জন্য এই মাদামসেল লামবারসিয়েরের মায়ের ভালবাসা ও স্নেহ যেমন ছিল, তেমনি প্রয়োজনে তিনি আমাদের দণ্ড দিতেও কসুর করতেন না। কোনও কোনও সময়ে হয়তো তিনি ধমক দিয়েই ক্ষান্ত হতেন। কিন্তু গোড়ার দিকে তার ধমক তেমন মিষ্ট ছিল না। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটার একটা মজার দিক ছিল। আমি যত মাদামের হাতে মার খেতাম তত তার হাতের মারের জন্য আমার লোভ যেন বৃদ্ধি পেত। তিনি আমাকে যত মারতেন আমি যেন তাকে ততো বেশি ভালবাসতে লাগলাম। যে কাজ করলে তার হাতের মার খেতে হবে না তা না করার চাইতে, তা পুনরায় করার প্রতি আমার আকর্ষণ বাড়তে লাগল। আসলে এর পেছনে যেন একটা যৌনতা বোধের ব্যাপার ছিল। কারণ বাড়ির অপর কেউ আমাকে মারলে এমন আনন্দ পেতাম না, যে আনন্দ মাদাম আমাকে মারলে পেতাম। আমার ওপর তার নির্যাতনকে আমি মনে করতাম ভালবাসা। ফলে, মাদাম এতদিন যাকে অপরাধ মনে করতেন, আমি বেপরোয়া হয়ে সে অপরাধগুলোই করতে লাগলাম। কয়েকদিন পরে দেখলাম, মাদাম যেন ব্যাপারটা কিছুটা টের পেয়েছেন। তিনি বুঝতে পারছেন, তার মারে কোনও ফল হচ্ছে না। উল্টো তার হাতের ব্যথাই বাড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতদিন আমি ছোটদের সাথে রাতের বেলাতেও মাদামের ঘরে ঘুমাতাম। একবার তার বিছানাতেও শুয়েছিলাম।

কিন্তু এর দু'দিন পরে হুকুম হলো, তোরা আর এক ঘরে শুবি, আমার ঘরে নয়। এই হুকুমের পর থেকে আমার প্রতি মাদামের ব্যবহারের আর একটা দিকও আমার নজরে এল। এবার তিনি আমাকে বালকের বদলে 'বয়স্ক' পুরুষ বলেই যেন বোধ করতে লাগলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে মন্দ বোধ হলো না। এটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, তবু সত্য যে, আমার বয়স তখন আট আর মাদামের বয়স চব্বিশ। আর এই অদ্ভুত সম্পর্ক আমার নিজের রুচি, আমার যৌনবোধ সবকিছুর ওপরই আমার সারা জীবনের জন্য যেন একটা পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তবে এটা ঠিক যে আমার অনুভূতি একবার জাগ্রত হলেও আমার কিশোর বয়সের অধিক কোনও আচরণ আমি মাদাম লামবার সিয়েবের সঙ্গে সম্পন্ন করার চেষ্টা করিনি। কিন্তু একথাও ঠিক যে সেই সময় থেকে বহুদিন পর্যন্ত কোনও তরুণীর দৃষ্টিতে আমার দেহ বেশ তপ্ত হয়ে উঠত। এর একটা জ্বালাও আমি আমার শরীরের ভেতর বোধ করতাম। অনেকদিন যাবৎই এই ব্যাপারটা আমার মধ্যে ঘটছিল। তখন থেকে যে-কোনও তরুণীই আমাকে আকৃষ্ট করত। তারা দৈহিকভাবে আমার নিকটে না থাকলেও কল্পনায় তাকে নিয়ে আমার ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে আমার বাঁধত না। যাদের দেখতাম তাদের প্রত্যেককেই আমি একজন মাদাম লামবারসিয়ার বলে কল্পনা করতাম।

এরপর আমার বয়স বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমি বয়:প্রাপ্ত হলাম। তবু আমার বাল্য ব্যবহারে কোনও পরিবর্তন ঘটল না। এ এক ধরনের বিকারে পরিণত হলো, তবে আমি দৈহিকভাবে কোনও অনৈতিক আচরণে লিপ্ত হয়েছি এমন কিছু আমি মনে করতে পারছিনে। বাইরে থেকে দেখলে আমার আচরণে কোনও অভদ্রতা প্রকাশ পেত না। আমার তিন মাসি-পিসি তাদের আচার আচরণ দস্তুর মতো আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। সেকালে তাদের মতো আদর্শ প্রশংসার পাত্রী খুব দেখা যেত না। মেয়েদের ব্যাপারে আমার পিতার ব্যবহারও ছিল আদর্শ। মেয়েদের মধ্যে কাউকে ভালবাসলেও অপরদের সামনে তিনি এমন কোনও শব্দ উচ্চারণ করতেন না যে শব্দ তার দম্ভকে লজ্জার রঙে রঞ্জিত করে তুলত এবং আমাদের পরিবারে ছোটদের আচরণ যেভাবে ভদ্র এবং প্রশংসনীয় করার চেষ্টা করা হতো তেমনটা অন্য পরিবারে দেখা যেত না। এ ব্যাপারে মাদাম লামবারসিয়েরও খুবই সতর্ক ছিলেন। একবার এমনও ঘটেছিল যে বাড়ির একটি উত্তম ভৃত্যকে তিনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। কেবল এই অপরাধে যে সে আমাদের সামনে একটা অসভ্য শব্দ উচ্চারণ করেছিল। আমি নিজে যৌবনে পা দেয়ার পূর্বে যৌনমিলন সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই তৈরি হয়নি। এই ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত বলেই বোধ হতো। সাধারণ পতিতা আমার মনে সারা জীবনই একটা বিরাগবোধের সৃষ্টি করেছে। নষ্ট চরিত্র বা লোচ্চামি বলে যে আচরণ অভিহিত হয় তাকে সব সময়ে আমি ঘৃণ্য বলে মনে করছি। যাকে আমরা লাম্পট্য বলি তার ওপরও ঘৃণা ছাড়া অপর কোনও বোধ আমার মনে সৃষ্ট হয়নি। এই ঘৃণার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। একবার আমি একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'পাশের দেয়ালের মধ্যে কতগুলো গর্ত দেখতে পেয়েছিলাম। পাশের লোকজন এ গর্তগুলোকে পুরুষের যৌনক্রিয়ার গর্ত বলে অভিহিত করেছিল। তাতে আমার মনের ঘৃণা তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। আর তাই এমন কর্মের প্রতি কখনও কোনওদিনই আকর্ষণ বোধ করিনি। এই সমস্ত কথা চিন্তা করলে আমার চোখের সামনে কুকুর-কুকুরীর যৌন সঙ্গমের দৃশ্য ভেসে উঠত। আর তাতে আমার ঘৃণাবোধই সৃষ্টি হতো, কোনও আকর্ষণ নয়।

যৌন উত্তেজনার যে অভিজ্ঞতা আমার কৈশোরেই ঘটেছিল তার একটা ফল এই হয়েছিল যে আমার শরীরে যৌন-উত্তেজনার উদ্রেকের কোনও আধিক্য ঘটেনি। আমার এই অভিজ্ঞতার কারণে আমার দেহে যৌনদাহ জাগ্রত হলেও আমি আমার কল্পনাকে একটা প্রশান্তিতে নিয়ে আসতে সক্ষম হতাম। এবং চরম কোনও দৈহিক অবস্থাতে যাওয়া থেকে আমি নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারতাম।

আমার সেই বয়:সন্ধিতে যৌন-উত্তেজনার উদ্ভব যা ঘটেছিল তা আমাকে মারাত্মক কোনও লজ্জাকর পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে পারেনি। এর কারণ মাদাম লামবারসিয়েরের আচরণ। তিনি আমার সঙ্গে তার দৈহিক সম্পর্ককে কোনও উদ্দামতাতে কখনও নেন নি। তার ফলে আমার বয়:বৃদ্ধিতে আমি যখন পুরুষে পরিণত হলাম তখনো যা আমাকে দুঃখজনক ঘটনাতে নিয়ে যেতে পারত আমি তা থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। আমার কৈশোরের সেই অনুভূতি থেকে আমি কখনও মুক্ত হইনি। একদিকে আমার মধ্যে যৌন-অনুভূতির জন্য প্রবল উন্মাদনা এলেও যৌনক্ষুধা আমাকে অস্থির করেনি। মেয়েদের ব্যাপারে আমার মধ্যে একটা সঙ্কোচের ভাব থাকত। ফলে দেহের মিলনের চরম কোনও অবস্থার কথা যেমন আমি পুরুষ হিসেবে কল্পনা করতে পারতাম না তেমনি কোনও মেয়েও আমার মধ্যে তেমন কোনও বোধ বা কল্পনা জাগ্রত করতে পারত না। ফলে আমার জীবনে আর্তি থাকলেও, যাদেরকে সর্বাধিক ভালবেসেছি তাদের জন্য কামনা বোধ করলেও যাকে যৌন সংলাপ বলে তেমন কোনও প্রকাশ মেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপে ঘটেনি। আবার যৌন চিন্তা প্রকাশে আমার স্বভাবসুলভ সংকোচ ছিল, ফলে যৌন সম্পর্ক বিষয়ে আমার চিন্তা কোনও মেয়ের প্রতি আর্তিকে ভদ্র আচরণের বাইরে আমাকে কখনও নিয়ে যেতে পারেনি। পরস্পরের দৈহিক সম্পর্ক এবং নৈকট্যের যে অনুভূতি আমার মধ্যে ছিল তা প্রকাশ করে বললে এই বলতে হয় যে, কোনও যৌনমিলনের চাইতে আমার প্রেমাস্পদের আদেশ, নির্দেশ বা আঘাতের মধ্যেই যেন সেই যৌন তৃপ্তি পেতাম— যে- তৃপ্তি আর দশজন দৈহিক সঙ্গমের মধ্যে পেয়ে থাকে। আমাকে মেয়েরা বলত সলজ্জ এক প্রেমিক। মেয়েদের কোনও আচরণে আমি উত্তপ্ত হতে থাকলেও তাতে তার প্রতি আমার সলজ্জতাই বৃদ্ধি পেত। এর ফলে এমন প্রেমে চরমতা যেমন সহজলভ্য হতো না, তেমনি পারস্পরিক এমন সম্পর্ক কোনও দুর্ঘটনারও সৃষ্ট করত না। এর ফলে খুব কম ক্ষেত্রেই আমি কোনও মেয়েকে দৈহিকভাবে পীড়ন করেছি। তথাপি এমন মিলনে কোনও যৌন আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি, এমনও আমি মনে করিনে। আমার এমন সম্পর্কেও একটা আনন্দ থাকত। কল্পনাতেই আমার কামনার পূর্তি ঘটত। ফলে আমি বলতে পারি মেয়েদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই নৈতিক অবনতির উৎস হয়নি। এর জন্য আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্কোচ এবং সাহসের অভাবকেই আমি মূল বলে বিবেচনা করি। এক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ সাহসের ব্যাপার থাকলে আমি নির্ঘাত মর্মান্তিক যৌন আচরণে নিক্ষিপ্ত হতে পারতাম।এ পর্যন্ত আমি যা প্রকাশ করেছি তাতে আমার এই আত্মোদঘাটনের গুহার সবচাইতে ঘৃণ্য পর্যায়কে অতিক্রম করেছি একথা আমি বলতে পারি। কোনও অপরাধের কথা বলার চাইতে, কারোর নিজের চরিত্রের লজ্জাকর এবং হাস্যকর ব্যাপারে আত্মোদঘাটন অনেক বেশি কঠিন ব্যাপার।

যা আমি বলেছি, তারপরে যা আমি বলব তাতে আমার কোনও আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটবে না। এর পরে আমার গোপন কিছু থাকবে না। তবু যা আমি প্রকাশ করেছি তাতেও আমার নিজের মন:কষ্ট যে কম হয়নি, তা এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, যা বলেছি তা আর আমার কোনও প্রিয়জনকে বলার উৎসাহ বোধ করিনি। যা আমি সাহস করে করিনি, তা আমার অন্তরঙ্গ অপর কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নৈকট্যেও মুখ ফুটে পাওয়ার দাবি করিনি। আমার জীবনে, আমার বয়সী একটি মেয়ে ব্যতীত অপর কারোর সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেনি। আর তখনও মিলনের প্রস্তাবটি আমি করিনি, প্রস্তাবটি করেছিল ওই মেয়েটি নিজেই।

আজ যখন এভাবে আমার অন্তরের গভীরে গিয়ে কথা বলছি তখন সেই কৈশোরের আমার আচরণে কিছু অসঙ্গতির কথা আমি স্মরণ না করে পারছিনে। অসঙ্গতি এখানে যে একটি ঘটনা যেখানে তার অসঙ্গতি সত্ত্বেও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে ভাসছে এবং সেই দূরের স্মৃতিকে সূত্রবদ্ধ করে রেখেছে, অপর কোনও একই প্রকারের অসঙ্গতি এখনও আমার মনে ঘৃণা এবং লজ্জার উদ্রেক করছে। যেমন এটা আমি বুঝতে পারিনে একই প্রকারের দুটো ঘটনা আমার চরিত্রে দুই রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল কেমন করে? প্রতিক্রিয়ার একদিকে উত্তেজনা আবার অপরদিকে একটা স্নিগ্ধবোধের সৃষ্টি প্রকট রকম দুটো ঘটনার মধ্য দিয়ে। একদিনের কথা বলি। রান্না ঘরের পাশের ঘরে বসে আমি আমার পড়া শিখছিলাম। একটি চাকর মাদাম লামবারসিয়েরের চুল আঁচড়াবার চিরুনিটা শুকাবার জন্য চুলার কাছে রেখেছিল। মাদাম যখন তার চিরুনি নেবার জন্য রান্নাঘরে এলেন তখন দেখলেন যে তার চিরুনির বেশ কটা কাঁটা গরমে একেবারে পুড়ে গেছে।

প্রশ্নটা দাঁড়াল, কার দোষে এমনটা ঘটল। এটা তো সত্য যে আমি ছাড়া আর কেউ এ সময়ে রান্না ঘরে ঢোকেনি। গিন্নী যখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম, আমি চিরুনি ধরিনি। কিন্তু সাহেব আর গিন্নী দু'জনেই আমাকে ধমকাতে লাগলেন। আমাকে তারা হুমকি দিলেন শাস্তি দেয়ার। আমি বেপরোয়াভাবে কেবল অস্বীকার করে চললাম। অথচ ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণ সবই আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছিল। সেদিন পর্যন্ত জীবনে আমি আর কখনও এত জোরে মিথ্যে কথা বলিনি। কর্তা-গিন্নীর কাছে ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল। আমার শয়তানি, আমার বেপরোয়াভাব দেখে মনিব আমার ওপর ক্রমান্বয়ে কঠিন হয়ে উঠলেন। কিন্তু এবার দেখলাম মাদাম লামবারসিয়ের নিজের হাতে দণ্ড দিলেন না। তিনি আমার এ কর্মের কথা আমার কাকা বারনার্ড-এর কাছে লিখে পাঠালেন। কাকা বারনার্ড এসে পড়লেন। তবে এবার দেখলাম আমি একা নই, আমার আর এক গরিব ফুফাতো বোনের বিরুদ্ধে আর একটা অপরাধের নালিশ হলো। আর স্থির হলো, আমাদের দু'জনকেই দণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়া হবে। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। অপরাধের মধ্যেই যদি তার প্রতিবিধানের চিন্তা করতেন এবং চিরদিনের জন্য আমার এই দণ্ডকে স্মরণীয় করে রাখতে চাইতেন তবে তাদের এমন ব্যবস্থার চাইতে আর উত্তম কিছু হতে পারত না। এবং যথার্থই বহুদিন এই ঘটনাটাকে আমি বিস্মৃত হতে পারিনি।

তাদের চেষ্টার কোনও বিরাম ঘটল না। তবু আমার কাছ থেকে কোনও স্বীকৃতি আদায় তারা করতে পারল না। বারংবার আমাকে তাদের কাছে হাজির করা হলো। আমাকে মেরে প্রায় লাশ করে ফেলল। তবু আমি একটুও নড়লাম না। ভাবটা আমার এমন দাঁড়াল যে আমি মরব তবু বিন্দুমাত্র নড়ব না। আর শেষ পর্যন্ত ওদের জবরদস্তি একটা ছোট ছেলের জেদের কাছে হার মানতে বাধ্য হলো। শেষ পর্যন্ত এমন নিষ্ঠুর পীড়ন থেকে দৈহিকভাবে বিধ্বস্ত হলেও মানসিকভাবে আমি বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে এলাম।

ওই ঘটনার পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর পার হয়েছে। এখন আর সেই অপরাধে কেউ আমাকে দণ্ড দেবে, এমন সম্ভাবনাও ছিল না। তাই আমি ঈশ্বরের কাছে আজও বলব, আমার কোনও অপরাধ ছিল না। জমিদার পত্নীর সেই চিরুনিকে আমি আদৌ ছুঁইনি। শুধু তাই নয়। রান্নাঘরের আগুনের কাছে আমি সেদিন যাইনি। চিরুনিটাকে ধরারও কোনও কল্পনা আমি সেদিন করিনি। তবু ঘটনাটা কেমন করে ঘটেছিল এটা আমাকে জিজ্ঞেস করে কোনও লাভ নেই। এই ঘটনার সঙ্গে আমার যথার্থই কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমার নিজেরও প্রশ্ন, কেমন করে যে ঘটনাটা ঘটেছিল?

আজ কেবল মজা লাগছে এই কথাটা ভেবে যে সেদিন সেই ছেলেটা ছিল একটা পিচ্চি বৈ আর কিছু নয়। দিনাদিনের সব কাজেই ছেলেটা ছিল অনুগত। অথচ আবেগে যেন পিচ্চিটা ছিল ভর্তি আর গর্বে উদ্ধত। আমি কেবল বিস্ময়ের সঙ্গে চিন্তা করি সেই ছেলেটার কথা যে, যাদের সে এতদিন ভালবেসেছে, যাদের কোনও কথার সে অবাধ্য হয়নি সে তাঁদের কাছ থেকেই পেল অবর্ণনীয় এমন দণ্ড! এই আমার জীবনের প্রথম স্মরণীয় ঘটনা। সেই ঘটনার স্মৃতিতে আজ আর কোনও ভয় বা লজ্জা নয়। আমার মনে এতদিনকার লালিত চিন্তাভাবনাগুলো যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। আমার কেবল বিস্ময় আর প্রশ্ন, সেদিনকার সেই বাচ্চার মনের এই অনুভূতিকে আমি আজ কী নামে অভিহিত করব; আমার সেদিনকার সেই চিন্তার জটকে আজও কোনওভাবে যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আনতে পারছিনে। কী ছিল আমার অপরাধ? কী আমি করতে পারতাম। যা আমি করিনি তাকে স্বীকার করব? এটা কেমন করে করি? কেমন করে করতাম। তাই আজো বুঝতে পারছিনে সেদিনকার সেই নির্মম আঘাতের ঘায়ে যখন আমি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হচ্ছিলাম তখন যা আমি করেছি, তার অন্য যা কিছু আমি করতে পারতাম, যা আমি বলেছি, তার থেকে ভিন্নতর আর কিছু আমি কী বলতে পারতাম।

আমার চেতনারও তখন এমন বৃদ্ধি ঘটেনি, আমি বুঝব যে আমার বিরুদ্ধের প্রমাণটা কত অকাট্য। আমার বিপরীতে কাউকে চিন্তা করার কোনও ক্ষমতাই ছিল না আমার। আমার নিজের অবস্থান থেকে আমি এতটুকু নড়লাম না। আমি গায়ে পিঠে নিদারুণ ব্যথা পাচ্ছিলাম এ কথা ঠিক। এই বেদনাবোধ ছাড়া অপর কোনও অনুভূতি আমার স্মরণে জাগছে না। কেবল, যে অপরাধ আমি করিনি তার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পীড়নের এই ঘটনা ছাড়া আর কিছুই আমার স্মরণে নেই। শারীরিক বেদনা অবশ্যই ছিল ভয়ানক রকমের। তবু সেটাকে কোনও বিশেষ অনুভূতি বলে অপর কিছুকে আমি আখ্যায়িত করতে পারছিনে। যেন সেই পীড়নের মধ্যে আমার সকল বোধশক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। বোধের কথা বললে বলতে পারি আমার দেহ-মনে যেন একটা অন্ধ ক্রোধ আর অসহায়তার বোধই ছিল। অপর কিছু নয়।

সে রাতে আমার সঙ্গে আমার পিসতুতো ভাই ছিল। বয়সে আমরা সমান ছিলাম। তাকেও অপরাধী ভাবা হয়েছিল। অথচ সেও কিছু করেনি। চিরুনি সে পোড়ায়নি। কিন্তু তার ওপর যে অত্যাচার হয়েছিল সেও আমারই মতো। আমার ভাইও মারের চোটে কান্নাকাটি করা ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি। আর কোনও কথা বলতে পারেনি। ওর দশাও হয়েছিল আমার মতো। যে কাজ ও করেনি, সে কাজ ও করেছে এমন বলার কথা ও চিন্তা করতে পারেনি। এমন বললে আমাদের অপরাধের গুরুত্ব বাড়া বৈ কি কম হতো, আমাদের ওপর পীড়ন কি কম হতো? এ এক আশ্চর্য অবস্থা। না পারি বলতে, না পারি সইতে।

রাতে বিছানাতে আমরা দু'জন শুতে গিয়ে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কেবল ফুঁপিয়ে কাঁদলাম। দম আমাদের বন্ধ হয়ে আসছিল! আমাদের মনে রাগের প্রকাশ ঘটছিল কেবল গালাগালিতে। তার প্রকাশও ছিল সীমাবদ্ধ। হারামজাদা খুনি, হারামি খুনি এমন শব্দ বারংবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলা ছাড়া আর কিছু আমরা বলতে পারছিলাম না।

এই কথাগুলো আজ যখন লিখছি তখনও আমার মনে হচ্ছে যেন আমার শরীর গরম হয়ে উঠছে, আমার ধমনীর রক্ত চলাচল প্রবল এবং দ্রুত হয়ে উঠছে। সেই মুহূর্তের আমার এই মানসিক অবস্থা আমি কোনওদিন বিস্মৃত হব— এ কথা আমি ভাবতে পারছিনে। আমি যদি লক্ষ বছরও বাঁচি তবু আমি সেদিনের কথা বিস্মৃত হতে পারব না। আমার জীবনের সেই প্রথম নির্যাতন এবং অন্যায়ের সেই ঘটনা আমার অন্তরাত্মার ওপর এমন এক গভীর দাগ কেটে দিয়েছিল যে নির্যাতনের এমন ঘটনা যদি আমি সংঘটিত হতে দেখি, সে ঘটনা আমার ওপর না হয়ে অপর কারোর উপরেও যদি হয় তাহলেও সে ঘটনা আমার মনের মধ্যে, আমার নিজের অবিচ্ছিন্ন সেই দিনের সেই ঘটনার সব আবেগকে আমার মধ্যে জাগরিত করে তুলবে। আর তাই কোনও অন্যায়ের দৃশ্যকে আমি অবিচলিতভাবে দেখতে পারিনে। আমার সঙ্গে এমন ঘটনার আদৌ যদি কোনও সম্পর্ক না থাকে তথাপি আমার মনের এই উত্তেজনা আমি নিরোধ করতে পারিনে। তাই কোনও স্বৈরাচারীর কোনও নির্যাতন কিংবা কোনও ধর্মযাজকের অপকাণ্ডের কথা যখন শুনি তখন মনে হয় যেন আমি ছুটে গিয়ে ওই পাষণ্ডের বুকে আমার হাতের ছুরিটা বসিয়ে দিই, তাতে যদি আমার শতবার মৃত্যু ঘটে তা ঘটুক। এমন অনেক সময়ে ঘটেছে যে কোনও একটা পশু, সে কুকুর, বেড়াল যাই হোক না কেন সে আর একটাকে কেবল ওর গায়ের জোরে লাফিয়ে পড়ে আক্রমণ করেছে তাহলে আমি তার গায়ের জোরের শেষ দেখার জন্য আক্রমণকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি। অবশ্যই এটা আমার আবেগের প্রকাশ। আর এর উৎস অনুসন্ধান করলে নিষ্পাপ আমার ওপর সেই আদি অত্যাচারের কাছে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে ঘটনার কথা আমি ওপরে বর্ণনা করলাম, অতীতের দিকে তাকিয়ে আমি বলব, আমার শৈশবের প্রশান্তি এই ঘটনার সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। সেদিন থেকে আমি পরিপূর্ণভাবে সুখের উপভোগ কাকে বলে তা আমি ভুলে গেছি। আজও যদি সেদিনের কথা আমার মনে পড়ে তখন যন্ত্রণা ছাড়া আর কোনও ভাল লাগার কথা আমি মনে করতে পারিনে। বসিতে আমরা আরো কয়েকমাস ছিলাম। সেখানে কেউ যে আমাদের জ্বালাতন করেছে তা নয়। তবু আপাতভাবে সেই শান্ত অবস্থাও আমার মনে শৈশবের শান্তি আর ফিরিয়ে আনতে পারেনি। নৈকট্য, আন্তরিকতা, বিশ্বাস যা একদিন আমার ছিল, তা আমার জীবন থেকে উধাও হয়ে গেল। যাদের একদিন আদর্শ মনে করেছি, দেবতুল্য ভেবেছি তাদের আর আমি তেমন করে ভাবতে পারলাম না। আমরা কিশোররা তখন থেকে কোনও অন্যায়ে প্রবৃত্ত হলে তাতে যত লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করতাম তার অধিক ধরা পড়লে যে নির্মম নির্যাতন হতে পারে তার স্মৃতিই আমার অস্তিত্বকে ঘিরে থাকতে লাগল। তখন থেকে সৎ কার্য বা সততা কাকে বলে তা যেন আমি ভুলে গেলাম। এখন আর অবাধ্য হতে বা মিথ্যা বলতে বাজত না। অপরাধ করার চাইতে অপরাধকালে ধরা পড়ার ভয়টাই বড় হয়ে দাঁড়াল। ফলে ঐ বয়সের যা কিছু নষ্টামি আমাদের চরিত্রকে আবিষ্ট করে ফেলতে লাগল। আমাদের আনন্দের আকাশ যেন একটা অন্ধকার মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এমনকি যে জন্মভূমির জন্য আমি একদিন দেশপ্রেম বোধ করতাম সে আবেগও আমার মন থেকে যেন অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমার নিজের দেশকেই মনে হলো যে, জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এক রাজ্য। আনন্দহীন এক রাষ্ট্র। একদিন যার দিকে তাকালে তার সৌন্দর্যে বিমোহিত বোধ করতাম যেন সে আজ বিশুষ্ক এক ভূমিতে পরিণত হয়ে গেছে। একদিন যে বাগানের পরিচর্যায় আনন্দ পেতাম সে বাগান, তার ছোট্ট সুন্দর পুষ্পচারা সব যেন পরিত্যক্ত বোধ হলো। বাগানের মাটিতে আচর কাটা বা কোথাও রোপিত বীজের উদ্ভিন্ন কাণ্ডের আভাসে আনন্দে চিৎকার করে ওঠা, সবই যেন আমরা বিস্মৃত হয়ে গেলাম। আমাদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠতে লাগলাম : বাকিরাও যেন আমাদের প্রতি বিতৃষ্ণ হতে লাগল। মাদাম লামবারসিয়েরের কাছ থেকে আমাদের পিতৃব্য আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তার মনে হলো, এখানে যা হবার তা যথেষ্ট হয়েছে। আর দরকার নেই। এ বিচ্ছেদে তার মনে কোনও রাগ বিদ্বেষের সঞ্চার হলো না।

বসি থেকে চলে আসার পরে ত্রিশ বছর পার হয়েছে। কিন্তু তার জন্য মনে কোনও আফসোসের আভাস পাচ্ছিনে। যে ঘটনায় একদিন আনন্দ বোধ করেছি তারও কোনও স্মৃতিও মনের মধ্যে জাগছে না।

কিন্তু এখন একটা মজার ব্যাপারও বোধ করছি, যা এতদিন করিনি। আজ আমার বয়স হয়েছে। বলা চলে প্রায় বার্ধক্যের কাছে এসে পৌঁছেছি। আজ যেন আমার ঘটনার স্মৃতি বা আবেগ বিস্মৃত হলেও সেই এক কিশোরকালে এতদিনকার বিস্মৃত ঘটনা আবার স্মৃতির এ-কোণে ও-কোণে ভেসে উঠছে। তখন তাতে একটা আনন্দবোধেরও যেন সৃষ্টি হয়। আমার মনে হচ্ছে যে সে আনন্দের ভেলা আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতের পাশ দিয়ে পিছনে যাচ্ছে আমি তাকে ধরতে হাত বাড়াচ্ছি। সে দিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও এখন যেন আনন্দের আকর হয়ে ভেসে উঠছে। সেকালের ঘটনা, তারপরে কতদিন কেটে গেছে, আজ আবার মাথার মধ্যে ভেসে উঠছে তাতেই আমার আনন্দ। সেই সময়কার সকল মানুষ, তুচ্ছ ঘটনা, স্থান সময় সব যেন ম্যাজিকের মতো চোখের সামনে আবার এসে হাজির হচ্ছে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি মাদাম লামবারসিয়েরের ওই চাকর বা সেই চাকর, এই চাকরানি বা সেই চাকরানি আমার চারপাশে আবার ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই এখন যেন একটা হাঁস আমার পড়ার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। একটা মাছির জ্বালায় আমি পড়তে পারছিনে। ঘরের কোন্ জিনিসটা কোন্‌খানে তাও যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মাদাম লামবারসিয়েরের পড়ার ঘরটা হাতের ডান পাশে। একটা ছবি আঁকা তামার প্লেট আছে। তার মধ্যে পোপদের চেহারা ভেসে উঠছে। একটা ব্যারোমিটার পড়ে আছে। একটা বড় পঞ্জিকাও দেখতে পাচ্ছি দেয়ালে ঝুলানো আছে। একটা আঙ্গুরের লতা জানালাটাকে ঢেকে ফেলেছে। আমি জানি আজকের কোনও পাঠক আমার এই টুকিটাকির বিবরণে মোটেই মোহিত হবে না। কিন্তু আমি যে আমার মনকে থামাতে পারছি না। কী যেন বাধ্য করছে আমার কৈশোরের সেই ছবিগুলিকে আবার দেখতে। আজ সেদিনের সেই স্মৃতি আমার মনকে শিহরিত করে তুলছে। কতো যে স্মৃতি। এর সবগুলো বলতে গেলে না সময়তে কুলাবে, না পাঠকরা তা গ্রাহ্য করবে। কিন্তু একটা ঘটনা আর একটু বিস্তারিতভাবে না বলে আমি থামতে পারছিনে। অন্তত পাঁচমিনিট আমাকে সময় দিন। ...

ঠিক আছে, যা বলেছি, আর থাক।

মোট কথা আমার কৈশোরের সবচাইতে মূল্যবান সময়কে আমি নানা দুষ্টামি-নষ্টামিতে নষ্ট করেছি।

এর পরে যার অধীনে আমাকে রাখা হলো সে এক কঠিন মানুষ। তার নাম মসিয়ে ডুকোমান। সে এক কৃতী মানুষ বটে। এক মাসের মধ্যে সে আমার কৈশোরের সমস্ত আনন্দ-আহলাদকে শেষ করে আমাকে দস্তুরমতো একটা খাঁটি চাকরে পরিণত করে ফেলল। আমি যা একটু ল্যাটিন শিখেছিলাম তাকে সে যখন তখন ঠ্যাঙ্গানির চোটে একেবারে ধুয়েমুছে শেষ করে দিল। রোম বা রোমান শব্দটাকেও আমি ভুলে গেলাম। পৃথিবীতে বা ইতিহাসে রোমান বলে যে কিছু ছিল তাও আমি ভুলে গেলাম।

তারপরে একবার যখন আমি আমার বাবার কাছে গেলাম তখন তিনি যেন আমার মধ্যে শৈশবের আদরের তার পুত্রটিকে অন্বেষণ করেও আর খুঁজে পেলেন না। মেয়েদের মহলে আমি আর সেকালের সেই রোমাঞ্চকর তরুণটি রইলাম না। আমি নিজেকে এমন একটা মান্যবর বলে ভাবতে লাগলাম যে ল্যামবারসিয়েরের যে পরিবারে আমি একদিন আশ্রয় পেয়েছিলাম তাদের প্রতি কোনও সৌজন্যবোধ থেকে তাদের সাথে একবার দেখাটি পর্যন্ত করতে গেলাম না। কোনওদিন আর তাদের সাথে আমার কোনও সাক্ষাৎই ঘটল না। ছোটকালের আমুদে একটি কিশোরের জায়গাতে এবার জন্ম হলো সমস্ত রুচিহীন একটা অপদার্থের। পেছনের কথা যেন আমি সব বিস্মৃত হয়ে গেলাম। অথচ কিশোরকালে আমার শিক্ষা-দীক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো কিছু কম হয়েছিল না। আমার ক্ষমতার এটাও একটা দৃষ্টান্ত বটে যে, একদিন যেমন ভালবাসার পাত্র ছিলাম এখন ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়ালাম। অর্থাৎ খারাপ হওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল। ছিল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। আর তাতে তেমন সময়ও লাগল না। বেশ দ্রুততার সাথেই আমার পতন ঘটতে লাগল।

আমার বাড়ির কর্তার অত্যাচার শেষ পর্যন্ত যে কাজকে আমি ভাল বাসতাম সেই কাজকে আমার কাছে অসহ্য করে তুলল। আমার নিজের চরিত্রে এমন সব পাপাচার ঢুকতে লাগল যেগুলোকে আমি নিজেই একদিন ঘৃণা করতাম। এখন আর মিথ্যাচারে আমার কিছু যায় আসে না এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়াল। কাজের বদলে আলসেমি আর চৌর্যবৃত্তি আমার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল। আমার চরিত্রের এই পরিবর্তনের স্মৃতিতে আমি আজ পিতৃস্নেহ, প্রিয়জনের ওপর নির্ভরতা আর ঘৃণ্য দাসত্বের মধ্যকার পার্থক্যের শিক্ষাকে আমার বোধের অঙ্গীভূত করে দিল। যে কিশোর এক সময় নম্র আর বিনীত ছিল, আজ সে দস্তুরমতো দুর্বিনীত হয়ে উঠল। যার চরিত্রে একদিন অবাধ্যতার চাইতে ঘৃণ্য আর কিছু ছিল না। কিন্তু একদিন যে দুর্লভ স্বাধীনতা আমি ভোগ করেছিলাম, সে স্বাধীনতার বোধ ক্রমান্বয়ে আমি হারিয়ে ফেলতে লাগলাম এবং পরিশেষে তার আর কোনও চিহ্ন আমার চরিত্রে অবশিষ্ট রইল না। আমার বাবার সঙ্গেও কোনও অশিষ্ট আচরণে আর আমার কোনও সঙ্কোচের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রইল না। মিস্টার ল্যামবার সিয়েরের সঙ্গেও উদ্ধত হয়ে উঠলাম। আর সেদিন থেকে আগের আমি আর আমি থাকলাম না। যে বাড়িতে একদিন আমি মুখ ফুটে কথা বলতে সাহস করতাম না। যা আমি পেতে পারি না তাকে আমি চাওয়ার সাহস করতাম না। সে বাড়িতে এখন আহারের সময় কোনও ভদ্রতাই আমি মানলাম না। কবে খাওয়া হলো আর না হলো তার পরোয়া না করে খাওয়ার মাঝখানে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়তাম। এই কথাগুলো স্মৃতিতে এলে কারোর বুঝতে অসুবিধে হবে না পতনের কোন্ গহ্বরের দিকে আমি উন্মাদ হয়ে ছুটছিলাম। একদিন যেখানে কাজের এবং বাধ্যতার শেকলে আমি অনুক্ষণ বাঁধা ছিলাম সেখানে এখন অপর যে কারোর স্বাধীনতার দৃশ্য আমার দাসত্বের বোঝাকে দুর্বহ করে তুলতে লাগল। আর এখন যে ঝামেলার কারণের আদি-অন্ত আমি জানি, তার বিন্দুমাত্র আমি আর ফাঁস করার ইচ্ছা পোষণ করলাম না। তখন থেকে আগে আমার মধ্যে যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ছিল তার উধাও ঘটল। আগে কোনও বিচ্যুতির ক্ষেত্রে আমার নম্র আচরণ যেখানে আমার জন্য অন্যের মনে মমতার সৃষ্টি করত এবং আমার আচরণকেও তারা ক্ষমা করে দিত, তার সবকিছুই আমার ভাগ্য থেকে উধাও হয়ে গেল। একটা ঘটনার কথা মনে হলে আমার আজও হাসি পায়। এক রাতে কোনও কিছু না খেয়েই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরে ক্ষুধার জ্বালায় টিকতে না পেরে ঘুমন্ত বাড়িটার রান্নাঘরে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তার প্রত্যেকটাকে শুঁকে শুঁকে আমি তাদের স্বাদ আস্বাদন করতে লাগলাম। একটা রোস্টের গন্ধ আমাকে এত আকৃষ্ট করল যে সেটাকে একটু চেখে দেখার লোভ আমি কিছুতেই সামলাতে পারলাম না। আমার ছ্যাঁচরামির ঘটনা বাড়ির সকলকে এমনভাবে উল্লসিত করেছিল যে এরপর তারা আমাকে রাতের বেলা না খাইয়ে উপোস করে রাখতে মজা পেতে লাগল। বাড়ির কর্তাও ঘটনার কথা জানতে পারলে মজা পেতেন। কিন্তু আমি সাহস করে তাকে কোনও কথাই বলতে পারিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ থেকে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে, এরপর থেকে কোনও ঘটনা গোপন করতে আমার আর বাধত না। মিথ্যা বলায় আমি বেপরোয়া হয়ে উঠলাম, কোনও কিছু চুরি করতে কোনও সংকোচ ঘটল না। এসবই এবার আমার দ্বিতীয় চরিত্র হয়ে উঠল। এর এক অর্থ এই যে, কোনও কিছু পেতে চাইলে তা না পাওয়ার ব্যাপার যে কোনও কিশোরকে ক্রমান্বয়ে খারাপ করে তোলে। দন্ড কাল দন্ডিতকে আদৌ কখনও উত্তম করে তোলে না। এ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝি আমাদের বাড়িঘরের চাকরবাকর দাসদাসী কেন এমন দন্ডের ফলে ক্রমান্বয়ে খারাপ হয়ে ওঠে। তাদের চোখের সামনে অন্যরা ইচ্ছামতো খাবে, কিন্তু তারা পাবে না— এ ঘটনা তাদের খারাপ হবার পথেই নেবে। এর বদলে ওরা যদি দেখে ওরা বাড়ির অপরের সমান, কারোর চাইতে দীন নয়, তাহলে আমি মনে করি ওরা ভাল ছাড়া আদৌ খারাপ হতে পারে না। এই অভিজ্ঞতা থেকে এই বোধ আমার লাভ বৈ লোকসান নয়। ভাল দ্বারাই তুমি মন্দকে ভাল করতে পার, মন্দ দ্বারা নয়।

আসলে ব্যাপারটা যথার্থই এমন যে, দন্ডদাতার উদ্দেশ্য যতোই মহৎ হোক না কেন, দন্ড একের পর এক দন্ডিতকে খারাপ থেকে অধিকতর খারাপের দিকেই নিয়ে যায়। আমার যিনি মনিব ছিলেন, প্রায় এক বছর পর্যন্ত, তার অজ্ঞাতে আমি কোনও খাবার পর্যন্ত চুরি করার কথা ভাবতেও পারিনি। আমার প্রথম চুরির ব্যাপারটা যতো-না আমার জন্য তার চাইতে অধিক আমার এক বন্ধুর জন্য ছিল। কিন্তু ওই যে শুরু হলো, ঘটনাটা যতই সামান্য হোক না কেন, ওতেই যেন বাঁধটা ভেঙে গেল।

ব্যাপারটাতে আমি যদি ধরা পড়তাম তাহলে সে পিটুনিটা আমি খেতাম তার কথা আমি কল্পনা করতে পারছিনে। আমার সঙ্গীরা তো আমাকে ধরিয়ে দিতই, আমি যতোই ওর কথা ফাঁস করতাম না কেন, ওই আমাকে অধিকতর ফাঁসিয়ে দিত। মনিব আমার কথা একটুও বিশ্বাস করত না।

কাজেই সত্যটা হচ্ছে, জনগণের ব্যাপারটা এমন যে, আসল অপরাধী যদি বলবান হয়, সে নিজেকে বাঁচিয়ে নেয়, আর দোষী হয় নির্দোষ।

যাই হোক অভিজ্ঞতাটি থেকে এটাই আমি শিখলাম যে, চুরি করাটাকে আমি যত সাংঘাতিক ভেবেছিলাম, আসলে সেটা ততো সাংঘাতিক কিছু নয়। ফলে বেশ কিছুদিনের মধ্যেই আমি পাক্কা চোর হয়ে উঠলাম। এবার কোনও কিছুকে লোভনীয় মনে হলে সেটি থেকে আমি কিছুতেই হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারতাম না। খাবার দাবার আমি যে খুব কম পেতাম, এমন নয়। কিন্তু আমার অসহ্য লাগত এই দেখে যে ব্যাটা আমার চাইতে বেশি খাচ্ছে। বেহুদা খাচ্ছে। খাওয়ার টেবিলে যখন লোভনীয় সব পদ আসতে আরম্ভ করত তখন টেবিল থেকে ছোটদের সরিয়ে দেয়া মারাত্মক হতো। এর ফলে ছোটরা লোভী হয়। এবং সেই লোভই তাকে চুরি করতে উদ্বুদ্ধ করে। কিছুদিনের মধ্যে আমি দুটোতেই বেশ পাকা হয়ে উঠলাম। এবং দেখলাম যে আমি বেশ ওস্তাদেই পরিণত হয়ে উঠেছি। মাঝে-মাঝে ধরা যে পড়তাম না এমন নয়। তাতেও আমার কলাকৌশলের অভিজ্ঞতার বৃদ্ধিই ঘটে চলল।

এসব কথা মনে হলে আজ আমার যেমন কাঁপুনি ধরে, তেমনি আবার হাসিও পায়। একবার হলো কী, ভাঁড়ার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম কী সুন্দর কয়েকটা আপেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দড়িতে ঝোলানো। আমি সেগুলো আনার জন্য মাচার ওপর উঠে দেখলাম তখনও আমার হাত আপেলগুলো পর্যন্ত যাচ্ছে না। আমি একটা কাঠি যোগাড় করলাম : তাতেও হলো না। আর একটা আনলাম। জোড়া দিলাম। সেটা দিয়ে টান দিতে সেগুলো আমার হাতে এল না, নিচে পড়ে গেল। যদিও একটা ধরতে পারলাম সেটা এত বড় যে সেটাকে জানালার ফাঁক দিয়ে আর বার করতে পারছিলাম না। একটা ছুরি যোগাড় করলাম। তা দিয়ে আপেলটাকে টুকরো করার চেষ্টা করলাম। নিজে নিজের টাল সামলাতে পারছিলাম না। কয়েকটা টুকরা তৈরিও করেছিলাম। কিন্তু টুকরোগুলো তৈরি করতে-না-করতে, সেগুলো নিচে পড়ে যাচ্ছিল।

সহৃদয় পাঠক, এবার আমার মনের অবস্থাটা একটু বুঝুন।

তবু আমি দমলাম না। কিন্তু এর মধ্যে বেশ সময় পার হয়ে গেছিল। ধরা পড়ার আশঙ্কা করছিলাম। সেদিন আর এগুলাম না। পরের দিনের অপেক্ষায় রইলাম। বাড়ির কাজকর্ম অবাধে চালালাম, যেন কিছুই কোথাও ঘটেনি। পরের দিন আবার শুরু করলাম। ভাবলাম, কিছুই তো কেউ জানে না। কিছুই তো ঘটেনি। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে ভাঁড়ারের মেঝেতে কয়েকটা চাক্ষুষ সাক্ষীকে আমি গতকালই রেখে এসেছি!

পরের দিন সুযোগ পেয়ে আবার আরম্ভ করলাম। একটা টুল যোগাড় করে তার ওপর উঠলাম। গতকালের কাঠিকে জোড়া লাগালাম, আর একটু লম্বা করলাম এবার লক্ষ্যবস্তুকে প্রায় ধরে ফেলেছিলাম। ... কিন্তু আমার ভাগ্য খারাপ। জন্তুটা ঘুমিয়ে ছিল না। ভাঁড়ারের দুয়োর খুলে গেল। মনিবের মাথা দেখা গেল। সে তার দুই হাত এক করে আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এবং তারপরে উচ্চারণ করল : সাহস বটে! তাই তো বলি, আমার হাতের কলম পড়ে যাওয়ার কারণটা কী? ...

ফল কী দাঁড়াল? ফল দাঁড়াল, আমি প্রতিরোজ মার খেতে লাগলাম, আর প্রতিরোজ চুরি করতে লাগলাম। এ বন্দোবস্তটি মন্দ লাগল না। মনিব মারতে থাকল। আমি মারের বদলা নিতে লাগলাম চুরি করে। তাতে মারটা আমার মনের গায়ে তত লাগল না। কাজেই মারের দিকে আর পেছন ফিরে তাকাবার দরকার হলো না। সামনের দিকে তাকাতে লাগলাম। নিজের মনে বললাম : আমিও দেখে নেব। প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা। আমি খারাপ গুন্ডা বলে যদি তুমি মারতে পার, তবে আমারও খারাপ আর গুন্ডা হওয়ার অধিকার আছে। আর তাই চুরি আর মার এক সঙ্গেই চলতে লাগল। একটার বিনিময়ে আর একটা : আমারটা আমি করলে, সেও তারটা করতে পারে। মনের এই ভাবটি আমার ভাল লাগল। আগের চাইতে মুক্ত মনে আমি চুরি করতে লাগলাম। একান্তে নিজেকেই জিজ্ঞেস করলাম। পরিণামে কী হবে?

: পরিণামে আর কী হবে? আমি মার খাব। মার খাওয়ার জন্যেই আমার জন্ম।

আমি বুঝি, আমার রাগ খুব বেশি। আর সেই রাগ একবার উঠলে আমার কোনও খেই থাকে না। তখন আর মান, সম্মান, ভয়, ভীতি, ভালমন্দ কিছুরই আর খেয়াল থাকে না। আমার মধ্যে একটা হিংসা আছে, অবাধ্যতা আর বেপরোয়া ভাব আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন আর কোনও সঙ্কোচ আমাকে পিছন ফিরতে দেয় না। কোনও ভয় আমাকে ভীত করতে পারে না। আমার মনের রাগের লক্ষ্যই হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য। তখন বিশ্বের আর কিছুকেই আমি পরোয়া করিনে। আবার এককথাও ঠিক যে, এমন ভাবটা আমার বেশিক্ষণ থাকে না। হয়ত মুহূর্ত মাত্র। পরের মুহূর্তে আমি আর সে আমি নই। মন যখন শান্ত হয় তখন আমার মতো শান্ত কিশোর আর কেউ হতে পারে না। তখন সব কিছুতেই আমার সংকোচ। সব কিছুতেই আমার ভয়। একটা উড়ন্ত মাছির গুঞ্জনও আমাকে ভীত করে তোলে। তখন না ভেবে আর কথা বলতে পারিনে। সংকোচ আমাকে পরাভূত করে ফেলে। কোনও মানুষের সামনে আমার মাথা তুলে দাঁড়াতে ভয় হয়। যদি কোনও কাজ করতে হয়, সে কাজ আমি কেমন করে করব তা ভেবে পাইনে। কেউ যদি আমার দিকে তাকায় তাহলে আমি কেঁচোর মতো হয়ে যাই। আবেগে অশান্ত আমার পক্ষে কোনও কিছুই অসম্ভব বলে বোধ হয় না। তখন আবার প্রকাশে শব্দের কোনও ঘাটতি পড়ে না। কিন্তু মানুষ যেটাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলে সেখানে একেবারেই অসহায়। এবং তখন একটা কথা বলাও আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আমি বুঝি না, এমন স্বভাব থেকে আমি কেমন করে মুক্ত হব। কিসের বিনিময়ে। আমি বুঝি, আমার কামনা ইচ্ছে যেন বিশুদ্ধ আনন্দের কামনা। অথচ টাকা পয়সা, অর্থ সব অনর্থের মূল। এ সব আমার আনন্দকে বিষাক্ত করে ফেলে। যেমন অপরের সঙ্গে খেতে আমার ভাল লাগে। আবার খারাপ লাগে। আমি চাই শুধু একজনই আমার প্রিয় পাত্র হবে। আর কেউ নয়। ফলে উত্তম সংসর্গও যেমন সইতে পারি না, তেমন মদ্যপানের আড্ডাও আমি পছন্দ করতে পারিনে। তাও আমার সহ্য হয় না। আর তাই পানাহারও আমাকে তৃপ্ত করতে পারে না। কোনও নারীর চিন্তা যদি আমার রক্তে ঢেউ তোলে তখনও আমার কামনা হয় বিমূর্ত আদরের, সোহাগের। যে মেয়ে মানুষকে টাকা দিয়ে কেনা যায়, আমার কাছে তার কিসের আকর্ষণ? তখন আমার ভয় ধরে এমন মেয়ে মানুষ নিয়ে আমি কী করব? কেবল মেয়ে মানুষের কথা নয়। সব লাভ আর আনন্দের ক্ষেত্রেই আমার এই বোধ। যেন এমন আনন্দ আমি চাই যার কোনও বিনিময় মূল্য নাই। যার জন্য আমাকে কিছুই ব্যয় করতে হবে না। না কোনও অর্থ, না কোনও কষ্ট। আমার আনন্দ কেবল তাকে নিয়ে, তার জন্য যে হচ্ছে সেই আদি মানুষটি যে জানে আনন্দ কেমন করে ভোগ করতে হয়। সেই একটি অনন্য মানুষই যেন আমার কামনার পাত্র।

অর্থকে অপর সকলে যেভাবে দেখে আমি কোনও কালে তাকে সেভাবে দেখতে পারিনে। কোনও সময়েই তাকে এমনভাবে লোভনীয় বলে বোধ হয়নি। অর্থ হিসেবে কিসের মূল্য বহন করে? অর্থ হিসেবে অর্থ তো অর্থহীন। যে অর্থকে বিনিময় করে আনন্দ পেতে হবে, অর্থ হিসেবে সে অর্থের কী মূল্য। তার মানে অর্থ ত্যাগে অর্থের মূল্য! একটার জন্য দরাদরি করতে হবে, একটার জন্য অর্থকে আমার প্রদান করতে হবে, যে-অর্থকে আমি মূল্যবান মনে করি, এমনকি যার বিনিময়ে আমি লাভবান হই না, অনেক সময়ে প্রতারিত হই, সে অর্থের মূল্য আমার কাছে কী? আমি চাই টাকার দ্বারা যেন আমি মূল্যবান কিছু লাভ করি। কিন্তু যা আমি লাভ করি, একটা ডিমই হোক, বা একটি ফল : সেটা যখন হয় পচা বা বিস্বাদ তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কী লাভ করলাম। কোন মূল্যবান উত্তম? যদি একটা মেয়েও হয়। তবু টাকার বিনিময়ে আমি ফল পাই আর দেখি সে একটা নষ্ট মেয়ে তখন আমি কী করব? হ্যাঁ, উত্তম মদ্য আমি ভালবাসি। কিন্তু কোথায় পাব আমি সেই উত্তম মদ্য? কোন মদের দোকানে? যে চেষ্টাই আমি করিনে কেন, আমি প্রতারিত হতে বাধ্য। আমার উত্তমের জন্য তো কেউ পসরা খুলে বসে নেই। কোনও কিছু উত্তম পেতে চাইলেও তার জন্য কত উদ্বেগ, কত পরিশ্রম, কত বিব্রতকর অবস্থা— আমার সাহায্যকারী সঙ্গীর দরকার হবে, আমার প্রয়োজনের অর্থ উদ্ধারকারী ব্যক্তির প্রয়োজন হবে। আমাকে অর্ডার দিতে হবে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে হবে, আশঙ্কা আর আতঙ্কে রাত কাটাতে হবে। সময়ের ক্ষণ গুনতে হবে এবং শেষ কালে নিজেকে প্রতারিত দেখতে হবে। আহা! এই হচ্ছে অর্থ! এই হচ্ছে আমার সম্পদ। এক পেয়ালা মদের জন্য আমার ইচ্ছার চাইতেও এমন অর্থের জন্য আমার কামনা কী ভয়ঙ্কর!

এমন হয়েছে যে, জীবনে অসংখ্যবার আমি কোনও উত্তমকে অর্থের বিনিময়ে লাভ করতে চেয়েছি। দোকানে, বাজারে বন্দরে বেরিয়েছি, মনোহারী দোকান বা মিষ্টি দ্রব্যের বিপণীতে : আমি দেখলাম বিক্রির আসনে একটি মেয়ে উপবিষ্ট হয়ে আছে আর আমার মনে হচ্ছে মেয়েটা আমার মতো ক্ষুদ্রাবয়ব একটি ক্রেতাকে দেখে ওরা পরস্পর মুখ টেপাটেপি করছে! হাসছে। বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। ফলের দোকানে যাই : সেখানেও তো এই অবস্থা। আপেলের গন্ধ আমাকে টানে। অথচ পাশের দুটো ছেলে আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকায়। ওই যে লোকটা দোকানে বসে আছে : হায়রে, ওই লোকটা আমাকে চেনে। ওপাশে দেখি একটা মেয়ে এদিকেই আসছে। এটা কি আমাদের বাড়ির সেই মেয়েটা? আমার দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা আমার চোখের সামনে নানা মরীচিকার সৃষ্টি করে। আমার পাশে আমি যাকেই দেখি তাকেই মনে হয়, সে আমাকে চেনে! তাই রাস্তায় বেরুলেই আমি ভয়ার্ত হতে থাকি। সম্মুখের বাধা আমাকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। একদিকে সঙ্কোচ আর এক দিকে আমার কামনার লোভ : এ দু'য়ের মধ্যে আমার দোলাচলের শেষ থাকে না। এর পরিণামে আমাকে শূন্য হাতে এবং শূন্য মনে আবার ঘরে ফিরে আসতে হয়। এক নিরেট সূর্যের মতো : যার পেটে কামনার ক্ষুধা, পকেটে যার অর্থ অথচ কোনও কিছুকে হাত পেতে নিতে যার বিন্দুমাত্র সাহস নেই, সে ভীত ভয়ার্ত। সে কাপুরুষ! কিন্তু আমার টাকা তো আমার পকেটে অচল হয়ে থাকেনি। আবার বুদ্ধিমান সাঙ্গপাঙ্গরা কীভাবে তাকে হস্তগত করেছে এবং মহানন্দে তাকে ব্যবহার করেছে তার বিস্তারিত বিবরণে গিয়ে কি লাভ আছে? কী লাভ আবার সেই হাজার বিব্রতকর অবস্থার কথা বলায় : আমার সঙ্কোচ, আমার লজ্জা, আমার এগুনো আর পেছানোর কথার বর্ণনায়?

এ কাহিনীর যদি কোনও পাঠক থাকে তবে তাকে আমার সাথে থাকতে হবে। তাকে আমার অস্তিত্বে অস্তিত্ব ধারণ করতে হবে তবেই সে আমাকে মুহূর্তের পর মুহূর্ত দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবে আমার চরিত্রকে, আমার অস্তিত্বের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যকে। তাকে আমার কিছু বলতে হবে না।

এমন যদি কেউ যথার্থই থাকে তবে তার পক্ষে এই বালকটির মধ্যে একদিকে অর্থের কামনা এবং অপরদিকে অর্থের প্রতি তার অবিশ্বাস্য বিরাগের বৈসাদৃশ্যকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পারা সম্ভব হবে। এ যেন এমন একটি আসবাব, গৃহের সামান্য আসবাব যার জন্য যেমন আমি কামনার কোনও অর্থ খুঁজে পাইনে, তেমনি তাকে অর্জন করে তাকে ব্যবহারেরও কোনও উপায় খুঁজে বার করতে পারিনে। আবার যদি একটি পছন্দমতো কিছু কখনো পেয়ে যাই তবে তাকে উল্টাতে-পাল্টাতেই আমার সব অর্থ নিমেষে নি:শেষ হয়ে যায়। এর বাইরে কেউ আমার চরিত্রে কোনও আড়ম্বরের জন্য কার্পণ্যের সেই বৈশিষ্ট্যকে দেখতে পাবে না যা একজন অর্থবান লোভীর মধ্যে দেখা যায় বলে আমরা মনে করি। আবার আমার যদি কিছু ভাল লাগে তবে আমি তাকে কোনও প্রদর্শনের বস্তু না করে নিজের মনেই আনন্দের সঙ্গে আমি ভোগ করি। হ্যাঁ, অর্থের ব্যাপারে এটাই আমার সংশোধনের অযোগ্য বোধ। টাকাকে মূল্যবান করার বোধই আমার জন্মায় না। আর তাই জীবনভর আমি না পারলাম টাকা অর্জন করতে, না পারলাম তাকে ব্য·হার করতে। অপরে যেমন করে। এমন যদি কোনওদিন হতো যে আমার হাতে হঠাৎ অনেক টাকা এসে পড়েছে, তবে তা রক্ষার জন্য যত্নবান হওয়ার চেয়ে তাকে খরচ করার উদারতায় আমি মুহূর্তের মধ্যে আবার নি:স্বই হয়ে যেতাম। অবশ্য অর্থহীনের দুর্দশা আমাকে উদার হওয়ার সে সুযোগ কখনো দিল না। এতেই যা আমার দুঃখ!

স্বাধীনতা, অবাধ স্বাধীনতা আমার পূজ্য। অপরের নির্ভরতা, অপরের অধীনতাকে আমি ঘৃণা করি। হ্যাঁ, টাকার এই মূল্য আমি বুঝি। যতক্ষণ আমার কিছু টাকা আছে, ততক্ষণ আমার কিছু স্বাধীনতা আছে। একটা অনন্য নির্ভরতা আছে কিন্তু সেই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য পরিশ্রম করার কথা আমি কখনো কল্পনা করতে পারিনি। অর্থ কিংবা স্বাধীনতার জন্য পরিশ্রমের কথা আমি কখনো ভাবতে পারিনি। আবার অর্থহীন হওয়ার চিন্তাও আমি সহ্য করতে পারিনে। এটা অবশ্যই এক দুর্বোধ্য চরিত্র। আমার কাছেও। হ্যাঁ, তত্ত্বগতভাবে একটি লোকের হয়ত যে টাকা থাকে, সে টাকা অবশ্যই তার স্বাধীনতার একটা মাধ্যম। কিন্তু একথাও স্মরণীয় যে, যে-টাকার পেছনে আমরা ছুটি সে-টাকা আমাদের দাসত্বেরও এক মাধ্যম। টাকার দাসত্ব। তাই যা আমার আছে তাকে অবশ্যই আমি রক্ষা করতে চাইব ; তার অধিক কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নয়।

একে যদি আমি একটা অনাগ্রহ বা নিস্পৃহতা বলি, তবে তার কারণ অবশ্যই কোনও কিছু সাধন করার জন্য আমার আলস্য। পাওয়ার আনন্দ তাকে লাভ করার পরিশ্রমের চাইতে অবশ্যই কম, বেশি নয়। সেভাবে আমার খরচের আধিক্যের মূলেও এক আলস্য। খরচ করার সুযোগ যখন আসে তখন তাকে বুদ্ধিমানের মতো খরচ করতেও তো পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে : চিন্তার, উদ্বেগের, আকাঙ্ক্ষার। আমার কাছে বস্তু অবশ্যই বড়। যে বস্তু আমি ধরতে পারি, স্পর্শ করতে পারি, সে বস্তু অর্থহীন অর্থের চাইতে আমার কাছে অবশ্যই মূল্যবান। কারণ টাকা এবং টাকা দিয়ে আমি যা অর্জন করি : এই দু'য়ের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে। কিন্তু যে দু'টি বস্তু আমি ব্যবহার করি তার মধ্যে কোনও ব্যবধান নাই। কোনও বস্তু যদি আমি পেতে চাই তবে সে বস্তু অবশ্যই আমাকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু তাকে পাওয়ার জন্য যদি আমার কোনও মাধ্যমের কথা চিন্তা করতে হয়, তবে বস্তুর প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ আর বজায় থাকে না। আর এজন্যই আমি চুরি করেছি। বস্তু আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকৃষ্ট করেছে। এখনো এটা ওটা যা আমাকে আকৃষ্ট করে তাকে আমি চুরি করি। চুরি করার জন্য চিন্তা করিনে। হাতের কাছে পেলেই ধরে ফেলি। এ জন্য কাউকে অনুরোধ, উপরোধ করার কথা ভাবতে পারিনে। তবু যখন শিশু ছিলাম, বা যখন বয়স্ক হয়েছি, তখনো কারোর একটা ফার্দিংও আমি পরিশ্রম করে হরণ করিনি। না, এমন ঘটনার কথা আমার স্মৃতিতে আনতে পারিনে।

কেবল একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। সে প্রায় পনের বছর আগের কথা যখন 'সাত লিডার দশ সো'কে আমি যথার্থই চুরি করেছিলাম। ঘটনাটা বলার দাবি রাখে। কারণ ঘটনাটির মধ্যে এমন মূর্খতা এবং নির্লজ্জতার প্রকাশ ঘটেছে যার কথা আমার নিজের চরিত্র ছাড়া অপর কারোর মধ্যে আমি কল্পনা করতে পারিনে।

ঘটনাটা ঘটেছিল প্যারিসে। আমি সেদিন সকালে মসিয়ে দ্য ফ্রাংকুটল-এর সঙ্গে 'প্যালেস-রয়াল' বা রাজপ্রাসাদের সামনে প্রায় পাঁচটায় ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। তিনি তার পকেট ঘড়িটা বার করে ঘড়িটা দেখে বললেন। চল আমরা অপেরাতে যাই। তার কথায় আমি রাজী হয়ে গেলাম। আমরা গেলাম। তিনি কাউন্টার থেকে দুটো টিকেট কিনে আমাকে একটা দিয়ে আর একটা নিয়ে সামনে এগুলেন। আমি তার পেছনে ছিলাম। তিনি ভেতরে ঢুকলেন। আমি ঢুকতে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি দেখলাম আরো দর্শক দাঁড়িয়ে গেছে। আমি ভাবলাম ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেই পারি। মশিয়ে ফ্রাংকুয়েলও ভাববেন, আমি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছি। আমি ভিড় থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমার চেক এবং টাকা বার করে ঢুকে পড়লাম। আমি এটা বুঝিনি যে আমি যখন ঢুকব তখন দেখব যে সব দর্শকই ইতোমধ্যে নিজ নিজ আসনে বসে পড়েছে। এবং মশিয়ে ফ্রাংকোয়েলও আমাকে আর বার করতে পারবেন না। ঘটনাটার কথা বললাম এ জন্য যে, এমন ঘটনা আমার চরিত্রে আর ঘটেনি আর এর অর্থ হচ্ছে এই, মানুষের জীবনে এমন ডেলিরিয়াম বা বিকারের মুহূর্তও আসতে পারে যখন তার কার্যকলাপের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। এমন অবস্থায় কৃত কোনও কাজকে স্বাভাবিক বলে গণ্য করা উচিত নয়। আসলে সেদিন ওই টাকা চুরি করার আমার আদৌ কোনও ইচ্ছা ছিল না। আমি কেবল টাকাটার ব্যবহারকেই অর্জন করতে চেয়েছিলাম। টাকাটাকে নয়। একে যেমন চুরি বলা যায় না, তেমনি এর নির্লজ্জতারও অবধি ছিল না।

এ ছিল আমার জীবনের শিক্ষানবিসি। এই পর্যায়ে নিষ্পাপ সাহসিকতার বাহাদুরি থেকে অপদার্থতার কোন গভীরে আমি ডুবে গিয়েছিলাম তার পথ পরিক্রমের সব কিছুর বিস্তারিত দিতে গেলে এ কাহিনী আর শেষ হবে না। তবে এও বলতে হয় যে, আমার অস্তিত্বের কারণে যে অপকর্মগুলোর সম্পাদন, তার জন্য আমার মধ্যে কোনও মানসিক আকর্ষণ তৈরি হয়নি। আমার সাঙ্গপাঙ্গদের আমি ক্লান্তি বোধ করেছি এবং খবরদারির আধিক্য যখন সহ্যের অতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন সবকিছুতেই আমার ক্লান্তির শেষ থাকেনি। এ থেকে একটা জিনিসের লাভ হলো। বই পড়ার প্রতি আমার আগ্রহ আবার সঞ্চারিত হলো। যে আগ্রহকে বিগত পর্যায়ে হারিয়ে ফেলেছিলাম তাকে যেন আমি আবার ফিরে পেলাম। কিন্তু বই পড়ার এই আগ্রহ পূরণের জন্য যখন আমাকে কাজে ফাঁকি দিতে হতো তখন এটাও মনিবের কাছে বড় রকমের অপরাধ বলে বিবেচিত হতে লাগল আর তার ফলে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্তিভোগও বেড়ে যেতে লাগল। কিন্তু এর ফলে আবার লাভও একটা হলো। পাঠের বিরুদ্ধে বাঁধা যত বাড়ল, পড়ার জন্য আমার আগ্রহ তত দুর্দমনীয় হয়ে উঠতে লাগল। আমি প্রায় বই পড়ার পাগলে পরিণত হলাম। 'লা ট্রাইবু' বলে বই ধার দেয়ার একটা ব্যবস্থা ছিল। সেখান থেকে সাহিত্যের নানা বইই আমি পাঠের জন্য সংগ্রহ করতাম। এই সংগ্রহের কোনও ভাল মন্দ ছিল না। বই পেলেই হলো। ভাল মন্দ সবই আমার কাছে সমান ছিল। আমি সবই গোগ্রাসে গিলতাম। কাজের সময়ে কাজের টেবিলে পড়তাম, পানির চৌবাচ্চায় বসেও পড়তাম। কোথায় ঘন্টা পার হতো আমি বুঝতে পারতাম না। পড়তে পড়তে আমার মাথায় ঝিম ধরে যেত। আমি বই পড়া কিছুতে ছাড়তে পারতাম না। আমার মনিব আমার ওপর নজর রাখতে লাগল। আমি তার নজরে ধরা পড়তে লাগলাম। মনিব আমাকে বেদম পেটাতে শুরু করল। আমার হাত থেকে বই ছিনিয়ে নিতে লাগল। আমার এমন কত বই যে টেনেছে, ছিঁড়েছে, পুড়িয়েছে এবং জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছে তার কোনও ইয়ত্তা ছিল না। লা ট্রাইবুর কত খণ্ড যে এভাবে খণ্ডিত হয়েছে তারও কোনও ঠিক নেই। শেষ পর্যন্ত ওই লা ট্রাইবুকে আমার দেয়ার মতো কোনও ফ্রাংক আদৌ অবশিষ্ট রইল না, তখন আমি তার মালিক মহিলাটিকে আমার শার্ট, নেকটাই কাপড় চোপড় তো দিলামই। সবশেষে আমার পকেট খরচ হিসেবে যে তিন শ' থাকতো তাও প্রত্যেক রোববার তার জন্য নিয়ে যেতে লাগলাম।

এর পরিণামটা মোটেই ভাল হলো না। এই বই-এর জন্য ঝগড়াঝাটি, এমন কি হাতাহাতি— কিছুই বাকি রইল না। এবং ভালমন্দ নির্বিচারে বই পড়া আমার স্বভাবকে বিকৃত করে তুলল। আমি যেন একটা নীতিগর্হিত জীবে পর্যবসিত হলাম। এই পর্যায়ে নীরস বই অনেক পড়েছি, কিন্তু যাকে আমরা অশ্লীল বলি, অশ্লীল উত্তেজনাকর বই আমি পড়িনি। এর একটা কারণ হয়ত এই লা ট্রাইব্যু-এর মালিকান ভদ্রমহিলা এসব বই সম্পর্কে এমন রহস্যজনকভাবে ভাবভঙ্গি করতেন যে তাতে এসব বই-এর প্রতি আকর্ষণের বদলে আমার মনে একটা বিতৃষ্ণাই সৃষ্টি হতো। ইতোমধ্যে আমার বয়সও ত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছিল। এর পরে ছাড়া আগে আমি এরকম বিপজ্জনক বই-এর দিকে দৃকপাত করিনি।

সে যাইই হোক বছরখানেকের মধ্যেই লা ট্রাইবুর ক্ষুদ্রাকারের গ্রন্থাগার আমি শেষ করে ফেললাম। ফলে আমার জীবিকার কাজে যখন একটু সময় পেতাম তখন সেই সময়টুকু আমি কীভাবে কাটাব তাই ভেবে পেলাম না। একটা কথা বলা যায়, গোগ্রাসে বই গেলার অভ্যাস আমাকে আমার চরিত্র একেবারে বিকৃত হওয়ার হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিল। ভাল বই, চিনতাম না। তাকে পর করতেও আমি সক্ষম ছিলাম না। কিন্তু সুনির্বাচিত না হলেও সাধারণ বইও অনেক সময় আমার মধ্যে উত্তম ভাব ও চিন্তার উদ্রেক করত। আমার আকর্ষণের বস্তু যে ছিল না তা নয়। তবে তার সবই ছিল আমার আয়ত্তের বাইরে। আমি বুঝতে পারলাম আমার উত্তেজিত ক্ষুধার্ত ইন্দ্রিয়গুলো তার খাদ্য কামনা করছে। কিন্তু যা দিয়ে সেই কামনাকে শান্ত করা যায় তা ছিল তখনও আমার কল্পনারও বাইরে। সেগুলো এত উর্ধ্বের এবং বাইরের ছিল যে আমার মনে হতে লাগল যেন ওগুলো ভোগ করার মতো যৌন ক্ষমতাই আমার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন অদ্ভুত উত্তেজনা এবং অস্বস্তির অবস্থাতে হঠাৎ আমার হাতে এমন একটা কাজ জুটে গেল যে কাজ আমাকে যেন আমার অস্তিত্বের কাছ থেকেই রক্ষা করল। এবং তাতে আমার যৌন উত্তেজনার কিছুটা প্রশমন ঘটল। আমার পাঠের জগৎ ছোট্ট ছিল না। তার অনেক কাহিনীকেই আমি মনের চিত্রপটে চিত্রায়িত করতে, তাকে যেমন ইচ্ছা তেমন ভোগ করতে আমার কোনও বাধা হতো না। আর তাতেই যেন আমার বেশ পরিমাণ উত্তেজনার প্রশমন ঘটত। এমন প্রশমনে আমি যেন কিছুটা শান্তিও লাভ করতাম এবং আমার যে বাস্তব অবস্থায় আমি নিজেকে অতৃপ্ত বোধ করতাম, তাকে বিস্মৃত হতেও আমাকে সাহায্য করত। কল্পনার চরিত্রের সাথে আমার এই সঙ্গলিপ্সা আবার অচিরে একটা গর্হিত মানসিক অবস্থারও সৃষ্টি করল। যার ফলে পরিবেশের ওপর আমার ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণার বৃদ্ধি ঘটতে ঘটতে আমি যেন আমার নিজেরই এক দু:সহ অস্তিত্বে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লাম। এ অবস্থাটাও ক্রমান্বয়ে অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল। আমার কল্পনার কোনও চরিত্রকে বাস্তবে লাভ না করতে পেরে আমার অস্তিত্ব ক্রমান্বয়ে যেন এক কাল্পনিক জগৎকেই সৃষ্টি করতে উন্মুখ হয়ে উঠল।

এমন অবস্থায় আমি ষোল বছরে পা দিলাম। আমার সে এক নিদারুণ অবস্থা : অস্থিরতায় ভরা এক অস্তিত্ব, নিজেকে নিয়েই নিজে অতৃপ্ত। চারপাশের সবকিছুতেই আমার বিতৃষ্ণা। আমার এই বয়:সন্ধিক্ষণের কোনও তৃপ্তিই কোথাও খুঁজে পেলাম না। কী আমি চাই তাও আমি জানতাম না। শুধু সেই অজ্ঞাত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে আমি যেন মরে যাচ্ছিলাম। আমার চোখে অশ্রু এলো : কারণহীন কান্না : দীর্ঘশ্বাস : সূত্রহীন দীর্ঘশ্বাস। মোট কথা একদিকে আমার কিশোর অস্তিত্বের জন্য আমার মমতা : অপরদিকে চারপাশে এমন কিছু না পাওয়া যা দিয়ে আমি তৃপ্ত হতে পারি। রোববারগুলোতে আমার কিশোর সাঙ্গপাঙ্গরা আমাকে নিয়ে যেত ওদের জানা আমোদ-ফুর্তিতে যোগ দেয়ার জন্য। ওদের সঙ্গও আমাকে আনন্দ বা তৃপ্তি দিত না। আর আমার যদি সাধ্য থাকত তবে আমি ওদের ঘেরাও থেকে পালিয়ে যেতাম। কিন্তু তাও আমি পারিনি। ওদের সঙ্গ আমাকে উত্তেজিত করত, যে উত্তেজনাকে না পারতাম আমি ভোগ করতে, না পারতাম তা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে। আমার সর্বক্ষণের অস্তিত্বের এই ছিল অবস্থা। শহর থেকে দল নিয়ে বেরুলে, আমি দলের সাথে নয়, দল ছেড়ে সামনে চলে যেতাম। দু'বার আমি ধরা পড়ে গেলাম। কেমন করে ফিরব তার চিন্তা করিনি। দলের কেউ তা স্মরণ করিয়েও দেয়নি। ফলে আস্তানায় ফিরে দেখি, দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। পরের দিন যা হবার তাই হলো। দ্বিতীয়বার আমাকে বলা হলো, আর করবি তো মজা দেখিয়ে দেব। এবার আমি ভয় পেলাম এবং ঠিক করলাম, আর যাবো না। কিন্তু বৃথাই সে চিন্তা। তিনবারের পরই ধরা পড়লাম। আসলে যে দারোয়ান দরজা বন্ধ করত, আমার ওপর ওর নজর ছিল। আর তাই আমার ফেরার আধঘণ্টা আগেই ও গেট বন্ধ করে দিত। একবার দুই স্যাঙ্গাত নিয়ে ফিরে আসছিলাম। আধা মাইল দূর থেকেই গেট বন্ধের আওয়াজ শুনলাম। আমি দৌড় লাগালাম। দূরে গেটের ঘণ্টার আওয়াজ শুনলাম। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। শরীর আমার ঘামে ভিজে গেল। আমার হৃৎকম্প হচ্ছিল। দূর থেকে আমি সৈনিকদের শিবিরে ফেরার দৃশ্য দেখছিলাম। আমি আরও জোরে ছুটলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুদ্ধকণ্ঠে আমি চিৎকারের চেষ্টা করলাম। কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো। আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। বিশ পা দূর থেকেই দেখলাম গেটের কপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিউগল বাজছিল। দরজা বন্ধ হচ্ছিল। আর কি চরম ভাগ্য আমার জন্য অপেক্ষা করছিল তার চিন্তায় আমি উদভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম।...

[ভীত, ক্লান্ত রুশো চরম দন্ডের ভয়ে দুর্গের দরজার বাইরে থেকে পলায়নের সিদ্ধান্ত নিল।]

পাঠকদের বরং একটু বলি : যদি সেদিন কোনও ভাল মানুষের হাতে আমি পড়তাম তাহলে আমার অস্তিত্বটি কী হতে পারত— একজন দিন মজুরও যদি আমি হতে পারতাম, তাহলে তার শান্ত পরিবেশে হয়ত আমার রুচির তত বিকার ঘটত না। আমার মনের এবং কল্পনার তেমন জোর ছিল না যাতে যে কোনও খারাপ পরিস্থিতিকে আমি আনন্দজনক করে তুলতে পারতাম। এ থেকে আমি এই বলতে পারি, এমন একটি উদ্বেগমুক্ত জীবন যদি আমি পেতাম তাহলে আমার নিজের মনমতো একটি ঘর আমি তৈরি করতে পারতাম, খ্রিস্টান ধর্মের এক বিশ্বাসী সন্তু হওয়াও আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। তখন আমার একটি সংসার হতো। সন্তান-সন্ততি হতো। একজন আদর্শ পিতায়ও আমি পরিণত হতে পারতাম। পরিণামে শান্তভাবেই আমি প্রস্থান করতে পারতাম এবং শান্তভাবে আমি বিস্মৃত হয়ে যেতেও পারতাম। হয়ত তখনও কেউ থাকত যার হৃদয় থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরুত : ও মরে গেল! তাতে আমার কোনও দুঃখ থাকত না। একটি মমতাময় সংসারের কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার ভাগ্য
না, সে ভাগ্য আমার হয়নি। আর হয়নি বলেই আমাকে বিবৃত করতে হবে আমার জীবনের সব দুর্ভাগ্যকে। আমার পাঠকদের কাছে একটা দুর্ভাগার কাহিনীই আমি বিবৃত করতে পারি। কারণ এর কোনও উপায়ান্তর নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পুস্তক

[১৭২৮-১৭৩১]

মনে আমার ব্যথা যতোই লাগুক, একবার যখন মনে হলো এই যাতনা থেকে পালাতে আমার হবেই, তখন সে সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে আর দুঃখ নয়, বেশ ভালই লাগল। অথচ আমার সেই কিশোর বয়সে, যে শিক্ষানবিসির কাজটা করছিলাম তার অর্ধেকও শেষ না করে আমার আত্মজনদের আশ্রয় পরিত্যাগ করে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য বেরিয়ে পড়ার মধ্যে কোনও রোমান্টিকতার ব্যাপার ছিল না। ছিল কঠিন এক বাস্তবে নিক্ষিপ্ত হওয়া। জীবিকা অর্জনের উপায়শূন্য, একটা নিষ্পাপ জীবনকে বাস্তব জগতের মারাত্মক সব আকর্ষণ আর বিকাশের মধ্যে নিজেকে টেনে নেয়ার ঘটনাটার কথা স্মরণ করলে এখনও আমি শিউরে উঠি। যে নির্যাতনের জীবন আমার কাছে সহ্যের অতীত বলে মনে হয়েছিল, তার চাইতে বহুগুণ অধিক কষ্ট, সহায়-শূন্যতার— হতাশার জীবনের মধ্যে যে আমাকে নিত্য মুহূর্তে যাতনা ভোগ করতে হবে, এমন অবস্থার কথা আমি আগে কল্পনা করতে পারিনি। অথচ কী কল্পনাই না আমি করেছিলাম। তখন আমার একমাত্র চালিকাশক্তি ছিল আমার স্বাধীনতার স্বপ্ন। আমি স্বাধীন হয়েছি। আমি এখন আর কারোর দাস নই। কারোর চাকর নই। কারোর হুকুমদার নই। এখন আর কী? এখন আমি যা ইচ্ছা করতে পারি। যা ইচ্ছা তা আমি লাভ করতে পারি। কেবল ইচ্ছা করলেই হলো। এখন আমি পরীর মতো বাতাসে উড়তে পারি। যেন এই দিগন্ত বিস্তৃত বিশ্বে আমার কোনও ভয় নেই। ভয়ের কোনও কারণ নেই। এখন থেকে সর্ব সাফল্যে আমি খ্যাতিমান হয়ে উঠবো। প্রতিটি পদক্ষেপে আমি লাভ করব আনন্দ আর রত্ন আর সম্পদ। এখন আমার কেবল অভিযান আর অভিযান। দু:সাহসিক অভিযান! স্যাঙ্গাতের আমার অভাব হবে না। আমার হুকুম মাত্র ওরা আমাকে মান্য করবে। আমার মক্ষীরানীদেরও অভাব ঘটবে না। আমাকে আনন্দ দানের জন্য তারা উদগ্র হয়ে আছে। এখন কেবল আমার কামনা। সমগ্র পৃথিবীকে আমি কামনা করতে পারি। আবার ভাবলাম, এত পেয়েই বা আমি কী করব। একটি মনোহর জগৎই আমার জন্য যথেষ্ট। এর অধিক চিন্তা করে আমি কী করব। আমার বিনম্র চিন্তা হলো এমন একটি সুজন আর সুহৃদমণ্ডলী যেখানে আমি হব রাজা। আমি হব সার্বভৌম। আমার একটা দুর্গ হবে, আমার কামনার উত্তুঙ্গতায় যে উন্মুক্ত এবং উচ্চ। সে দুর্গে আমি হব প্রভু এবং প্রভুপত্নী উভয়েরই প্রেমাস্পদ, কামনার পাত্র। তাদের কন্যারা হবে আমার প্রেমের পাত্রী। তাদের পুত্রগণ হবে আমার সখা। তাদের প্রতিবেশীদের আমি হব মহারক্ষক। এমন কল্পনায় আমি আমার সমগ্র অস্তিত্বে পূর্ণ হলাম। অভিষিক্ত হলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[কিন্তু হা হতোস্মি : একটা ক্যাথলিক ধর্মযাজকের সে পাল্লায় পড়ল : তার নাম ছিল মশিয়ে দায় পল্টভেরী। এই পাদ্রী তাকে নিয়ে গেল তার এক নতুন ধর্মান্তরিতের নিকট : অ্যানেসিতে এক মাদাম দ্যঁ ওয়ারেনসের কাছে। তার পরের কাহিনী]

হ্যাঁ, শেষতক আমি মাদাম দ্যা ওয়ারেন্‌সের কাছে নীত হলাম। তার সামনে আমি হাজির হলাম। আর সেই ঘটনাই আমার জীবনের এই পর্যায়ের ভাগ্য যেন নির্ধারিত করে দিল। এই ঘটনার স্মৃতিকে আমি এখনও হাল্কাভাবে উড়িয়ে দিতে পারিনে।

মাদাম দ্যা ওয়ারেন্‌সের কাছে নীত রুশো

আমার বয়স তখন ষোল বছরের মধ্য ভাগ। পরম সুন্দর বালক ছিলাম কী-না তা জানিনে। তবে আকর্ষণীয় তো বটেই। আমার পা দু'টি দেখতে অবশ্য খুব সুন্দর ছিল। স্বভাবে, আচরণে স্বত:স্ফূর্ত, স্বাভাবিক। একটি ছোট্ট সুন্দর মুখ। একটু গভীরে প্রবিষ্ট দু'টি চোখের তারা। ক্ষণে ক্ষণে সে দু'টি যেন ঔৎসুক্যে এবং আমার টগবগের রক্তের পেষণে অক্ষিগোলক থেকে উঁকি মারছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, এখন বলছি বটে, কিন্তু তখন আমি আমার দৈহিক সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আদৌ সজাগ ছিলাম না। এবং আমার জীবনে আমি আমার দেহের সৌন্দর্য বা আকর্ষণের বিষয়ে কখনও চিন্তা করিনি। কিন্তু অবশেষে সে দিকটায় যখন দৃষ্টি পড়ল তখন অনেক বিলম্ব ঘটে গেছে। দেরি হয়ে গেছে। ততদিনে আমার বয়সুলভ ভীরুতার মনে যুক্ত হয়ে উঠল একটা আকর্ষণীয় বিনম্র আচরণ। আমার ভয় দাঁড়াল পাছে আমি কাউকে আঘাত দিয়ে ফেলি। পাছে কেউ আমার ওপর কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। তাছাড়া আবার মনের গঠন ভাল হলেও আমি তখন জগৎ কাকে বলে তা চিনিনি। সামাজিক, সম্ভ্রান্ত বংশীয় আদব-কায়দা কাকে বলে তা আমি একেবারে জানতামই না। আমার যা জ্ঞান তা আমার এই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার বদলে আমাকে সর্বদা একটা চাপের মধ্যে রাখত। আমার মনে হতো, আমার কিছুই তো নাই। এই সমাজের সভ্যতা কিছুই আমার নাই। এখন আমি কী করব?

ফলে আমার ভয় কেবল বৃদ্ধি পেল, পাছে মাদাম ওয়ারেন্স আমার প্রথম দর্শনেই আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। তাই কেমন করে আমি তাকে তুষ্ট করতে পারি তার চিন্তাতেই আমি আরও ভয়ার্ত আচরণে রপ্ত হতে লাগলাম। মাদামকে উদ্দেশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে আমি আমার শিক্ষানবিসের বইপত্রের ভাষা থেকে উদ্ধৃত করে এক পত্র রচনা করে ফেললাম। মাদামের স্নেহ লাভের কামনায় আমি কোনও শব্দ ব্যবহারেই কার্পণ্য করলাম না। একেবারে উদার এবং উদগ্র হয়ে নিজেকে প্রকাশ করার প্রয়াস পেলাম। আমি মসিয়ে পল্টভেরার সুপারিশ পত্রও আমার পত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দিলাম এবং তাকে সঙ্গে করে একবার তার সাক্ষাৎকারে হাজির হলাম। সে এক ভয়ার্ত সাক্ষাৎকার। সেদিন মাদাম দ্যা ওয়ারেন্স বাড়িতে ছিলেন না। এ হচ্ছে ১৭২৮-এর এক রবিবারের কথা : 'পাস-সানডে' বলে কথিত এক রবিবার। শুনলাম মাদাম গির্জায় গেছেন। এ কথা শুনে অমনি আমি ছুট লাগালাম। তখনও তিনি গির্জায় পৌঁছাননি। আমি ধরে ফেললাম। আমি সম্মুখপানে দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে তার সুন্দর পা দু'টিকে চুম্বনে চুম্বনে অভিসিক্ত করলাম। এ দৃশ্য যে কতবার আমি স্মরণ করার চেষ্টা করেছি। যে স্থানটিতে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, আমি যদি পারতাম, আমি তাকে সোনার রেলিং-এ ঘিরে দিতাম। এবং সেই রেলিং-এর গায়ে আমি খোদিত করে দিতাম জগতের মুক্তির আর্ত আবেদন। তাই তো স্বাভাবিক। তাই তো উচিত। তুমি যদি তোমার মুক্তির মঞ্জিলে যথার্থই পৌঁছ, তবে তোমাকে অবশ্যই নতজানু হতে হবে!

ঘটনাটি ঘটেছিল তার বাসগৃহের পেছনে একটি ঝরনা দ্বারা বিভক্ত বাগানে যাওয়ার পথটিতে। মাদাম দ্যা ওয়ারেন্স তার গৃহে-প্রবেশের মুহূর্তটিতে আমার কণ্ঠ শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন। তার সে দৃষ্টিতে কি ছিল! আমি মুহূর্তেই যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম তিনি হবেন এক ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসিনী : এক গম্ভীর মুখাবয়বের ভিক্ষু। অথচ আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অনিন্দ্যসুন্দর একটি মুখ। তার নীল অক্ষি দু'টি কী মনোহর, তার কী দুর্বার আকর্ষণ! মমতায় মণ্ডিত। রঙের কি বাহার, বক্ষ দু'টি কত উন্নত! প্রায় কিশোর একটি ধর্মাশ্রয়ীর চোখে তার দেহ সৌষ্ঠবের কিছুই দৃষ্টির আড়ালে থাকেনি। আমি যেন মুহূর্তের মধ্যে তার অচ্ছেদ্য অস্তিত্বের অংশ হয়ে গেলাম প্রচারিত ধর্ম আমাকে মহান স্বর্গ বৈ কোনও দেশে নিয়ে যাবে! স্ফীত মুখে তিনি আমার কম্পিত হস্ত থেকে আমার প্রার্থনা পত্রটি তার হাতে তুলে নিলেন। তিনি মসিয়ে পাল্টিভেরীর সুপারিশটি পাঠ করলেন। আবার যেন সেটি পাঠ করতে যাচ্ছিলেন, তখনি তার ভৃত্যটি বলল : মাদাম, এখন আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে। তিনি পদক্ষেপ দিয়ে এমন কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'আহা প্রিয় বৎস, তুমি তোমার এই কচি বয়সে এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছ?' তার কণ্ঠের শব্দ আমার আপাদমস্তক শিহরিত করে তুলল। 'তোমাকে দেখে আমার করুণা হচ্ছে।' আমার কোনও জবাবের অপেক্ষা না করে তিনি আবার বললেন : তুমি এর সঙ্গে ভেতরে যাও এবং তোমাকে সকালের কিছু নাশতা দিতে বল। আমি আসছি। আমার প্রার্থনার পরে আমি এসে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

[এই পর্যায়টিতে জ্যাঁ জাক মাদাম ওয়ারেনস-এর বিগত জীবনের নানা চিত্তাকর্ষক কাহিনীর উল্লেখ করছেন। জ্যাঁ জাকের চেয়ে মাদাম ওয়ারেলসের বয়স তখন বার বছরের অধিক ছিল। জ্যা জাঁক তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দিচ্ছেন।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে তখন প্রশ্ন জাগল : এখন আমি কী করব? আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ করার জন্য তিনি আমাকে মধ্যাহ্ন আহার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। মধ্যাহ্ন আহারে বসে আমার মনে হলো জীবনে এই যেন প্রথম আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব বিস্মৃত হয়েছি। তার যে দাসীটি আমাকে আহার পরিবেশন করছিল সে বলল : এমন শিশুকে এমন দুরবস্থায় আমি আর কখনও দেখিনি। তার এই মন্তব্যটিতে আমি বিস্মিত হলাম না। বরং আমার দৃষ্টি গেল আমাদের খাওয়ার টেবিলেই উপবিষ্ট হাভাতে ক্ষুধার্তের দিকে। তার ভক্ষণের দৃশ্যই আমাকে বিস্মিত করেছিল। সে ইতোমধ্যেই দু'জনের আহার ভক্ষণ করে ফেলেছে। আমার ব্যাপারটা দাঁড়াল সংকটজনক। আমি তখনও যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আমার পক্ষে কিছুই খাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। অন্তরে যেন অনাস্বাদিত অনুভূতির সৃষ্টি হলো। এ অনুভূতি আমার সমগ্র অস্তিত্বকে যেন গ্রাস করতে উদ্যত হলো। ফলে আর কিছুতেই আমি মনোযোগ দিতে সক্ষম হলাম না।

এবার মাদাম ওয়ারেন্স আমার অবস্থা সম্পর্কে কথা তুললেন। আমি কোথায় কীভাবে থেকেছি, তার কথা জানতে চাইলেন। তার কথার জবাব দিতে গিয়ে যেন আমি আবার আমার হৃদয় তরঙ্গকে ফিরে ফেললাম। আমার শিক্ষানবিসির দুর্দশাগ্রস্ত অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে গেলাম। আমি যত আমার অতীতের কথা তাকে বলতে থাকলাম তত তিনি আমার জন্য তার আন্তরিক সমবেদনাকে প্রকাশ করলেন। তিনি আমাকে আবার জেনেভাতে ফেরত যেতে বললেন না। যেন এমন করাটা তার ক্যাথলিক বিশ্বাসের প্রতিই অধার্মিক আচরণ করা হবে। তিনি জানতেন আমি তার প্রতিটি শব্দকে কেমন মোহগ্রস্তের মতো আমার হৃদয়ে গ্রহণ করছি। কিন্তু তিনি আমার পরিত্যক্ত পিতার জন্যও এত সমবেদনা বোধ করছিলেন যে তার পক্ষে স্বাভাবিক হতো আমাকে উপদেশ দিয়ে বলা : বাছা, তুমি তোমার দু:খি বাবার কাছে ফিরে যাও। তাকে তোমার সান্ত্বনা প্রদান কর। আসলে তিনি বুঝতে পারছিলেন না, আমার প্রতি তার মনের মুগ্ধতা প্রকাশের কী ব্যর্থ চেষ্টাই না তিনি করে চলেছেন।

পাঠকরা বুঝতে পারছেন, আমার মন আমি ইতোমধ্যে তৈরি করে ফেলেছি। আর তিনি যতই আবেগ দিয়ে আমাকে ফেরত পাঠাতে চাচ্ছিলেন আমি ততই তাকে আঁকড়ে ধরছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম আমি তার এমন পরামর্শে যদি সত্যই জেনেভা ফিরে যাই তাহলে আমি আর তার কাছে প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হব না। তার এবং আমার মধ্যে একটা অপরিপূর্ণ বিচ্ছেদের সৃষ্টি করবে। আর তাই আবার সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি আর পিছু হটব না। যা থাকে আমার ভাগ্যে। আর তাই আমি দৃঢ় রইলাম। একটুও নড়লাম না। মাদাম ওয়ারেন্স দেখলেন তার কোনও কথায় কাজ হচ্ছে না, তখন যেন তিনিই আমার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। আমার দিকে তখন তিনি করুণার চোখে তাকিয়ে বললেন : আহা বাছাধন, আমি কী করব! গড যেখানে তোমাকে আহ্বান করবেন, তুমি অবশ্যই সেখানে গমন করবে। গড তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু যখন তুমি বড় হবে, তখন নিশ্চয়ই এই বৃদ্ধার কথা তোমার স্মৃতিতে আসবে। আমি জানি তিনি তখনও জানতেন না কী নির্মম ভবিষ্যদ্বাণীই তিনি সেই ক্ষণে আমার সম্পর্কে উচ্চারণ করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[এবার ঠিক হলো যে, রুশো তুরিনে যাবে এবং সেখানে সে ক্যাথলিক ধর্মান্তরকৃতদের আবাসনে অবস্থান করবে।]

আমার বাবার কথা আবার বলছি। আমার বাবা কেবল যে একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাই নয়, তিনি যথার্থই একজন উন্নত স্তরের মানুষ ছিলেন। তার অন্ত:করণ এত বৃহৎ ছিল যে কোনও মহৎ কর্ম থেকেই তিনি নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারতেন না। এছাড়াও আমাকে বলতে হয় তিনি আমার জন্য একজন হৃদয়বান পিতা ছিলেন। অপর কারোর চাইতে আমার প্রতি তিনি মমতায় অধিকতর পূর্ণ ছিলেন। তিনি আমাকে ভালবাসতেন গভীরভাবে। তিনি নিজে তার আনন্দকে উপভোগ করতেন। কিন্তু আমি সে কৈশোর থেকে তার নৈকট্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম তাই তার নিজের অপরাপর দায় দায়িত্ব আমার প্রতি তার স্নেহ-ভালবাসার উষ্ণতাকে হয়তো কিছুটা হ্রাসও করে দিয়েছিল। তিনি নিয়ন শহরে দ্বিতীয়বার এক মহিলাকে বিয়ে করেন। যদিও সে মহিলার পক্ষে সম্ভব ছিল না আমার নতুন কোনও সহোদরকে জন্মদানের, তবু তার নানা সম্পর্ক ছিল। ফলে আমাদের পারিবারিক জীবনে কিছুটা বিশৃঙ্খলা তথা বিভক্তি এল। অন্য পরিবার তৈরি হলো। আর সে কারণে আমি হয়তো আমার পিতার স্মৃতিতে আগের মতো আবেগময়ভাবে জাগরিত হতাম না। আমার পিতার বয়স বাড়ছিল। তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। তার আয় উপার্জনও অপ্রতুল হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। কিন্তু আমার যে এক সহোদর ছিল সে এবং আমি, আমরা দু'জনে আমার মাতৃকুলের কিছু সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলাম। সেই সম্পদের ওপর প্রাপ্য সুদ বা লাভ আমি এবং আমার সহোদরের অনুপস্থিতিতে তিনি ভোগ করতে পারতেন। অবশ্য তিনি এভাবে তেমন ভাবেননি, এই সম্পত্তির কথা। আর তাই আমার প্রতি তার দায়িত্ব পালনে তিনি কখনও অবহেলা করেননি। তবু কোনও কোনও ক্ষেত্রে অচেতনভাবে হলেও তার স্নেহের উষ্ণতার কিছুটা ম্লানতা আমার মনকে বেদনাসিক্ত করে তুলত। হয়তো এ কারণেই আমি বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পরে তিনি আমার অনুসন্ধানে আর তত নিজেকে নিযুক্ত করেননি। একবার অ্যানেসিতে গিয়েছিলেন কিন্তু চাম্বেরিতে যাননি। সেখানে গেলে তিনি আমাকে ধরে ফেলতেন। আর সে কারণেই আমার বাড়ি ছাড়ার পরে যখনি আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম তখন তিনি অবশ্যই পিতার স্নেহ দিয়ে আমাকে আদর করতেন, কিন্তু আমাকে ধরে রাখার জন্য তত চেষ্টা করতেন না। আমার পিতা, যার সততা এবং মমতার কথা আমি গভীর জানতাম, তবু তার এই পরিবর্তন যে আমার চিন্তার ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন না এনেছে, তা নয়। আমি ব্যাপারটা নিয়ে একটু নিরাসক্তভাবে চিন্তা করেছি। এতে আমার লাভই হয়েছে। আমি এর মধ্য দিয়ে বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের কতর্ব্যের সঙ্গে যদি কোনও অবস্থায় স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হয়, তাহলে এমন অবস্থা আমাদের পরিহার করাই উচিত। কারণ তখন অন্যের দুঃখ থেকে নিজের সুখ লাভের একটা ইচ্ছার জন্ম হয়। কারণ এমন অবস্থায়, ন্যায়ের প্রতি আমার আনুগত্যবোধ যতোই হোক না কেন, আমাদের নিজেদের অজ্ঞাতেই আমাদের নৈতিক বোধ এবং আনুগত্য আজ না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোক, কাল দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। তখন ক্রমান্বয়ে আমাদের অসৎ এবং দুর্বিনীত হতেও আমাদের বাঁধবে না। আমার এই বোধটা বিলম্বে হলেও, বাস্তব জগতে অপরের চোখে আমার আচরণ অনেক সময়েই অস্বাভাবিক এবং নির্বোধ সুলভ বলে বোধ হয়েছে। বিশেষ করে আমার পরিচিতজনরা আমাকে অদ্ভুত এক প্রাণী বলে মনে করতে লাগল। আমাকে তারা, আমি বাহাদুরির ভান করছি বলে আমার ওপর দোষারোপ করেছে। আসলে অপর কারোর থেকে ভিন্ন হওয়ার ভাব আমি কখনও দেখাইনি। আমি যা সঠিক মনে করতাম তাকে সাধন করারই চেষ্টা করতাম। কারোর স্বার্থ ক্ষুণ্নকারী অবস্থা থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার আমি চেষ্টা করেছি। তাতে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়তো তারা নিজেদের আহত বলে বোধ করেছে।
বছর দুই আগের কথা। আমার লর্ড মার্শাল বললেন : আমি তোর নাম আমার উইলের মধ্যে রেখে যাব। আমি তার এই প্রস্তাবে যারপরনাই আপত্তি জানালাম। আমি তাকে বললাম : দোহাই আপনার, এই কাজটি আপনি করবেন না। সারা পৃথিবীর বিনিময়েও আমি এটা চাইব না। শেষপর্যন্ত আমার কথায় তিনি দমলেন। বললেন : ঠিক আছে, তোর কথা আমি মানলাম। তবে তোর জন্য আমি একটা আজীবন পেনশনের ব্যবস্থা করব। তার এ প্রস্তাব আর স্বীকার না করে পারলাম না। অবশ্য এ ব্যাপারে আপনারা বলতে পারেন : শেষ পর্যন্ত নিলে তো! তা আমি স্বীকার করি। তবু আমি নিজের মনে আজো বলি, হে আমার মহা-উপকারী এবং পিতা: আপনার ইচ্ছাটি মহৎ। কিন্তু ঈশ্বর না করুন আপনার মৃত্যুর পরেও যদি আমি বেঁচে থাকি তবে আপনার মৃত্যুতে আমার অপকার বৈ কোনও উপকার ঘটবে না। আপনার মৃত্যুর পরে আমার কিছুই থাকবে না। আগে যা কিছু ছিল তার কিছুই আর থাকবে না? এ সত্যকে আমি অস্বীকার করি কী করে?
আমি মনে করি, এটাই মানুষের আসল দর্শন। আমি এই দর্শনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি। শুভাকাঙ্ক্ষী ভাল। কিন্তু আসল ভাল নিজের ওপরই নির্ভর করে। অপরে যতোই শুভেচ্ছা প্রকাশ করুক না কেন। একথা অন্যকে বোঝানো শক্ত। তবু আমি মনে করি, আমার হয়তো এখন যে কাজ আছে, তা শেষ করে আমার 'এমিলির'[১] মধ্যে আমার এই চিন্তাটিকে আরও বিস্তারিত এবং আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করার চেষ্টা করব। তখন পাঠকরা আমার চিন্তাটি ভাল করে বুঝতে বাধ্য হবে। কিন্তু এ বিষয়ে এখন আর না। এখন আমি পদাতিক। আমি একটা লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। তুরিনকে সামনে রেখে।

[রুশোর তুরিন যাত্রাটি তার জন্য যেমন সুখদায়ক তেমনি বিশেষ অভিজ্ঞতাপূর্ণও হয়েছিল।]

সত্যিই তুরিন যাত্রাটি আমার একটা তীর্থ দর্শনের মতো কাজ করেছে। তুরিন যাত্রার স্মৃতিটি আমাকে এখনও উদ্দীপিত করে। সেটা ছিল একটা পাহাড়ি পথের যাত্রা। সেই কিশোর কালের পরে এমন করে আর কখনও আমি পায়ে হাঁটিনি। এই পদযাত্রায় সুখ বৈ কোনও দুঃখ ঘটেনি। কর্তব্য বলি কর্তব্য, বোঝা বিড়া ঘাড়ে করে বহন করার কথা বলে তাকে বহন করেছি। পরে অবশ্য আমাকে আর একটু ভদ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে হয়েছে। আমি একটা যাত্রী কোচও ভাড়া করেছি। তুরিন পর্যন্ত আমার কোনও ক্লেশ ঘটেনি। প্যারিসে পৌঁছার পরে আমি চেষ্টা করলাম আমার স্বভাবের আর দু'জনকে যোগাড় করতে পারি কিনা যারা আমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকবে। অন্তত পঞ্চাশটা লুই তারা খরচ করতে রাজি হবে। পঞ্চাশটা লুই খরচ করতে পারবে। তুরিন ইতালির একটি শহর। পথে বোঝা বইবার জন্য কেবল একটি ছোকড়াকে যোগাড় করেছিলাম। তুরিন যাওয়ার ব্যাপারটায় অনেকের উৎসাহ ছিল। কল্পনায় তারা ব্যাপারটাকে বেশ মনোহর এবং সহজ ভেবেছিল। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা তা ছিল না। দিদেরো এবং গ্রিম এই দু'জনের কথা বলছি। এই দু'জনের সঙ্গে আমি বিশেষ উৎসাহ নিয়েই কথা বলেছিলাম। প্রথমে দু'জনেই উৎসাহ দেখাল। কিন্তু বাস্তবে দেখলাম, তাদের কল্পনা কাগজে যত লেখা যায়, ততোটা বাস্তবে নয়। বাস্তবে দেখলাম স্রিমের আর উৎসাহ টিকল না। স্রিম দিদেরোকে কতগুলো অপকর্মেই জড়িয়ে ফেলল। আর আমাকে এক পর্যায়ে ইনকুইজিশনের[২] হাতে সঁপে দিল।

আমি তুরিনে পৌঁছে গেলাম। আসলে এত তাড়াতাড়ি যে আমি তুরিনে পৌঁছে যাব, তা কল্পনা করিনি। কিন্তু এটা কোনও দুঃখ বা হতাশার ব্যাপার ছিল না। আমার ভাগ্যে কোনও দুঃখ বা হতাশার ব্যাপার ছিল না। আমার ভাগ্যে ঘটল তুরিনের মতো এত বড় একটা শহর দেখার ভাগ্য। আমি ভাবলাম এবার আমার মনস্কামনা পূরণ হবে।

আমি দেখলাম আমার ভেতরে বেশ পরিমাণ বড় হওয়ার তথা বিখ্যাত হওয়ার একটা স্বপ্নের সৃষ্টি হয়েছে। কোথায় আগে ছিলাম একটা শিক্ষানবিস। কিন্তু এখন আমি সেই অবস্থা ছাড়িয়ে বহু ওপরে উঠে যাবো। কেবল এই সন্দেহটি আমার চিন্তার মধ্যে ছিল না। উপরে ওঠার বদলে যে অতলে আমি তলিয়ে গেলাম তা আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

আমার কাছে কয়েকটি পত্র ছিল। সেগুলো আমি তুরিনে পৌঁছে দেখালাম। আমার পত্র দেখে আমাকে অভ্যর্থনাকারী সাথে সাথেই ক্যাথলিক ধর্মীয় অনাথ আশ্রমে নিয়ে গেল। আমি সামনে তাকাতেই একটা বিরাটাকারের গেট দেখলাম। আমাকে গেটের ভেতরে ঢুকিয়ে একটা বড় ঘরের মধ্যে নেয়া হলো ভেতরের আসবাবপত্রের মধ্যে। ঘরের শেষপ্রান্তে একটি ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি দেখতে পেলাম। তাছাড়া সম্মুখে কয়েকখানি কাঠের চেয়ারও দেখলাম। আমার মনে হলো চেয়ারগুলোকে ঘষামাজা করে মসৃণ করা হয়েছে। আসলে এই মসৃণতা এসেছিল চেয়ারগুলোর প্রতিদিনের ব্যবহারের মাধ্যমে। এ হলঘরের মধ্যে আমার চোখের সামনে দেখলাম চার চারটা ভীতিজনক মাস্তানজাতীয় জীব। এদের আর যা কিছুই ভাব থাক না কেন এদেরকে কোনও ঈশ্বরের সন্তান বলে কল্পনা করা যায় না। এই মাস্তানগুলোর অন্তত দুইটা ছিল স্লোভানিয়ান। এরা নিজেদের বলছিল ইহুদি বা মুরজাতীয় বলে। এদের দুইটার সঙ্গে আলাপ ঘটে। আমাকে তারা বলে, তারা এতদিন মুক্তির খোঁজে স্পেন এবং ইতালি ঘুরে বেরিয়েছে। এখন এখানে যখন পৌঁছতে পেরেছে তখন তারা ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবে। এর পরে আর একটা লোহার দরজা খুলে দেয়া হলো। এর মধ্য দিয়ে দেখা গেল যেন সামনের আঙ্গিনাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই দরজার মধ্য দিয়ে এবার সিসটারস বা সন্ন্যাসিনীর দল এসে প্রবেশ করল। এদেরও এবার নবজীবন বা ধর্মান্তকরণ ঘটবে। এরাও এবার নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন ধর্মে জীবন লাভ করবে। এদের দিকে আমার চোখ তুলে তাকাতে ইচ্ছা করল না। দেখতে যেমন বদখত তেমনি মনে হলো এরা গণিকা বৈ আর কিছু নয়। তবে এদের মধ্যে একটি ছিল আমারই বয়সী। একে আমার সুন্দর বলে বোধ হলো। আমার বয়সী, কিংবা দু'তিন বছর বড়ও হতে পারে। তার চোখ দুটোতে একটু দুর্বৃত্তপনা লক্ষ করা যাচ্ছে। মেয়েটা আমার দিকে দু'একবার দৃষ্টিও ফেরাল। আমাদের যেন চক্ষু বিনিময় হলো। ফলে ভাবলাম, আমি একটু কথা বলি। মেয়েটা এই আবাসে প্রায় তিন মাস আগেই এসেছিল। আর আমি আসার পরে যে দুইমাস কেটে গেল তার মধ্যে একদিনও ওর সঙ্গে কোনও আলাপ করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। এই মেয়েটাকে যে রক্ষকদের অধীনস্থ করে রাখা হলো এবং তারাও ওকে যেভাবে কয়েদীর ন্যায় সতর্কভাবে পাহারা দিয়ে রাখল, যাতে আমার পক্ষে আদৌ ওর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হলো না। ওই রক্ষিতারা ওকে যতো-না বুদ্ধির সঙ্গে, তার অধিক দেহের জোরে যেন ওকে ধর্মান্তকরণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। মেয়েটাকে আমার নির্বোধ বলে মনে হলো। ধর্ম শিক্ষার ব্যাপার যদি হয় তাহলে কোনও মানুষেরই এত অধিক সময় লাগার কথা নয়। যে পাদ্রী ওকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্বে ছিল সে ক্রমান্বয়ে হতাশ হয়ে উঠল। ভাবল, এর দ্বারা তার পাপের স্বীকারোক্তি আদায় করা আদৌ সম্ভব হবে না। মেয়েটাও ক্রমান্বয়ে তার এই ধর্মীয় বন্দিত্বে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। অবশেষে সে বলেই ফেলল : খ্রিস্টান আর অখ্রিস্টান যাই হই না কেন, আমি এখানে থাকব না। আমি চলে যাবো। তার দীক্ষা দাতারা ভাবল, অধিক জবরদস্তি করলে শেষে একেবারেই অস্বীকার করবে।

এবার নবাগতের সম্মানে নিবাসের সকলের একটি সমাগম ঘটানো হলো। পাদ্রীদের পক্ষ থেকে প্রথমে একটি বক্তৃতা প্রদান করা হলো। এই বক্তৃতার প্রধান লক্ষ্য হলাম আমি। 'বৎস্য! তুমি ভেবে দেখ। তুমি স্বীকার কর। ঈশ্বর তোমাকে কী ভাগ্যে ভাগ্যবান করেছেন।' অপর সকলকে বলা হলো : তোমরা সকলে ওর মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর এবং তোমাদের আচরণ দ্বারা ওকে অনুপ্রাণিত করে তোল।

এর পরে সন্ন্যাসিনীরা তাদের ঘরে গমন করল। ফলে আমি একটু রেগেই গেলাম। আমি এবার নিজের দিকে তাকাবার একটু ফুরসত পেলাম। আমি যে অবস্থাতে এতক্ষণে নিক্ষিপ্ত হয়েছি তার দিকে তাকিয়ে যারপরনাই বিস্মিত বোধ করলাম। ... আমি এতদিন যা মনে করেছি বা বলেছি তা কারোর শেখানো কথা নয়। আমার অভিজ্ঞতার কথা। আমি এখনও বলি, শিশুদের কাছে ধর্মের কথা বলা উচিত নয়। তারা ঈশ্বরকে এখনও দেখেনি। ঈশ্বর তথা গড কাকে বলে তা তারা জানে না। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝেছি। আমার এ বুঝ অপর কারোর ওপর চাপানো যায় না। আমি বলি একটি ছ'বছর বা সাত বছর বয়সের এক বালক যার নাম জাঁ জ্যাক তাকে আপনারা আপনাদের সামনে উপস্থিত করুন। হ্যাঁ এরপরে অন্তত আমাকে সাত বছরের হতে দিন। তারপর আপনাদের গডের কথা কিছু বলুন। দেখবেন তাতে আপনাদের কোনও লোকসান ঘটবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিক দিয়ে একথাটা সত্য যে শিশুদের যখন আমরা ধর্মের কথা বলি তখন সেও যেমন, আমরাও তেমন মনে করি জন্মগতভাবে ও যা, সেটাই ওর ধর্ম। এই যে জন্মগত বিশ্বাস এর জোর প্রায়শই বয়োবৃদ্ধিতে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নয়। শিশুকালের এমন শিক্ষায় ধর্মীয় কতগুলো গোঁড়ামিরই উদ্ভব ঘটে। চিন্তার নয়। আমার পিতার ধর্মের প্রতি বা পারিবারিক বিশ্বাসের প্রতি আমার আকর্ষণ ব্যতীত আর একটা ব্যাপার ছিল যার দ্বারা আমার কৈশোরের ধর্মানুভূতি তৈরি হয়েছিল। সে হিসেবেই জেনেভায় আমাদের গ্রামের ধর্মীয় পরিবেশ। আমাদের গ্রামের ক্যাথলিক ধর্মের পরিবেশে আমি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠছিলাম। ক্যাথলিকবাদের আচরণের মধ্যে আমি ব্যক্তিপূজা তথা মূর্তি পূজার প্রকাশ যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার কাছে সে ছিল এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ফলে ক্যাথলিকবাদকে আমি কালো, কৃষ্ণ কালো বৈ অপর কিছু ভাবতে পারছিলাম না। এর ফলে ক্যাথলিক পাদ্রীদের আমি খারাপ বৈ ভাল ভাবতে পারিনি। গোড়ার দিকে এই বিতৃষ্ণাটা এত তীব্র ছিল যে, এর ফলে কোনও গির্জার ভেতরের কোনও সৌকর্যের প্রতি আদৌ চোখ ফেরাতে আমার ভাল লাগেনি। ধর্মের জোব্বা পরা কোনও পাদ্রীর দিকে চোখ ফেরাতে আমার ভাল লাগেনি। প্রার্থনার ঘণ্টাও যেন আমি শুনতে পেতাম না। ঘণ্টা ধ্বনির এ যন্ত্রণা শহরে তত শোনা যেত না। কিন্তু গ্রামের গির্জাগুলোর ঘণ্টার শব্দ থেকে রেহাই ছিল না। আসলে আমার এমন বোধের উৎস ছিল সেই জেনেভার আমার শৈশবের ধর্মযাজকদের শিশুদের প্রতি তাদের পিতৃসুলভ স্নেহপূর্ণ আচরণ। অবশ্য এখানেও প্রার্থনার ঘণ্টা কেবল যে ভীতিজনক ছিল, এমন নয়। প্রার্থনার ঘণ্টার সঙ্গে অবশ্যই খাবার ঘরের মাখন রুটি, আপেল এবং অন্যান্য খাবারেরও একটা প্রলোভন ছিল সেটা রোধ করা সহজ ছিল না। মশিয়ে পল্টিভারের উপাদেয় খাবারগুলোর আকর্ষণ কম ছিল না। কাজেই ক্যাথলিকদের প্রতি প্রাথমিক বিতৃষ্ণা কাটাতে আমার খুব বেগ পেতে হলো না। তখন 'প্যাপিজম' বা পোপবাদ বলতে বেশ ভাল রকমের খাবার-দাবারের একটা উদ্দীপনাও যেন যুক্ত হয়ে উঠল। তখন আর এমন আশ্রমে বাস করা তেমন কষ্টকর কিছু বলে বোধ হলো না। তবুও রোমের পোপের সন্নিধানে যাওয়ার ব্যাপারটা তখনো আমার কাছে দূর কল্পনার ব্যাপারই হয়ে রইল। এখন আমার বুঝের বয়স হয়েছে। এখন পেছনে তাকালেই বুঝি ধর্মান্তরের সম্মতিতে কী বিপজ্জনক সিদ্ধান্তই না সেদিন আমি গ্রহণ করেছিলাম। ক্রমান্বয়ে যে সব নবদীক্ষিতের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটতে লাগল, তাতে তাদের আচরণ আমার সাহসকে একটুও বৃদ্ধি করল না। মনে ক্রমান্বয়ে আমার নিজের মধ্যে এমন একটা বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হতে লাগল যে আমার ভবিষ্যতের কাজ কোনও ধর্মীয় কাজ হবে না। সে কাজ হবে দস্যুতামূলক। কোন ধর্ম ভাল বা মন্দ তা আমি আজো জানিনে। শুধু এটুকুই আমি জানি, যে ধর্মই আমি গ্রহণ করি না কেন, তা আসলে আমার নিজের চারিত্র্য-ধর্মকে বিক্রি করা ছাড়া আর কিছু হবে না।

এ নিয়ে আমি যতই চিন্তা করতে লাগলাম, ততই আমি নিজের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলাম। যেন আমি একটা চক্রের মধ্যে পড়ে গিয়েছি এরকম হলো আমার, এ আমার স্বাধীন ইচ্ছার পরিণতি নয়। এই চিন্তা ক্রমান্বয়ে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, আমি যদি তখন এই আশ্রম থেকে পালাবার পথ পেতাম তাহলে আমার যে দিকে চোখ যায় সেদিকেই চলে যেতাম। কিন্তু তখন এমনভাবে পালানোর আমার উপায় ছিল না। তেমন জোরালো ইচ্ছাশক্তিও তখন আমার ছিল না। আমার মনে তখন এত এলোমেলো চিন্তা আসছিল যে আমি কিছুই করতে পারলাম না। তাছাড়া আমি আর কিছুতেই জেনেভা ফিরে যাবো না, সেই পাহাড় চূড়া আমাকে অতিক্রম করতে হবে, তা আমি আর ভাবতেই পারছিলাম না। এখন কী করি আর করি না এই অস্থিরতার জন্য আমি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দায়ী করতে পারছিলাম না। আমি নিজের প্রতিকৃতিকেই প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করে যা কিছু ভর্ৎসনা আমি তাকেই করলাম। বললাম : তুমিই এর জন্য দায়ী। আমার অতীত সব কর্মকাণ্ডই এখন আমার কাছে গর্হিত বলে মনে হতে লাগল। আমি ভাবলাম, যে অবাঞ্ছিত ভবিষ্যৎ আমার জন্য এখন অপেক্ষা করছে, সে আমারই কর্মকাণ্ডের ফল। আমি আমার নিজের অস্তিত্বকে আর বলতে পারলাম না কী হয়েছে, সাহস হারাচ্ছ কেন? তোমার সততাকে তো কেউ হরণ করেনি। তুমি তোমার সততায় স্থির থাক। আমার প্রতিকৃতিকে এখন আমি কেবল বলতে পারলাম : 'সে দিন আমার গেছে। আর আমি তাকে উদ্ধার করতে পারবো না। আমি আর সে আমি হতে পারবো না।' সে ছিল আমার হতাশার এক চরম অবস্থা।

যে আত্মধিক্কারে নিজেকে ধিক্কৃত করলাম, সে অবস্থা আমার অকল্পনীয় নয়। যারাই এমন অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সে তার সব সন্তুষ্টি এবং উদ্যমকে হারিয়ে ফেলে। সে মনে করে তার বয়স হয়ে গেছে। সে শেষ হয়ে গেছে। আমরা আমাদের ন্যায়কে যখন হারাই, তখন সে ঘটনা আমাদেরই নিজেদের কর্মের ফল। আসলে আমরা যদি প্রাজ্ঞ হতে পারি তাহলে আমাদের অজ্ঞ হওয়ার অবস্থা ঘটে না। কিন্তু চরিত্রের প্রবণতাকে যখন প্রতিরোধ করা সম্ভব তখন তার লাগাম ছেড়ে দিলে আর তাকে ফেরানো যায় না। সে তখন ক্রমান্বয়ে অদম্য হয়ে ওঠে। তখন ক্রমে যে তুচ্ছতাকে আমি ঘৃণ্য মনে করতাম তার সাধনে আর লজ্জা বোধ করিনে। আমাদেরই অজান্তে আমরা তখন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে নিপতিত হই। অথচ একদিন আমি এ অবস্থার শিকার না হতে পারতাম। কিন্তু এখন আর শত আত্মধিক্কারেও সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। অন্তত তেমন করতে হলে যে অদম্য সাহস দরকার আমার তা তখন ছিল না। এমন অবস্থায়ই শেষপর্যন্ত আমাদের গডকে আমরা ধিক্কৃত করি। আমরা তার জবাবদিহি করি : ঈশ্বর এ তুমি কী করলে! আমাকে এমনতর দুর্বল করে কেন বানালে?

ঈশ্বর তার জবাবে বলে : আমি নই তুমিই এর কারণ। তুমি এ জন্য দায়ী। আমি তোমাকে শক্তি দিয়েছিলাম, গভীর এই গহ্বরে নিপতিত না হওয়ার। তোমার নিজের অশক্তিতে তুমি আজ এই গহ্বরে পতিত হয়েছ।

আমি তখনো এমন সিদ্ধান্ত নিইনি, যে আমি ক্যাথলিক হব। অবশ্য তেমন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় তখনও আসেনি। সামনে সময় অনেক বাকি। আমি ভাবলাম হাতে যে সময়টা আছে সেটা বরং আমি ব্যবহার করি কেমন করে এই জাল কেটে আমি বেরিয়ে পড়তে পারি। সময় পাওয়ার জন্য আমি চিন্তা করতে লাগলাম কোন্ যুক্তি আমার লাগসই হবে। কিন্তু আমার অহংবোধ থেকে এ চিন্তাও আমি বাদ দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে আমি দেখলাম যারা আমার ওপর ধর্মের মাতব্বরি করতে চাচ্ছে তারা আমার আচরণে বিরক্তি বোধ করতে শুরু করছে, তখন আমি নিজের মনে বললাম : দেখা যাবে কে কাকে শোওয়ায়?

আমি ভাবলাম, যে কয়টা আমার সামনে আসবে সবকয়টাকেই আমি শুইয়ে দেব। এবার এ ব্যাপারে আমি দুরন্ত হতে শুরু করলাম। একদিকে এরা যখন আমাকে ক্যাথলিক বানাতে শুরু করল, আমি তখন ওদের পাল্টা প্রটেস্ট্যান্ট বানাবার প্যাঁচ কষতে লাগলাম। ক্রমান্বয়ে আমার বিশ্বাস জন্মাল যে ওদের প্রটেস্ট্যান্ট বানাতে আমি সক্ষম হবই। ওদের মনে কেবল বিশ্বাস জন্মানো দরকার।

ফলটা মন্দ হলো না। আমার ওপর ওরা ওদের বিশ্বাস হারাতে শুরু করল। ওরা দেখল ক্যাথলিক হতে আমার প্রয়োজনীয় জ্ঞান আর কোনওটাই নাই।

আসলে প্রটেস্ট্যান্টদের ধর্মীয় শিক্ষা পদ্ধতি ক্যাথলিকদের চাইতে ছিল উন্নতমানের। এটাই স্বাভাবিক। কারণ একটার মধ্যে তথা প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে যেখানে যুক্তি আর আলোচনার অবকাশ থাকতো, সেখানে ক্যাথলিকদের মধ্যে একেবারে অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুরই জায়গা ছিল না। ক্যাথলিকদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল, তোমাকে যা বলা হবে, তা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে, বিনাতর্কে। প্রটেস্ট্যান্টদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল যুক্তির। তারা বলত তোমার সিদ্ধান্ত তুমি নিবে। এখানে কোনও জবরদস্তির ব্যাপার নাই। জোর নয়। যুক্তি। ব্যাপারটা জানা।

কিন্তু আমার মতো বয়স্ক আর অভিজ্ঞতার লোকের কাছ থেকে ক্যাথলিকরা কোনও প্রতিরোধেরই আশা বা আশঙ্কা করেনি। তাছাড়া আমি এখনও মন্ত্রগুপ্তির পর্যায় পার হইনি। এ ব্যাপারে যা আমার করণীয় তাও আমাকে পরিষ্কার করে বলা হয়নি। এসব ওরাও জানত, আমি জানতাম, কিন্তু যে ব্যাপারটা ওরা আমার বিষয়ে জানত না, তা হচ্ছে এই যে মশিয়ে লাম্বার্সিয়েরের কাছে আমার একটা ভিন্নরকম শিক্ষা ঘটে গিয়েছিল। তাছাড়া আমি দেখতে ক্ষুদ্র হলেও আমার মস্তিষ্কে কিছু বুঝের ঘিলু ছিল। এটা ওরা জানত না, আর এটার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ওদের ক্ষমতা ছিল না। প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্রিস্টান গির্জার কাহিনী আমি জানতাম এবং রোমান সাম্রাজ্যের জ্ঞানও আমার কিছুটা ছিল। আমার পিতার কাছে যখন আমি ছিলাম তখন এসবই আমি প্রায় কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলাম। অবশ্য ইতোমধ্যে আমি তা প্রায় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন যখন ধর্মে-ধর্মে তর্কাতর্কির ব্যাপার দাঁড়াল তখন দেখলাম আমার পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ও শক্তি আমার পাশে এসে সহায় হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

এই সময়ের একটা কথা বলি। এ সময়ে দেখলাম কিছুটা বয়স্ক এবং শ্রদ্ধাযোগ্য এক পুরোহিত একদিন আমাদের সকলকে এক সঙ্গে নিয়ে বসলেন। আমাদের পুরোহিত দেখলেন তার অধিকাংশ শিষ্যদের জন্য প্রয়োজন যত না তাদের আপত্তি বা প্রশ্নের জবাব দান, তার চাইতে অধিক তাদের মস্তিষ্কের পরিষ্কারকরণ। সোজা কথায় তাদের মগজ ধোলাই। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল ভিন্ন। তিনি যখন আমাকে নিয়ে পড়লেন, তখন তার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, এ মাল তত সোজা নয়। আর তাই তার কোনও কথাতেই আমি তাকে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলাম না। এর ফলে আমাদের তর্কবিতর্কের বৈঠকটা অপর সকলের জন্য যেমন অসহ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে দাঁড়াল, আমার জন্য তত মজাদার হয়ে উঠল। বয়স্ক, বরং বলা চলে বৃদ্ধ পুরোহিতটি যতো আমার কথার জালে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন তত তিনি আলোচনা কথার বিষয় পাল্টাতে লাগলেন : এক কথা থেকে আর এক কথায়, এক প্রশ্ন থেকে আরেক প্রশ্নে সরে পড়তে লাগলেন। শেষপর্যন্ত এমন অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি বললেন : আমি বাবা তোমার মতো ফরাসি জানিনে। পরের দিন দেখলাম আমাকে আমার অপর সঙ্গীদের সাথে এক আসরে না বসিয়ে, আমাকে একটি ভিন্ন ঘরে একজন আলাদা পুরোহিতের হেফাজতে দেয়া হলো। এবার যার হেফাজতে আমাকে দেয়া হলো তার বয়স যেমন পূর্বজনের চাইতে কম, তেমনি তাকে দেখলাম সে বাকপটুও বটে। বেশ ভাল শব্দগুচ্ছ তিনি তৈরি করতে পারতেন। এবং আমার সঙ্গে তা'র আলাপে তিনি শিক্ষক হিসেবে বিব্রতবোধ করার চাইতে আত্মতৃপ্তি বোধ করতে লাগলেন। আমি অবশ্য সতর্ক ছিলাম। অত সহজে তুমি পার পাবে না। আর যখন দেখলাম আমি তার কোনও প্রশ্নেই অবাক হচ্ছি না, ঘাবড়ে যাচ্ছি না তত আমার নিজের উপর বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমিও তার প্রতিটি প্রশ্নে পাল্টা প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। আমি শক্তিবোধ নিয়েই তার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। এবার তিনি তার জ্ঞান দিয়ে আমাকে অভিভূত করতে চেষ্টা করলেন। তিনি আমার কাছে দার্শনিক এবং সন্ত সেন্ট অগাস্টিনের[৩] কথা বললেন, সেন্ট গ্রেগরির[৪] কথা বললেন। এদের ছাড়া অন্য ধর্মপুরুষদের কথাও বললেন। এবং আমার জবাবে তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে এসব বিষয়ে তার চেয়ে আমার জ্ঞান কম নয়। এর মানে অবশ্যই এই নয় যে এই ধর্মীয় পুরুষদের সম্পর্কে আমার যথার্থই জ্ঞান ছিল। আসলে আমার চাইতে অধিক কোনও জ্ঞান এই পুরোহিতটির ছিল না। আমি এদের কোনও কিছু যে পড়েছিলাম তা নয়। তবু 'লা সিউএর ('Le Suer) থেকে স্রোত্র মুখস্থ বলতে বাঁধল না। আবার তিনি যখন অপর কোনও ধর্মগুরুর বাক্য উদ্ধৃত করলেন, আমি তার সেই ধর্মগুরুর অপর কোনও বাক্য দিয়ে জবাব দিতে শুরু করলাম। ফলে সুজন এই পুরোহিত বেশ কিছুটা বিব্রত বোধ না করে পারলেন না। অবশ্য দুটো কারণে এই তর্কের যুদ্ধে বিজয় তারই ঘটলো। কারণের একটা হলো, এই পুরোহিত আর যাইহোক বয়সে তো আমার চাইতে অধিক ছিলেন। তাই এ বিবেচনাটা আমার ছিল, এর সঙ্গে অধিক দূর আমার অগ্রসর হওয়া উচিত হবে না। আসলে আমি তো এদের জালের মধ্যে এসে গেছি। এদের হাতের পুতুল বৈ আর কিছু নই। এই পুরোহিতটি আমার জ্ঞানে যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এমন নয়। আমার জন্য তার অন্তরে তেমন কোনও স্নেহ জাগরিত হয়েছিল, এমন নয়। আর তাছাড়া অল্প বয়স্ক এই পুরোহিতটি শিক্ষিতই ছিল। আমি তো তা নই। এর ফলে সে এবার আমাকে নানা কঠিন প্রশ্নে বিদ্ধ করতে চাইল। এবার আর আমি পেরে উঠলাম না। আমার কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম হলেই বলে উঠতে লাগলেন এটা আজ থাক! আমার বিরুদ্ধেই তিনি অভিযোগ তুললেন : তুমি ছুটাছুটি এত করছ কেন? এক জায়গায় থেকে আর এক জায়গায়? এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে? মাঝে মাঝে আমার উদ্ধৃতিকে তিনি বেঠিক বলে মত প্রকাশ করে বললেন : এগুলো মিথ্যা। বলে আমাকে বই এনে দেখাতে বললেন : দেখাও কোথায় তুমি একথা পেয়েছ? এবারে অবশ্যই আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসুবিধায় পড়লাম। সে দেখল তার কৌশলটা কাজে লাগছে। আমার শিক্ষার দৌড় তো ছিল ধার করা বিদ্যার দৌড়। ফলে লোকটির বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, বই পড়ার জ্ঞান আমার নিতান্তই কম। আমি ল্যাটিনও তত জানতাম না যে একটা বড় ল্যাটিন বই এর মধ্য থেকে কোনও সূত্রকে আমি বার করে দেখাব। অবশ্য আমি জানতাম এসব বইতে আমার সব কথাই আছে। এখন দেখলাম তিনি অপর পুরোহিতদের ওপর নিজে অসত্যতার যে অভিযোগ তুলেছেন সেই অভিযোগ তিনি এখন আমার ওপরও আরোপ করছেন। এমনও হয়েছে, কোনও সূত্রকে নিজে বার করতে অক্ষম হয়ে নিজে বানিয়েই বলছেন। এভাবেই তিনি তার নিজের বিব্রতকর অবস্থা থেকে রেহাই পেতে চাইলেন।

এই রকম তর্ক-বিতর্কে যখন আমাদের সময় নষ্ট হতে লাগল, প্রায় তিক্ত-বিরক্তের শেষ পর্যায় আমরা পৌঁছলাম, তখন একটা দুর্ঘটনাই ঘটল, যেটা আমার জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল।

আসলে এমন দুরাত্মা আর বর্বর খুব কমই আছে যার মনে মায়া মমতা বলে কিছুই নাই। বা থাকে না। আমাদের মধ্যে এমন দুটা হতচ্ছাড়া ছিল যারা নিজেদের 'মুর' বলে আখ্যায়িত করত; তাদের একটার মধ্যে আমার জন্য যেন একটু প্রেমের সঞ্চার হলো। সে আমাকে সময়ে অসময়ে কাছে ডাকত, নিজেদের ভাষায় কথা বলত। আমাকে নানাভাবে আদর করতে লাগল। ওর নিজের খাবার থেকে আমাকে ভাগ দিতে লাগল। এবং মাঝে মধ্যেই আমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করত। এটা আমার ভাল লাগত না। আমি লোকটার পোড়াদাগের মুখ দেখে ভয়ই পেতাম। ওর মুখটাকে আমি নরম বলে ভাবতে পারতাম না। তবুও ওর চুম্বনের বাড়াবাড়িকে আমি অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। আমি নিজেকে বলতাম, এই বর্বরটাও তো একটা মানুষ। ও আমাকে একটু খাতির করতে চায়। তা করুক না। কিন্তু দেখলাম ওর বাড়াবাড়িটা কেবল বৃদ্ধিই পেতে লাগল। এমন সব প্রস্তাব এখন সে করতে লাগল যে আমি ওটাকে এক বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলাম না। ওটা একদিন আমার সঙ্গে বিছানায় শুতে চাইল। আমি বললাম না আমার বিছানা খুব ছোট। আমাকে বলল : তুই আমার বিছানায় আয়। আমি তাতেও রাজি হলাম না। ওর গায়ের ভোতকা গন্ধে আর মুখের তামাক চিবানোর গন্ধে আমার বমি পেতে লাগল। পরের দিন সকালে আমরা দু'জনেই হল ঘরটাতে ছিলাম। হারামিটা আবার আমাকে আদর করতে শুরু করল এবং এমন উন্মাদের মতো আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল যে আমি রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। দুরাত্মাটা ওর হাত দিয়ে আমার হাতটা ধরে ওর দিকে আকর্ষণ করতে লাগল। আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে লাফ দিয়ে হারামজাদার হাত থেকে নিজেকে ছুটিয়ে নিলাম। আমি বুঝতে পারলাম না সে কী করতে চায়। আমি হতভম্ব হয়ে পড়লাম। এবার আমায় ছেড়ে দিয়ে এমন আত্মরতি শুরু করল যে আমি দেখলাম ওর লিঙ্গ থেকে কী যেন একটা পতিত হলো। ঘৃণায় আমার পেট যেন উল্টে এল। আমি দৌড়ে অলিন্দে ছুটে এলাম। আমার জীবনে আর কখনও এমন অভিজ্ঞতা ঘটেনি। আমার শরীর যেন অসুস্থ হয়ে পড়ল।

আমি তবু বুঝতে পারলাম না দুর্বৃত্তটার হলো কী। আমার মনে হলো ওর মৃগী রোগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরেছে। নয়তো ওটাকে আরও কোনও সাংঘাতিক রোগে ধরেছে। যথার্থই তাই। আমি ওটার চেয়ে এমন অবস্থার খারাপ আর কোনও প্রাণী এ পর্যন্ত দেখিনি। এমন প্রচণ্ড লালসার প্রকাশ আমি ভাবলাম কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার যদি এমন ঘটনা ঘটে, তাহলে সেই মেয়েটা তো আমার প্রতি এমন ঘৃণাই বোধ করবে
আমি ভাবলাম এ ঘটনার কথা আমাকে বলতে হবে। আমি সকলকে বলে দেব, হারামি আমাকে কী করেছে। আমাদের তত্ত্বাবধায়ক বৃদ্ধা আমাকে সাবধান করল : খবরদার, মুখ খুলবি না। আমি দেখলাম, ঘটনাটায় সেও খুব ক্ষিপ্ত হয়েছে। মহিলা কেবল তার ভাষায় বিড় বিড় করে বলতে লাগল : কুকুরের বাচ্চা, পিশাচের অধম! আমি বুঝলাম না এই আয়াটা আমাকে নিষেধ করছে কেন। আমি তার নিষেধ না শুনে এমন সব কথা বলতে লাগলাম যে পরের দিন সকালে আর একটা রক্ষক এসে আমাকে সাংঘাতিক ধাতানি দিতে শুরু করল। বলল : তুই-ই এ জন্য দায়ী। আমাদের পবিত্র আশ্রমকে তুই অপবিত্র করেছিস। আর একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুই এত হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিয়েছিস। তুই-ই যত নষ্টের মূল।

এই লোকটা তার বক্তৃতায় এবার এমন সব ব্যাপার বলতে লাগল যার সম্পর্কে এতদিন আমি কিছুই জানিনি। লোকটা ভাব দেখাল যেন এসবই আমি জানতাম। আসলে আমি লোকটার কথায় রাজি না হয়েই অপরাধ করেছি। উপরন্তু সে আমাকে বলল : এমন কাজে বাধা দান আমাদের ধর্মের বিরোধী। যেন ওই লোকটার কোনও দোষ নেই, দোষ আমার। আমাকে লোকটা আদর করতে চেয়েছে, এটা যেন আমার ভাগ্যের ব্যাপার! সে আমাকে বলল : আমার ছোট বেলায়ও তো আমি এমন করেছি। তাতে কী হয়েছে? একজনে এমন করে ধরলে ছটফট না করাই ভাল। বাধা না দিলেই বরং আরাম। এই হারামজাদাও এমন নির্লজ্জভাবে কথা বলছিল যেন আমার আপত্তির কারণ ছিল দৈহিক যাতনার আতঙ্ক। আসলে আমার ঘৃণা নয়। ব্যাটা বলল : এতে ভয়ের কিছু নাই। আর তাই আমার এমন অবস্থায় ভীত হওয়ার কিছু নাই।
আমাকে এই পিশাচের বক্তৃতা শুনতে হলো। যেন লোকটা খারাপ কিছু বলছে না। লোকটা আমার ভালর জন্য উপদেশ দিচ্ছে। ব্যাপারটাকে সে এমন সরল এবং স্বাভাবিক বলে ভাবল যে এটাকে আর গোপন রাখার কোনও প্রয়োজনই সে বোধ করল না। আমাদের এ আলাপ একজন ধর্মযাজকেরও কানে গেল। আর সেও যেন এতে কোনও খারাপ কিছু দেখল না। এসব আচরণকে এরা এমন স্বাভাবিকভাবে মনে করতে লাগল যে শেষে আমারই মনে হতে লাগল যেন এই জগতে এটাই স্বাভাবিক। আমার অপরাধ আমি এটা এতদিন জানতাম না। ফলে এখন থেকে এ সমস্ত আলাপে যেন আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলাম। রাগের চাইতে ঘৃণাতে আমি দগ্ধ হতে লাগলাম।
কিন্তু ব্যাপারটা আমার স্মৃতিতে এমনভাবে আটকে রইল যে, যা আমি নিজের চোখে দেখেছি, তা আমি কিছুতেই আমার মন থেকে তাড়াতে পারছিলাম না। ফলে ঘটনাটার কথা মনে হলেই আমার শরীর ঘৃণায় রি রি করে উঠত। আমি এর আদি অন্ত কিছুই বুঝতে পারলাম না। ফলে আবার ঘৃণা যেটা আমাকে নির্যাতন করেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার চাইতে যারা তাকে সমর্থন করছে তাদের ওপরই বিস্তৃত হতে লাগল। ফলে আমার ওপর নীতিজ্ঞানের এমন বক্তৃতার বিরুদ্ধে আমার ঘৃণা প্রকাশ না করে পারলাম না। তার এমন উপদেশের মারাত্মক পরিণতির কথা আমি জোরের সঙ্গে প্রকাশ করার চেষ্টা করলাম। এতে এই পাদ্রী আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যাতে আমার প্রতি মমতা বা সহানুভূতির কোনও প্রকাশ দেখলাম না। বরং এখন থেকে এই আশ্রমে আমার অবস্থানকে রোজকে রোজ অধিকতর অসহ্য করে তুলল। এ ব্যাপারে লোকটা এত সফল হয়ে উঠল যে এবার আমি যে সাহস এতদিন করিনি সেই সাহস করার জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলাম। এতদিন যত না প্রতিরোধ করেছি, এখন তার চাইতে অধিক আমার সিদ্ধান্তে অটল হয়ে উঠলাম।

[রুশোকে কিন্তু শেষপর্যন্ত ধর্মান্তরিত করা হলো। তাকে রাস্তায় রাস্তায় ভক্ত এবং বিশ্বাসী বলে প্রদর্শন করা হলো এবং সে প্রকাশ্যে নিজের পাপের কথা স্বীকার করল।]

কিন্তু এতেই শেষ হলো না। আমাকে ইনকুইজিশন বা ধর্মীয় বিচারে হাজির করা হলো। আমার ধর্মবিরোধিতার পাপের প্রায়শ্চিত্য করে রোমান ক্যাথলিক হতে হবে। তা না হলে আমার পাপমুক্তি ঘটবে না। চতুর্থ হেনরিকেও এমন দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু আমাকে যে ধর্মযাজকের সামনে হাজির করা হলো, তার আচরণে আমার নিজের মধ্যে সঞ্চিত আতঙ্ক দূর হলো না। আমাকে নানা প্রশ্ন করা হতে লাগল। আমি কিসে বিশ্বাস করি, আমার পারিবারিক অবস্থা কেমন। এত সবের পরে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল : তোমার মা তার মৃত্যুকালে কি বিশ্বাসী, না অবিশ্বাসী ছিল? এমন প্রশ্ন শুনে আমার মনের আতঙ্কে আমি আমার ক্রোধকে প্রকাশ করার সাহস যোগালাম না। আমি কেবল বলতে পারলাম, আমার মা কেন অবিশ্বাসী হবে। তিনি তো আজ মৃত। মনে হলো এতেও পাদ্রী সন্তুষ্ট নন। সে তার মুখের এমন ভঙ্গি করল যাতে এটা প্রকাশ পেল যে সে আমার কথা বিশ্বাস করে না। এসব যখন শেষ হলো এবং আমি যখন ভাবছি আমাকে এবার ছেড়ে দেয়া হবে, তখন আমার হাতে গোটা কুড়ি ফ্রাংক গুঁজে দিয়ে আমাকে দরজার বাইরে বার করে দেয়া হলো। আমাকে উপদেশ দিয়ে বলা হলো, একজন উত্তম খ্রিস্টানের জীবন তোমাকে যাপন করতে হবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক বলে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। এর পরে আর কখনও এদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

ফলে এখন আমার জন্য ফল কী দাঁড়াল? মুহূর্তের মধ্যে আমার মনের সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম একজন ক্যাথলিক হিসেবে আমি প্রাসাদে প্রবেশ করব। আমি সাদরে গৃহীত হব। এখন কি দাঁড়াল যে, রোমান ক্যাথলিকের বৃত্ত থেকে আমি বিতাড়িত এক কিশোর ও প্রতারিত এক রাস্তার ভিক্ষুক। হাতে আমার মাত্র বিশটা ফ্রাংক। এমন অবস্থায় হতাশাই আমার অনিবার্য ভাগ্য ছিল। কিন্তু আমি নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম : আমি দমিত নই। আমি হতাশ নই। যেন আমি একটা নতুন চেতনায় জাগ্রত হয়েছি। আমি মুক্তি লাভ করেছি। যদিও দু'মাস আমি এদের দুর্গে বন্দির জীবনযাপন করেছি। রুদ্ধদ্বার দুর্গে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদের হাতের পুতুল, এখন আমি মুক্ত। দাসত্ব থেকে মুক্ত একটা মানুষ যেন। কাজেই রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হয়ে এই মুক্তির বোধে আমি প্রাণিত হয়ে আমি মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গ হলাম। যে বিরাট শহরে আমি এসেছি, সে যেন আমার শহর। এ নগরীর রাস্তাঘাট, জীবন আমার রাস্তাঘাট, এই নগর আমার নগর, আমি নি:স্ব পথের ভিখারি হলেও আমি দাস নই। আমি একটা মুক্ত স্বাধীন মানুষ। এ তো আমার ভাগ্য যে এই বিরাট নগরে আমি পৌছতে পেরেছি। সে তো আমার নিজেরই সিদ্ধান্তের ফল। তাই নিজেকে এই মুহূর্তে নিজের কাছে শক্তির আধার এক পুরুষ বলে বোধ হলো। বিশ ফ্র্যাংকই আমার কাছে বিরাট রত্ন বলে বোধ হলো : এর প্রতিটি খণ্ডের আমি মালিক। আমার যেমন ইচ্ছা আমি খরচ করতে পারব। কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। রাস্তায় ঘুমাব তো স্বাধীনভাবে ঘুমাব। ওই লম্পটদের হাতের পুতুল আর আমি নই। সে মুহূর্তের শেকল মুক্তির মনের অবস্থা আমি এভাবেই মাত্র প্রকাশ করতে পারি।

হ্যাঁ, এই মুহূর্তের ভাগ্যের নিয়ন্তা আমি নিজে, অপর কেউ নয়।

[রুশো যথার্থই মুক্ত এবং স্বাধীনভাবে তার স্বপ্নের শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল, নিজের মনের আনন্দে। আতঙ্কহীন আনন্দে। কিন্তু বাস্তব জীবনকেও সে অস্বীকার করতে পারল না। তার হাতের ফ্রাংককটা নি:শেষ হতে অধিক সময় লাগল না!]

কিছু একটা ভাল হবে, এমন আশা করে আমি এ দোকান থেকে সে দোকানে গিয়ে বললাম : আমাকে একটু কাজ দেন, আমি মূর্তির গায়ে রঙ মাখিয়ে দেব। রৌপ্যদানকে রঙ করে দেব। আপনারা যা দিবেন, তাতেই হবে। কিন্তু দেখলাম ব্যাপারটি তত জমল না। এদের কাছ থেকে যে কাজ এবং ফ্রাংক পেলাম তাতে আমার দুই বেলা কিংবা তিনবেলার অধিক খাবার জোগাড় করতে পারলাম না। দু'একদিন পরের কথা। দোকানের পাশ দিয়ে একটা ফুটপাথ ধরে হাঁটছিলাম। একটি দোকানের জানালা দিয়ে আমি একটি সুন্দরী তরুণীকে দেখতে পেলাম। মেয়েটিকে আমার এত সুন্দরী আর আকর্ষণীয় বলে বোধ হলো যে মেয়েদের ব্যাপারে আমার স্বভাব সংকোচ সত্ত্বেও আমি দোকানে ঢুকে তার কাছে আমার দুরবস্থার কথা বললাম। তরুণীটি আমার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করল না। আমাকে সে সাহস দিল। বলল, একজন উত্তম খ্রিস্টানকে ঈশ্বর নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করবেন না। আমি তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসছি। মেয়েটি তাই করল। আমাকে তরুণীটি সামান্য কিছু কাজও দিল। আমার কাছে ব্যাপারটি খারাপ মনে হলো না। আমার কাজ দেখেও সে যেন খুশি হলো। আমি যখন একটু স্বাভাবিক হয়ে তাকে আমার অবস্থার কথা বলতে লাগলাম, তখন দেখলাম সে বেশ সহানুভূতির সঙ্গে আমার বলা কাহিনী শুনল। আমি তার সৌন্দর্যে যেমন মুগ্ধ হচ্ছিলাম তেমনি তার সহানুভূতিপূর্ণ আচরণে আমি নিজের সাহস এবং স্বাভাবিকতাও ফিরে পাচ্ছিলাম। মেয়েটি যেমন সুন্দর ছিল, তেমনি সে ছিল একজন ইটালীয়। তার আচরণে আমি গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সে প্রায় ভালবাসার মতো। কিন্তু বাস্তবে এর অধিক কিছু আমি করতে পারিনি। তবু আজো যখন আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করি তখন আমি রোমাঞ্চিত বোধ করি। আমার সেই বিরল ঘটনাটিতে আমি যেন উপলব্ধি করেছিলাম, ভালবাসা কাকে বলে।

এ আমার সেই কৈশোরের এক ভালবাসার কাহিনী। তারই রোমাঞ্চকর স্মৃতি।

এই তরুণী মাদাম বেসিলিকে আমার মনে হতো অসম্ভব সুন্দরী। তার দেহের রঙ যে শুভ্র ছিল, এমন নয়। হয়তো একটু শ্যামবর্ণের। তবু আমার জন্য তার আকর্ষণ ছিল দুরাবোধ্য। তার সুন্দর মুখমণ্ডলে আমার প্রতি তার সহানুভূতির প্রকাশ আমাকে বিমোহিত করে তুলত। তার একজন স্বামী ছিল। তার চাইতে বয়সে বড়। আমার প্রতি অবশ্যই তার একটু ঈর্ষা জন্মাচ্ছিল। আমরা দু'জনে কথা বলতে শুরু করলে সে মাদাম বেসিলিকে রেখে চলে যেত। লোকটা দেখতেও ভাল ছিল না। তবু তার একটা দেমাগ ছিল। আমার প্রতি তার বিতৃষ্ণা তার কণ্ঠের উচ্চারণেও লুকানো থাকত না। লোকটার অবশ্য একটা গুণ ছিল : সে মোটামুটি ভাল বাঁশী বাজাতে পারত। হয়তো এটার নাম ছিল এগিসথাস। আমাকে আসতে দেখলেই লোকটা কটমট করে আমার দিকে তাকাত। আমার প্রতি তার আচরণে ঘৃণার প্রকাশ থাকত স্পষ্ট। আবার মজা লাগত এই দেখে যে, লোকটা যত আমাকে ঘৃণা করত মাদাম বেসিলি তত তার সামনেই আমাকে ভালবাসার প্রকাশ দেখাত। আমার মনে হতো যেন মাদাম বেসিলি তার সামনে আমাকে ভালবাসার প্রকাশ দেখাত তাকে উত্তেজিত করে তোলারই জন্য। লোকটার প্রতি মাদামের এমন প্রতিহিংসায় আমি মজাই পেতাম। ব্যাপারটা চরম হয়ে উঠত যখন আমরা দু'জনে একটু আড়ালে বসে গল্প করতাম। কিন্তু মাদাম ব্যাপারটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করত না। ওর মধ্যে একটু সংযম ছিল। আমি জানি না তার এমন সংযমের মধ্যে এই ভাবটি ছিল কিনা যে, আমি তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলাম। এবং সে জানত না এমন অবস্থায় তার কী করা উচিত। তার এমন সংযমে আমি অস্থির হয়ে উঠতাম। আমার এমন অস্থিরতার কারণও আমি বুঝতাম না। অবশ্য এই মেয়েটির প্রতি আমার যে কোনও সমীহভাব ছিল, এমনও নয়। বরং মাদাম দা ওয়ারেন্স-এর প্রতি আমার যেমন সম্মান, তেমনি একটা সমীহবোধের সৃষ্টি হয়েছিল। তার ব্যাপারে আমি যেমন অধিকতর ভয়ার্তবোধ করতাম। তেমনি তিনি আমার কাছে অপরিচিত বোধ হতেন। তার দিকে আমি চোখ তুলে তাকাতে পারতাম না। তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়াও কষ্টকর হয়ে দাঁড়াত। তবু আমি তাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারতাম না। তা যেন আমার মৃত্যুতুল্য মনে হতো। আমার চোখ তাকে আপাদমস্তক দেখতে চাইত। তার কাঁধের এবং হাতের আচরণের মধ্য দিয়ে দৃষ্ট তার সৌন্দর্যের আকর্ষণ আমার জন্য দুরারোধ্য হতো। তার বক্ষের উত্থান-পতনকে যেন টের পেতাম। আমি পাছে ধরা পড়ি, সে ভয় আমার ছিল। তবু তার পোশাকে অঙ্কিত ফুলগুলো, তার পদযুগলের রাঙানো চিহ্ন কিছুই আমার নজর এড়াত না। তার যা কিছু দেখতাম তাই আমার কাছে অপর সব কিছুর চাইতে মনোহর বলে বোধ হতো। চোখে যা পড়ত তার চাইতে অধিক আমি কল্পনা করতাম। আর তাতে আমার দেহ আমার চোখ সব যেন একটা উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠত। আমার চোখে যেন জল জমত। আমার বুকের দম যেন বন্ধ হয়ে আসত। আমার নিঃশ্বাস নিশ্চল রুদ্ধ হয়ে উঠত। আমাদের এমন সাক্ষাৎ আমাকে ভয়ানক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিব্রত করে তুলত। আমরা দু'জনে যখন একান্ত হতাম তখন শব্দহীন নি:শ্বাস-প্রশ্বাসে আমি যেন ডুবে যেতাম। অবশ্য মাদাম বেসিলের কাজের অন্ত ছিল না। তাই আমার মনের অবস্থা দেখা বা বোঝার তার সময় হতো না। তথাপি আমার মনে হতো যেন আমার প্রতি তার সহানুভূতিতে তার বক্ষের উত্থান-পতন দ্রুততর হয়ে উঠছে। এ অবস্থা ছিল আমার জন্য বিপজ্জনক। এমন আবেগে যখন আমার চৈতন্য প্রায় হারাতে বসতাম, তখন সে হয়তো শান্তভাবে এমন কোনও শব্দ উচ্চারণ করত যাতে আমি আমার চেতনা আবার ফিরে পেতাম।

এভাবে কয়েকবারই আমি একান্তে তার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছি। অথচ এমন সাক্ষাতে আমি কোনওদিন একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারিনি। কোনওভাব প্রকাশ করতে পারিনি। একটু মুখ তুলে চাইতে পারিনি। এমন অবস্থা আমার জন্য যে কত যন্ত্রণাদায়ক ছিল তা আজও আমি প্রকাশ করে বলতে পারছিনে। তবু এটা আমার অন্তরে একটা ভীষণ আনন্দেরও সৃষ্টি করত। আমার সরল অন্তরে আমি কিছু বুঝতাম না, তবু যন্ত্রণাবিদ্ধ হতাম। অবশ্য এটা বুঝতাম আমাদের এমন সংগোপন মিলনটি মাদাম বেসিলির খারাপ লাগত না। কারণ এমন সুযোগটি যেন আমাদের ঘটে, তার ব্যবস্থাটি সেই-ই তৈরি করে দিত। এমন অনেকবারই ঘটেছে। তবু এ ছিল একেবারে নির্দোষ। বেসিলির নিজের দিক দিয়েও যেমন, আমার দিক থেকেও তেমনি : কারোরই কোনও প্রকাশ ছিল না।

একদিনের ঘটনা মনে পড়ে। দেখলাম পাদ্রির বকবকানি আর সইতে না পেরে বেসিলি তার উপরের ঘরে উঠে গেল। ঘরের পেছনে যা একটু কাজ ছিল আমার তলাটি তা ত্বরিত বেগে শেষ করে আমিও উপরের ঘরে উঠে গেলাম। আমি দেখলাম বেসিলির ঘরের দোর প্রায় অর্ধখোলা অবস্থায় রয়েছে। আমি তার ঘরে একেবারে নি:শব্দে ঢুকে পড়লাম। বেসিলি একেবারেই টের পেল না। সে তখন সেলাই-এর কাজে মগ্ন ছিল, কাছের জানালাটির পাশে উপবিষ্ট হয়ে তার পৃষ্ঠদেশটি ছিল দরজার দিকে। মুখটি ভেতরের দিকে। সে আমার ঢোকার কোনও শব্দ পায়নি। আমাকে সে দেখতেও পায়নি। বাইরের গাড়ি ঘোড়ার শব্দে আমার পায়ের শব্দও সে টের পায়নি। বেসিলির পরিধানের পোশাক সবসময়ই সুন্দর থাকত। আজও তেমনি ছিল। মুখের প্রসাধনে যেন একটু উগ্রতাও ছিল। তার ভাবটি ছিল মনোহর। হাতের কাছে মাথাটি ছিল একটু যেন অবনত। তাই পেছন থেকে আমি তার সুন্দর গ্রীবাটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তার মাথার চুল বেশ সুন্দর করে বাধা ছিল। সে চুলে যেন কয়েকটি ফুলও গুঞ্জিত ছিল। তার সমগ্র তনুতে একটি মনোহর ভাব ছিল। আমার চোখে আর অন্তরে এ সৌন্দর্যের প্রভাবের কোনও শেষ ছিল না। আমি যেন অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম। আমি নিজের অস্তিত্বেও যেন বিস্মৃত হয়ে গেলাম। আমি হাঁটু গেড়ে আমার দু'টি হাত বাড়িয়ে তার সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়লাম। আমি কোনও শব্দ উচ্চারণ করিনি। সে আমাকে দেখতে পেয়েছে এমনও আমি মনে করিনি। কিন্তু পাশের বড় ড্রেসিং আয়নাটিতে আমি ধরা পড়ে গেলাম। আমি জানি না আমার এই উন্মাদনা তাকে কীভাবে স্পর্শ করেছিল। তখনো সে না আমার দিকে তাকাল, না একটি শব্দ উচ্চারণ করল। একটু যেন মাথাটি নাড়ল এবং তার আঙুলের ইশারাতে তার সামনের মেঝেতে যেন বসার ইঙ্গিত দিল। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহ যেন কেঁপে উঠল। আমার কণ্ঠ দিয়ে হয়তো কোনও শব্দ বেরিয়েছিল। আমি নিমেষের মধ্যে নিজেকে মেঝেতে পতিত করলাম। এখনও অবিশ্বাস্য মনে হয়। তবু একথা ঠিক যে এমন অবস্থায় আমি কিছুই করলাম না। কিছুই করতে পারলাম না। একটা শব্দও আমি উচ্চারণ করতে সক্ষম হলাম না। আমি চোখ তুলে তার দিকে তাকাতে পারলাম না। তার পায়ে যে একটু হাত লাগাব। হাত দিয়ে তাকে একটু স্পর্শ করব। তাও আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। এ কথা ঠিক কোনও শব্দ করতে পারিনি, তাকে স্পর্শ করতে পারিনি। তবু আমার অদম্য অস্থিরতাকে তো আমি গোপনও করতে পারিনি। আমার সমগ্র অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটছিল। আবার আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার যেন শেষ ছিল না। আমার কামনারও যেমন না ছিল প্রকাশ, তেমনি না ছিল তার অন্ত। আমার এমন অস্থিরতার যে কোনও ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ছিল, তাও নয়। পাছে আমার কোনও আচরণে তার অসন্তুষ্টি ঘটে, সে ভয়ে আমি যেন পাথর হয়ে যাচ্ছিলাম। ফলে আমি যেন আমার আত্মার সকল স্বাভাবিকতাই হারিয়ে ফেলছিলাম।

তার অবস্থাও যে এরকম হয়ে পড়ছিল, তা আমি বুঝতে পারছিলাম। তারও যেন সঙ্কোচের সীমা ছিল না। তার দেহেও বিন্দুমাত্র আলোড়ন ছিল না। তার সামনে আমার এমন উপস্থিতি, তারই অঙ্গুলি নির্দেশে আমার মেঝেতে উপবেশন : এ সব কিছুতেই সে উদ্বেগে অস্থির হচ্ছিল। আচরণে না পারছিল আমাকে তাড়িয়ে দিতে, না পারছিল আমাকে আকর্ষণ করতে। বেসিলি তার হাতের কাজ বন্ধ করল না। তার আচরণ এমন ছিল যেন সে আমাকে আদৌ দেখেনি। যেন সে জানেই না যে আমি তার পা দু'খানির কাছে উপবিষ্ট হয়ে রয়েছি। আমি তো বোকার বোকা বনে গিয়েছিলাম। তবু আমি কি বুঝতে পারিনি, আমার মতো মাদাম বেসিলিও নিজের অন্তরে আলোড়িত হচ্ছিল। আমার কামনা তাকে স্পর্শ করছিল। আবার আমার যেমন সঙ্কোচ, তেমনি তারও সঙ্কোচ। আমি এটা বুঝলেও কোনও আচরণেই নিজেকে নিরস্ত করতে পারছিলাম না। আমার চেয়ে বেসিলির বয়স ছিল পাঁচ কি ৬ বছর বেশি। তাই তার তো সাহসের অভাব হবার কথা নয়। আমি আমার মনকে বললাম, ও যখন কিছু করছে না আমারও তখন কিছু করা উচিত নয়। এই মুহূর্তে সেদিনের স্মৃতিচারণ করে দেখছি, আমার সেই আচরণই ঠিক ছিল। আর বেসিলিও এমন বুদ্ধিমতী ছিল যে এটা তার না বুঝার কথা নয় যে আমার মতো অনভিজ্ঞ নিজে থেকে কিছু করতে পারবে না। সেজন্য আমাকেই তার শেখাতে হবে, কী আমাকে করতে হবে।

আমি এখনও বুঝতে পারছিনে এমন অদ্ভুত অনড় অবস্থাতে আমরা দু'জন কতক্ষণ থাকতে পারতাম যদি না এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটে যেত। আমি দেখলাম, যে দরজাটা এতক্ষণ বন্ধ ছিল, সে দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। এবার বেসিলি ভয়ার্ত হয়ে বলে উঠল : এই, তুই ওঠ, রোসিনা আসছে। আমি ত্বরিত বেগে তার বাড়িয়ে ধরা হাতখানি ধরে উঠে দাঁড়ালাম এবং আমার উত্তপ্ত ঠোঁট দু'টিকে দু'বার তার হাতের ওপর চুম্বনে চেপে ধরলাম। মনে হলো যে আমার দ্বিতীয় চুম্বনটিতে বেসিলি তার অমিয় সুন্দর হাত দিয়ে আমার ওষ্ঠাধরকে একটু যেন পিষ্ট করে দিল। আমার জীবনে আর কখনও এমন মধুর অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিনি। কিন্তু একথাও ঠিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সুযোগটুকু আমার ভাগ্যে সেদিন এসেছিল, তা আর আমি কখনও পাইনি। আমাদের সেই কৈশোর প্রেমের সমাধি সেদিন এমনি করেই ঘটেছিল।

আমার অন্তরে এই অনিন্দ্যসুন্দর তরুণীটির লাবণ্যচ্ছটা যে এমন অক্ষয়ভাবে আমার অন্তরে মুদ্রিত হয়ে রইল তার কারণও বোধহয় সেই মুহূর্তের আমার সেই অতৃপ্ত কামনা। আমি বলব এরপর আমি যত জগৎটাকে চিনতে পেরেছি, যত নানা প্রকার স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে আমি এসেছি, আমাদের কৈশোরের সেই ভালবাসার অনুভূতি আমি তত তীব্রভাবে বোধ করেছি। ওর নিজেরও যদি এমন ভালবাসার আর একটু অভিজ্ঞতা থাকত, তাহলে আমার বিশ্বাস মাদাম বেসিলিও আমার সঙ্গে একটু ভিন্নতর আচরণে লিপ্ত হতো। সে হয়তো তার আচরণ দিয়ে আমার মনে আর একটু সাহস যোগাত। তা সে পারেনি। সেও তখন অনভিজ্ঞ এবং দুর্বল ছিল। আর তাই আমি মনে করি বেসিলি যথার্থই নিজের অনুভূতিতে একান্তই সৎ ছিল। তার নিজের সেই নিষ্পাপ অনুভূতির কাছে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই আত্মসমর্পণ করেছিল। যদি অবিশ্বস্ততা বলি, এটিই বোধ হয় ছিল তার জীবনের প্রথম অবিশ্বস্ততা, ও যদি সাহসী হতো তাহলে আমার পক্ষে আমার সঙ্কোচকে অতিক্রম করা অধিকতর দু:সাধ্য হতো। আমি আমার কোনও আচরণ দিয়ে তার সঙ্কোচকে দূর করে দিতে পারতাম না। আমার পরম ভাগ্য যে সেদিন সেপথে আর আমি অগ্রসর হইনি। আর তাই ওর সামনে থাকার যে অমিয় মুহূর্তটি আমার ভাগ্যে ঘটেছিল, তেমন সুখের বোধও আমি আর কখনও পাইনি। জীবনে কম মেয়েকে আমি ভোগ করিনি। কিন্তু এ জীবনে সেদিন এ মেয়েটির পায়ের কাছে উপবিষ্ট হয়ে যে সুখ ও তৃপ্তি আমি লাভ করেছিলাম, সে অনুভূতির তুলনা আমি আর কোনও ঘটনাতে লাভ করিনি। সেদিন আমি মাদাম বেসিলির আচ্ছাদনের একটু অঙ্গও স্পর্শ করতে পারিনি। না। এই আমার বোধ যে, একটি নিষ্পাপ মেয়ে তার ভালবাসার পাত্রের মনে এমন নিষ্পাপ আচরণ দিয়ে যে সুখানুভূতির সৃষ্টি করতে পারে তার কোনও তুলনা হয় না। সেদিন মেয়েটি আমাকে নিয়ে যেমন তার ইচ্ছা তেমন সে করতে পারত। অথচ সেদিন তার একটু অঙ্গুলি হেলন, আমার ওষ্ঠের ওপর তার অঙ্গুলির একটু স্পর্শ : মাদাম বেসিলির কাছ থেকে এটুকুই মাত্র লাভ করেছিলাম। অথচ এর স্মৃতিই এখনও, আমার এই বয়সী জীবনে আমাকে রোমাঞ্চিত করে তোলে।

এরপরের দু'দিনও অবশ্য আমি চেষ্টা করলাম ওর এমন আর একটি একান্ত সঙ্গ লাভের। কিন্তু সে ভাগ্য আর আমার হলো না। বেসিলির আচরণেও এমন আগ্রহের কোনও প্রকাশ আমি দেখিনি। তার আচরণ আমার প্রতি যে উত্তাপহীন হয়ে উঠল, এমন নয়। তবুও ওর আচরণে একটা সতর্কতার যেন ভাব এল। এবং আমার মনে হলো সেও সতর্ক হলো যেন আমার প্রতি কোনও আচরণ যেন তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে না যায়। তার তত্ত্বাবধায়কটিও যেন অধিকতর সতর্ক হয়ে উঠল। সে লোকটা অবশ্য আমার ওপর অধিকতর হাসিঠাট্টার প্রয়োগ ঘটাতে লাগল। তার ভাব ছিল এরূপ যে মেয়েদের সঙ্গ পাওয়ায় তোমার আচরণে আরও সাহস থাকা আবশ্যক। আমি কি তাহলে বেসিলির সঙ্গে কোনও অন্যায় আচরণ করেছি? এমন চিন্তায় আমি ভীত হয়ে উঠলাম। আমি তখন থেকে মাদামের সঙ্গে আমার আচরণে অধিকতর সতর্ক হয়ে উঠলাম। আমার মনোভাবটি যেন বেসিলি উপলব্ধি করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছিল। আমার যে কোনও ইচ্ছাকে এখন থেকে আমি দমিত করে রাখার চেষ্টা করলাম। অথচ এই ঘটনার পূর্বে এমনটি আমাকে কখনও করতে হয়নি। আর তাই আর কোনও সুযোগকেই আমি ব্যবহার করতে চাইনি। আর এ সতর্কতা থেকে আর কোনও সুযোগেরও সৃষ্টি হয়নি।

আমার এই সব রোমান্টিক ঘটনার কথা স্মৃতিতে এলে মনে হয়, এর কোনওটাতেই আমার নিজের সঙ্কোচের কারণে আমার কোনও ইচ্ছাপূরণ করা সম্ভব হয়নি। তাই বলছি পাদ্রী আমার সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তার কোনওটা বাস্তবে ঘটেনি। আমি যখনি কাউকে ভালবেসেছি তখনি তাতে আমার এমন গভীর আন্তরিকতা ছিল, এত সম্পূর্ণতা ছিল যে আমার পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে সুখি হওয়া সম্ভব হয়নি। আমার কামনার কথা বলি কামনা, আমার আকর্ষণের কথা বলি আকর্ষণ— এর কিছুতেই আমি আমার সেই আন্তরিকতা আর ভালবাসা এবং মমতার চাইতে অধিকতর কিছুর কল্পনা করতে পারিনি। যে আমার ভালবাসার পাত্র বা পাত্রী হয়েছে তার জন্য আমি আমার সমস্ত জীবনকে ব্যয় করে দিতে পারতাম। তার সম্মানের হানিকর কোনও কিছুর কথা আমি কল্পনা করতে পারতাম না। আমার নিজের কোনও সুখানুভূতির জন্য আমার প্রেমাস্পদের বিন্দুমাত্র অসম্মান আমার কাছে অকল্পনীয় ছিল। আমার এই অনুভূতির কারণে এসব ঘটনায় আমি এত সতর্কতা অবলম্বন করতাম, এত গোপনীয়তা এবং এত উদ্বেগ যে, এর ফলে কোনও ঘটনাই আমার কামনা মতো বাস্তবায়িত হতে পারত না। মেয়েদের ব্যাপারে আমার এই যে অক্ষমতা বা বিফলতা তার আসল কারণ ছিল মেয়েদের জন্য আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গভীর মমতা আর সহানুভূতি।

[এই ঘটনার আনুপূর্বিক ব্যাপারটি ছিল এরূপ যে ভদ্রমহিলার স্বামীর আগমন ঘটেছিল এবং এক পাদ্রীর কাছ থেকে বৃত্তান্ত শুনে সে রুশোকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল। রুশো এরপরে মাদাম কাউন্টেস দা ভারসিলির ভৃত্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। বলা চলে তার সেক্রেটারি বা সচিব হয়ে দাঁড়ায়। তার তখন ক্যান্সার চলছিল। সে রুশোকে তার চিঠিপত্রের শ্রুতিলিপিকর হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে।]

আমার বিশ্বাস আমি তখন থেকেই কারোর গোপন আলাপ আলোচনা, ষড়যন্ত্র তৈরি করা ইত্যাদিতে বেশ আকৃষ্ট বোধ করতে শুরু করি এবং তাতে মজাও পেতে লাগলাম। আবার যার মধ্য দিয়ে এসব ঘটে তার প্রতি আমার একটা বিতৃষ্ণাও তৈরি হতে লাগল। এই মাদাম দা ভারসিলি ছিলেন নি:সন্তান। তার সম্পদের যে উত্তরাধিকারী হয়ে দাঁড়াল সে সম্পর্কে ছিল তার ভাগ্নে। সে ছিল কোঁতে দা লা রোক্। সে মাদামকে তখন থেকে দস্তুর মতো পুজো করতে শুরু করল। তাছাড়া মাদামের আর সব ভৃত্যদেরও ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে সংকট মুহূর্তটি আসন্ন প্রায়। তাই তাদের স্বার্থ গোছাতেও তারা তৎপর হয়ে উঠল। আর এদের দলে সংখ্যাও এত অধিক ছিল মাদামের পক্ষে আমার দিকে দৃষ্টি দেয়ার তার সময়ই ঘটছিল না। বাড়িঘরের কর্তার নাম ছিল মসিয়ে লরেনজী। লোকটি বেশ ভাল রকমেরই দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। আর তার স্ত্রী ছিল আরো এক কদম অধিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর। সে এমনভাবে চলত যেন সে যতো না আসল কর্ত্রীর দাসী তার অধিক সে তার প্রভু। এ মহিলা তারই ভাতিঝিকে কর্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনকারিণী হিসেবে নিযুক্ত করল। ফলে মাদাম দা ভারসিলির কাজকর্ম সবকিছুরই চক্ষুকর্ণ হস্তপদ হয়ে দাঁড়াল এই ভৃত্যকুল। আমার পক্ষে এই তিন 'ভৃত্য'কে সন্তুষ্ট রাখার আর উপায় রইল না। আমি এদের ভৃত্যতে পরিণত না হলেও, এদের অবাধ্য হওয়ারও আমার উপায় ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আসল গৃহকর্ত্রী মাদাম দা ভারসিলির দাসীদেরও দাস হিসেবে আমার কাজ করতে হবে। তাছাড়া আমার দিকে তাদের দৃষ্টিতে বোঝা যেত যে আমাকে নিয়েও তাদের তেমন স্বস্তি ছিল না। তারা দেখল, আমার যে অবস্থান হওয়া দরকার সে অবস্থানে আমি যেমন নিযুক্ত হইনি, তেমনি মাদাম ভারসিলিও সে ব্যাপারে যেমন সচেতন তেমনি আমাকে আবার উপযুক্ত অবস্থানে স্থাপন করতেও তিনি ছিলেন সচেষ্ট। ভৃত্যকুল বুঝল মাদাম যদি তার সেই চেষ্টায় সফল হন তাহলে তাদের নিজেদের ভাগ বাটোয়ারায় বেশ টান পড়ে যাবে। এই শ্রেণীর লোকরা এরূপই হয়। তারা মনে করে বাড়ির গিন্নীর সব কিছুতেই তাদের ন্যায্য অধিকার আছে। অপর আর কারোর কিছু থাকলেও তা তাদের ভাগ থেকেই নেয়া হয়েছে। ফলে ওরা চেষ্টা করতে লাগল আমি যেন বাড়ির গিন্নীর নজরে না আসতে পারি। গিন্নীর ঝোঁক ছিল বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চিঠি লেখার। আর সে কাজটি সে আমাকে দিয়েই করাত। এই চাকর-বাকররা এবার আমাকে এ দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে শুরু করল। তারা তার ডাক্তারকে বোঝালো এমন কাজ গিন্নীর পক্ষে করা উচিত নয়। এতে তার শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়বে। ওরা এমন ভাব দেখাল যেন আমি গিন্নীর সেবা ঠিক মতো করতে পারছিনে। সে জন্য কর্ত্রীর বহনের জন্য একটা হুইল চেয়ার এবং তার জন্য দু'জন দাসীরও ব্যবস্থা করল। এগুলো এত ধূর্ত ছিল যে মাদাম যখন তার উইল তৈরি করা শুরু করলেন তখন ওরা আট দিন ধরে তার কক্ষে আমাকে ঢুকতেই দিল না। কিন্তু আমিও সহজে ওদের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিলাম না। আমি যথারীতি গিন্নীর ঘরে যাতায়াত বজায় রাখলাম। অন্য কারোর চাইতে বেশি করে তার সেবায় আমার দক্ষতা আমি দেখাতে লাগলাম। আর যথার্থই এই ভদ্রমহিলা তার রোগে যেরূপ কষ্ট পাচ্ছিলেন, তা দেখে তার প্রতি আমার মমতা যথার্থই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমি তার কষ্টে তার এবং অপর সকলেরই দৃষ্টির আড়ালে আমি আন্তরিকভাবে কেঁদে ফেলতাম। এতে আমার কোনও কৃত্রিমতা ছিল না।

পরিণামে তাকে আমাদের হারাতে হলো। বাড়ির কর্ত্রী মারা গেলেন। আমার নিজের বেদনার্ত চোখেই আমি তাকে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করতে দেখলাম। আজ আমি একথা বুঝি যে এই ভদ্রমহিলা যথার্থ একজন বুদ্ধিমতী এবং সৎ মহিলা ছিলেন। বস্তুত তার মৃত্যু ছিল এই বছরের একজন যথার্থ দার্শনিকের মৃত্যু। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে তার কষ্টের মধ্যে আমি একজন যথার্থ রোমান ক্যাথলিককেই যেন দেখতে পেয়েছিলাম। রোমান ক্যাথলিক ধর্মের নির্দেশ এবং আচরণ পালনে তার স্বত:ইচ্ছা ব্যতীত কোনও কৃত্রিমতা বা অনিচ্ছা ছিল না। কাজেই তার মধ্যে আমি যেন একটি দায়িত্ব বোধসম্পন্ন চরিত্রেরই সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তার মধ্যে আমি যেন একটা আনন্দের শিখা জ্বলে উঠতে দেখলাম। এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা ছিল না। এ প্রায় তার এতদিনের বিষণ্ণতার স্থানে একটি আনন্দের রূপ ধারণ করেছিল। মনে হতো এর মধ্য দিয়ে তার বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশিত হয়। শেষ দু'দিন তার বাকস্ফূর্তি যেন বৃদ্ধি পেল। সে তার বিছানায় শায়িত অবস্থায় সকলের সঙ্গেই ধীরলয়ে বাক্যালাপ করলেন এবং শেষ মুহূর্তে তিনি তার নিদারুণ দৈহিক কষ্টের মধ্যেই যেন শব্দ করে উঠলেন : যে মানুষ মৃত্যুর মুহূর্তে কথা বলে সে কি মৃত হয়? তোমরা কী বল?

হ্যাঁ, মাদাম এই কথাটিই শেষ মুহূর্তে উচ্চারণ করেছিলেন।

আমাদের গৃহকর্ত্রী এই মাদাম তার উইলে সকল ভৃত্যের এক বছরের বেতনের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার ভাগ্যে কিছু জুটল না। কারণ আমাকে ওরা তার মৃত্যুর মুহূর্তে, উইল তৈরির সময়ে তার ঘরের মধ্যেই ঢুকতে দেয়নি। তাই ভৃত্যের নামের তালিকায় আমার নাম ছিল না। সে যাহোক কোঁতে দা রোক আমাকে ত্রিশ লিঙার দেয়ার একটা হুকুম দিলেন। তাছাড়া যে স্যুটটা আমার পরনে ছিল সেটা যখন মসিয়ে লরেঞ্জি নিতে যেতে চাইলেন মশিয়ে রোক নিতে দিলেন না। তিনি আমাকে বললেন আমি যেন তার সঙ্গে পরে দেখা করি। তিনি আমার একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবেন। আমি এর পরে তার কাছে দু'তিনবার যাওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার সঙ্গে কোনও কথা বলার সুযোগ পাইনি এবং আমার অবস্থার কথা আমি বলতে পারিনি। এভাবে ব্যর্থ হয়ে আমি আর যাইনি। অথচ আমার যাওয়া উচিত ছিল। আমি যদি মাদাম দ্য ভারসিলির গৃহে থাকার কথা বলতে পারতাম তাহলে তাতে আমার উপকারই হতো। তবে একথা বলা দরকার যে এই গৃহে একদিন যেভাবে আমি প্রবেশ করেছিলাম ঠিক সেভাবে ওই বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে আসিনি। নানা অপরাধের স্মৃতি নিয়েই আমি সে গৃহ পরিত্যাগ করেছিলাম। কেবল তাই নয়, আমার দুঃখ বোধও ছিল। সে দু:খের ভার আজ এই চল্লিশ বছর পরেও যেন আমার বুকে। আমার বিবেকে বোঝা হয়ে বাজে। এবং তার তিক্ততাও যেন আমার বয়স বৃদ্ধির সাথে দুর্বল হওয়ার বদলে যেন আরও ভারি হয়েই বাজছে। এমন কখনও আমি চিন্তা করতে পারিনি। কোন সেই ছেলেবেলার একটা অপরাধের যে এমন মারাত্মক ফল হতে পারে, তা আমি চিন্তা করতে পারিনি। কী হতে পারত, তার চাইতে যা হয়েছে তাই-ই এখনও আমার আত্মার জন্য দুর্বহ বোধ হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে আমি একটি ভদ্র, শান্ত, সৎ মেয়ের সর্বনাশের কারণ হয়েছি। অথচ আমার চাইতে ও অনেক বেশি সৎ ছিল। আমি যেন ওর অপার দুর্ভোগের কারণ বলে নিজেকে গণ্য করতে লাগলাম।

একথা ঠিক যে একটা পরিবারের শান্তির বিনষ্টি নানা দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে উঠতে পারে। নানা জিনিসই ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। অপহৃত বা বিনষ্ট হতে পারে। কিন্তু তেমন কিছু এই পরিবারে ঘটল না। লরেঞ্জিদের দৃষ্টি এত সতর্ক ছিল যে মালামালের তালিকা তৈরি করে দেখা গেল কোনও কিছুই খোয়া যায়নি। দেখা গেল কেবল মাত্র মাদামসেল পল্টাল একটি ফিতা খুঁজে পাচ্ছেন না। এর চাইতে অনেক বেশি মূল্যবান জিনিস আমার এক্তিয়ারে ছিল। তার মধ্যে কেন যে এই ফিতাটির প্রতি আমার চোখ পড়েছিল, তা আমি আজো বুঝতে পারছিনে। আমিই সেটি চুরি করেছিলাম। আর সেটি আমি লুকোবারও কোনও চেষ্টা করিনি। ফলে ফিতাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়াও গিয়েছিল। ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করল : তুই এটা পেলি কী করে? এর জবাবে আমি কী বলব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি আমতা আমতা করে কী যেন বললাম। আমার মুখে লজ্জার ভাব এল। শেষে বললাম : মারিয়ন ওটা আমাকে দিয়েছিল। এই মারিয়ন ছিল একটি অল্প বয়সের মেয়ে। ও এসেছিল মরিয়েন এলাকা থেকে। মাদাম দা ভারসিলি মেয়েটিকে তার রান্নার কাজে লাগিয়ে ছিলেন। মারিয়ন কেবল যে সুন্দর ছিল তাই নয়। ওর মুখে আমি যেন একটা রঙের আভাস পেয়েছিলাম। এমন রঙ কেবল পাহাড়ি মেয়েদের মধ্যেই পাওয়া যেত। তাছাড়া মেয়েটির মুখে আর আচরণে এমন একটা সারল্য আর লাবণ্য ছিল যে কারোর পক্ষেই ওকে ভাল না বাসা সম্ভব ছিল না। ওকে কোনও পাপ স্পর্শ করতে পারত না। ওর মতো সততাও আর কারোর ছিল না। তার ফলে আমি যখন ওর নাম উচ্চারণ করলাম, তখন সকলেই যেন বিস্মিত হলো। আবার আমাদের দু'জনেরই সৎ বলে সবার কাছে একটা পরিচয় ছিল। ফলে এখন সবারই গরজ দাঁড়াল আমাদের দু'জনের মধ্যে আসল অপরাধ কার। মেয়েটাকে ডেকে পাঠানো হলো। বাড়ির আর সবাইও হাজির হলো। যারা হাজির হলো তাদের মধ্যে কোঁতে দা রোকও ছিল। সে এলে ফিতাটা তাকে দেখানো হলো। আমি মেয়েটাকে জোরের সঙ্গে দায়ী করলাম। আমার এমন আচরণে মেয়েটা একেবারে স্তব্ধ এবং হতভম্ব হয়ে গেল। মেয়েটা একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না। কেবল আমার দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকল। তার সেই দৃষ্টিতে শয়তানেরও মন গলত। কিন্তু আমার মন গলল না। শেষে মেয়েটা জোরের সঙ্গেই বলল সে এ কাজ করেনি। তারপর মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে কোনও রাগ বাদেই বলল : তুই ভাল করে চিন্তা করে দেখ তুই কী বলছিস! তুই আমাকে কেন দোষ দিচ্ছিস? আমি তোর কী ক্ষতি করেছি?

কিন্তু আমি তখন বর্বরতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। আমি একটুও পিছু হটলাম না। আমি আবার জোরের সঙ্গে বললাম তুই আমাকে এই ফিতা দিয়েছিস। মেয়েটা তখন কাঁদতে শুরু করল আর আমার দিকে তাকিয়ে বলল : 'রুশো তুই এই কথা এখনো বলছিস! অথচ আমি তোকে ভাল মানুষ মনে করেছিলাম! তুই আমাকে এই দুঃখ দিলি! তবু আমি নিজেকে তোর জায়গায় দেখতে চাইনে।' এর বেশি ও আর কিছু বলল না। কেবল নিজে যে নির্দোষ সে কথাটাই বারংবার বলতে লাগল। ওর কথার মধ্যে একটা সরলতা আর দৃঢ়তা ছাড়া আমার প্রতি ওর রাগের কোনও প্রকাশ ছিল না। একদিকে আমার জবরদস্তি আর অপরদিকে ওর এমনি সরল ভাব ওর দুর্ভোগের কারণ হলো। হাজির যারা ছিল তারা আমার গলাকেই নির্দোষ ভাবল আর মেয়েটার সরলতাকেই দোষী সাব্যস্ত করল। ব্যাপারটা যে তখনই শেষ হলো তা নয়। তবু সকলে যেন আমার পক্ষে এবং মেয়েটার বিপক্ষে স্থান নিল। এমন একটা উত্তেজনার মধ্যে আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছিল তা কেউ অন্বেষণ করল না। আমাদের দু'জনকেই ঘর থেকে বার করে দিয়ে কোঁতে দা লা রোক কেবল বলল : যে দোষী তার যদি কোনও বিবেক থাকে তবে সে বিবেকই ওর শোধ নিবে! তার এমন কথার মধ্যে কোনও মিথ্যা ছিল না। বিবেক তার কাজ করে। এখনও নিত্যদিনই সে তাই করছে! আমি জানি না আমার মিথ্যা অপবাদের শিকার নিষ্পাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটার সেদিন কী হয়েছিল। তবে এটা ঠিক ওই বাড়িতে একটা ভাল কাজ যোগাড় করা ওর পক্ষে আর সহজ হয়নি। নিজের সততার ওপর আঘাতকে ওর বহন করে চলতে হয়েছে। চুরির ব্যাপারটা যে কিছু সাংঘাতিক ছিল, এমনও নয়। একটা সামান্য ফিতার ব্যাপার। তবু ব্যাপারটা তো চুরি বলেই সাব্যস্ত হলো। এবং তার চাইতেও বড় এই চুরির অপবাদ ওর চাইতে যাকে সেদিন বেশি আঘাত করেছিল, সে বর্বর হলেও তার নাম ছিল রুশো! শেষে শুধু এই বলা যায়, যে কিশোরপ্রায় লোকটার নাম ছিল রুশো সে তখন বিকারের তুঙ্গে পৌঁছে গিয়েছিল। ইতোমধ্যে অনেক বিকারেরই স্তূপ ঘটে গিয়েছিল আমার মধ্যে। মেয়েটার জীবনে কেবল যে আমি দুর্ভাগ্য এবং দারিদ্র্যের কারণ হলাম তাই নয়। কে জানে তার সেই বয়সে এমন আঘাতে কী পরিণতি তার ঘটেছিল! সেদিনের আমার সাফল্যে আজ যদি আমার কোনও বেদনা বোধের উদয় হয়ে থাকে তবে, সে দুঃখ যদি আজ আমার পক্ষে সহ্যের অতীত হয়ে থাকে, তবে তাতেও কেউ বুঝবে না যে, সেই হতভাগিনীকে আমার চাইতেও দু:খি করার জন্য আজ আমার নিজের অনুতাপ গভীর হয়ে দাঁড়িয়েছে!

আজকের আমার এমন নির্মম স্মৃতি মাঝে-মাঝে আমাকে এত বেদনার্ত এবং উত্তাল করে তোলে যে, আমার নির্ঘুম অসময়ে আমার মনে হয় যেন মেয়েটা আমার অপরাধের জন্য প্রতিশোধে এগিয়ে আসছে এবং যেন ঘটনাটা ঘটেছে সেকালে নয়, একালে এবং মাত্র গতকালই। তারপরে নিজের নিরাপদ জীবনে যদি ওকে বিস্মৃত হতে পেরেছি, কিন্তু আমার চরম দুর্ভোগের জীবনে ওকে আমি বিস্মৃত হতে পারিনি। আমার এই মনোভাবই হয়তো আমার কোনও বইতে প্রকাশও করেছি। বলেছি : 'মনের অনুভব যত সুখের সময়ে মূর্ত হয় না, যতোটা সে জেগে ওঠে দুর্ভাগ্যের মুহূর্তে'। আর একথাও ঠিক যে আমার আত্মার এই ক্রন্দনকে আমি আমার কোনও বন্ধুর কাছে কোনওদিনই প্রকাশ করে বলতে পারিনি। কারোর সঙ্গে কোনও অন্তরঙ্গতার মুহূর্তে আমার জীবনের সেই ঘটনাকে উন্মোচিত করতে পারিনি। মাদাম দা ওয়ারেন্স-এর কাছেও নয়। কাউকে বলতে গেলেও কেবল হয়তো বলেছি, আমি একটা অপরাধের অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি। কিন্তু তবু ঘটনাটার কথা বলতে পারিনি। আমার জীবনের এ একটা বোঝা। এখনও আমার বিবেকের ওপর একটা ভার হয়ে আছে। এ গুরুভারের কোনও লাঘব ঘটেনি। আমি শুধু আজ এই বলতে পারি যে, আজ যদি আমি এই আত্ম-উন্মোচনের কাজটি শুরু করে থাকি তবে সে আমার সেই অমোচনীয় অপরাধবোধের একটু লাঘবতা লাভের কামনাই তার কারণ।

আমার আজকের এই আচরণে কোনও কৃত্রিমতা নেই। আমার সেদিনের সেই ঘৃণ্য অপরাধের ওপর কোনও প্রলেপ লেপনের জন্য আমার আজকের এই আত্মস্বীকার নয়। ঘটনার সেদিন সেই মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে কোনও দুষ্ট বুদ্ধি আদৌ ছিল না। এ কথা আমি আজও জোরের সঙ্গেই বলব। সেই নির্মম সময়ে যখন আমি অসহায় মেয়েটাকে চুরির দায়ে দায়ী করছিলাম, তখনও সেই মুহূর্তে মেয়েটাকে আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসছিলাম। তাই স্মৃতি দিয়ে হলেও আমার সেদিনের সেই মুহূর্তের দিকে তাকিয়ে আমি যদি আজ আমার অন্তরের সত্যকে প্রকাশ না করি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে যার জন্য আজ আমি এই স্মৃতিচারণে রত হয়েছি, আমার সে উদ্দেশ্য মিথ্যা হয়ে যাবে। তাই আজো বলছি সেই হতভাগ্য মেয়েটাকে যখন আমি নির্মমভাবে আহত করছিলাম, তখনও ওর ওপর আমার এই নির্মম আঘাতের কারণও ছিল ওর প্রতি আমার ভালবাসা। কথাটা আজ অদ্ভুত মনে হতে পারে। তবু কথাটা সত্য। আমার চেতনার সর্বমুহূর্তে আমার হৃদয়ে ও বিরাজ করছিল। আর তাই সবাই যখন কেবল আমাকে প্রশ্ন করছিল, বল তুই, কে করেছে এ কাজ, তখন আমার মনের মধ্যে ও ছাড়া আর কেউ তো ছিল না। আর তাই ওর নামই সেদিন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল : ও করেছে। আমার মনের মধ্যে সেই মুহূর্তে যে ইচ্ছাটি বিরাজ করছিল, ও আমাকে ফিতাটা দিক, আমি সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করে বলেছিলাম : ও আমাকে ফিতাটা দিয়েছে! পরে যখন ওর হত দুর্দশা আমি দেখেছি তখন আমার হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে উঠছিল, তবু আর সব মানুষের উপস্থিতি আমার গ্লানিবোধের চাইতে অধিকতর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে মুহূর্তে আমি যে কোনও দণ্ডের জন্য ভীত হয়েছিলাম তা নয়। আমার অপমানিত হওয়ার বোধটাই সব অনুভূতিকে অতিক্রম করে প্রবল হয়ে উঠেছিল। আসল অপরাধের চাইতে অপমানিত হওয়ার বোধটাই যেন আমাকে পেয়ে বসেছিল। তাকেই যেন আমার মৃত্যুর বাড়া বলে বোধ হয়েছিল। যেন এর চাইতে বড় দুর্দৈব জগতে আর কিছু ছিল না। অথচ সেদিন যদি আমার পায়ের নীচে মাটিও ফাঁক হয়ে যেত, যদি আমার গলাটাকে কেউ টিপে ধরত, তাহলে আমি আমার অন্তরে আনন্দিত হতাম। একটা অজেয় লজ্জাবোধ আমাকে সেদিন গ্রাস করে একটা ঘৃণ্য প্রাণীতে পরিণত করেছিল। আমার মুখ না খোলার অপরাধ যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, মুখ খোলার ভয় যেন আমাকে তত বেশি ভয়ার্ত করে তুলছিল। সবাই আমাকে মিথ্যাবাদী বলে জানবে, আমাকে একটা চোর বলে চিহ্নিত করবে, আমার চোখের সামনে আমাকে ঘৃণ্য বলে চিহ্নিত করবে, এমন আমি চিন্তা করতে পারছিলাম না। একটা বিব্রতবোধের অনুভূতি ছাড়া আর সব অনুভূতিই যেন আমি সেই মুহূর্তে বিস্মৃত হয়েছিলাম। যদি একটু শান্ত হবার সময় পেতাম, আমি তাহলে সেদিন সবকিছুই স্বীকার করতাম। মসিয়ে দালা রোক যদি সেদিন আমাকে একটু আড়ালে ডেকে বলতেন : 'এই মেয়েটাকে তুই মারিস না। তুই যদি দোষী, তুই যদি কাজটা করে থাকিস, তুই আমার কাছে স্বীকার কর', তাহলে আমি তার পদপ্রান্তে নমিত হয়ে সব কিছু যে স্বীকার করতাম, সে বিষয়ে আজ আমি নি:সন্দেহ। কিন্তু হায় ভাগ্য! যখন আমি একটু সহানুভূতি আর সাহস চাচ্ছিলাম, তখন সকলে কেবল আমাকে ধমকাচ্ছিল। সেদিন আমার বয়সেরও একটা ব্যাপার ছিল। তখনও আমার তেমন বয়স হয়নি। তখন আমি একটা শিশু প্রায়; একটা কিশোর। আসলে একটা শিশুই ছিলাম আমি।

এটা ঠিক যে যেটা অপরাধ সেটা বয়স্কের চাইতে শিশুর ক্ষেত্রে কম অপরাধ নয়। কিন্তু যেটা একটা দুর্বলতা আর অক্ষমতার ব্যাপার। সেটাকে তখন অপরাধ বলা যায় না এবং আমার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেদিন, তাই ছিল। আর কিছু নয়। আর তাই তার স্মৃতি আজ আমাকে যত না অপরাধ বোধে পীড়িত করছে, তার চাইতে অধিক পীড়িত করছে ঘটনার ফলাফল আমার জীবনে যা ঘটেছিল তার ভয়ঙ্করতার বোধ। অপরাধের প্রতি যে আকর্ষণ সেদিন আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, আসল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাধ তার কাছে আদৌ কিছু নয়। আমার জীবনের ক্ষতি সেখানে। আমি তখন থেকে অপরাধের যে প্রবণতার মধ্যে নিপতিত হলাম, তার মূল কারণ সেই জীবনের শুরুতে আমার কৃত সেই অপরাধ; অপরাধকে স্বীকার করতে না পারার অপরাধ। এবং আমার বিশ্বাস মিথ্যার প্রতি জীবনব্যাপী আমার যদি কোনও ঘৃণার জন্ম ঘটে থাকে তবে তার মূল সেই একটি মিথ্যা যা আমার কিশোর জীবনে ঘটেছিল এবং যা একটি নিষ্পাপ কিশোরীর জীবনে করুণাহীন দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদি সেদিনের সেই পাপের কোনও প্রায়শ্চিত্তের কথা চিন্তা করা যায় তবে আমার জীবনভর অনুতাপের প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া অপর কোনও প্রায়শ্চিত্তের কথা আমি কল্পনা করতে পারিনে। আমার শেষ জীবনের যা কিছু দুঃখ তা সবই সেই আমার আদিকালের অপরাধের অনুতাপের প্রায়শ্চিত্ত বৈ আর কিছু নয়। আর আমি যদি আমার জীবনে বিবেকপূর্ণ কোনও কিছু সাধন করতে পেরে থাকি তবে তার মুখে সেই নিষ্পাপ কিশোরী মারিয়েনের বেদনা। ওর বিরুদ্ধে কৃত আমার সেদিনের অপরাধের ভার যত বড়ই হোক না কেন আমি যে তার প্রায়শ্চিত্ত বাদে মারা যাইনি তাই হবে আমার মৃত্যু মুহূর্তের সান্ত্বনা।

এ ব্যাপারে আমার জীবনের এই হোক শেষ কথা। আর কিছু নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পুস্তক

[১৭২৮-১৭৩১] রুশো ১৭২৮-১৭৩২ = ১৬ বছরের যুবক

মাদাম দ্য ভারসিলিস ভবনে একদিন যেভাবে এসেছিলাম তাকে সেভাবেই রেখে আমি আমার প্রাক্তন মনিবানীর কাছে ফিরে গিয়ে পাঁচ কিংবা ছয় সপ্তাহ ছিলাম। এই সময়টার কথা আমার এখনও তীব্রভাবে মনে পড়ে। আমার তেমন কোনও কাজ ছিল না। আমার স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল। হাসি খুশিতে ভরা ছিলাম আমি। আমার এই স্বাস্থ্য, যৌবন আর কর্মশূন্যতা আমার চরিত্রকে আবার অস্থির করে তুলল।

মন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কোনও দিকে আমার খেয়াল থাকত না। এক স্বপ্নাচ্ছন্নতা আমাকে পেয়ে বসল। কী একটা অজানা সুখের খোঁজে আমি অসহায় বোধ করতে লাগলাম। আমি কী চাই তা আমি জানতাম না। কান্নায় আমার মন ভরে উঠত। আমার মনের অবস্থা কাউকে খুলে বলা যায় না। আমি কী চাই, তা আমি জানতাম না তবু মনে হতো আমার চারপাশের সমবয়সীরা যেন আমার চাইতে পাকা ছিল। ওরা জানত ব্যাপারটা কী। মনে হতো ওরা যেন আমার না পাওয়া জিনিসের আনন্দ পুরো ভোঁতা করেছে। আমার মনের এমন অনুভূতিতে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তপ্ত হয়ে উঠত। আমার কামনার তীব্রতা বৃদ্ধি পেত। অথচ আমি বুঝতে পারতাম না, আমার এমন তপ্ত কামনা দিয়ে কী করব, এই কামনার তৃপ্তি আমার কেমন করে ঘটবে। কামনার কল্পনাতেই যেন আমি একটা তৃপ্তি বোধ করতাম। আমার তপ্ত দেহের কল্পনাতে আমার মনে কেবল মেয়েদের এবং যুবতীদের ছবি ভেসে উঠত। কিন্তু যৌন সম্পর্ক কাকে বলে তা তখনও আমার উপলব্ধিতে আসেনি। মেয়েদের নিয়ে কী করতে হয় তারও কোনও অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। একদিকে উদগ্র কামনা, অপরদিকে তার কোনও ব্যবহারের অজ্ঞতা আমার মনে একটা অদ্ভুত অবস্থা তৈরি করত। অথচ আমার দেহের মধ্যে একটা অসম্ভব অস্বস্তিকর ভাবের সৃষ্টি হতো। এর ভাল দিক একটা অবশ্য ছিল যে, আমার কামনার কোনও বাহ্যিক বা দৈহিক প্রকাশ তখনও ঘটেনি। আমার শরীর নিয়ে আমার যা কিছু কর্ম তা আমার কল্পনাতেই মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল। এমন মানসিক যাতনা থেকে আবার মুক্তির কোনও উপায় আমার জানা ছিল না। আমার কেবল ইচ্ছা হতো, কিছুটা সময় যদি আমি মাদামসেল গোটনের মতো একটি মহিলাকে নিজের কাছে একান্ত করে পেতে পারতাম! কিন্তু তখন আমার শৈশবের সেই সময়টা ছিল না যখন এমন কামনার একটা স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটে। একদিকে আমার মধ্যে একটা বিবেকের দংশন, অপরদিকে এমন চিন্তায় আমার নিজের মধ্যেই একটা লজ্জাবোধ আমার অবস্থাকে অসহনীয় করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলছিল। এর ফলে আমার স্বভাবসুলভ সঙ্কোচ এত বৃদ্ধি পেতে লাগল যে আমি যেন আর তাকে আমার শক্তির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে সক্ষম হচ্ছিলাম না। অথচ সেই সময়েও যেমন, তেমনি অপর সময়েও আমি কারোর নিকট কোনও কুপ্রস্তাব প্রকাশ করতে পারিনি। কেবল হয়তো এমন হয়েছে, কোনও একটি মেয়ের অদ্ভুত কোনও ভঙ্গি বা ব্যবহার আমাকেও কিছুটা উত্তেজিত করে তুলত। অবশ্য এও আমি বুঝতাম মেয়েটা ওর ভঙ্গি দিয়ে কী করতে চায়, তা মেয়েটাও জানত না। ফলে আমার প্রকাশের মধ্যেও মেয়েটা কোনও কিছুর আভাস পেত না। আমরা দু'জনেই একেবারে নিষ্কর্মই থাকতাম। অবশ্য আমি জানতাম, মেয়েটার যে সঙ্কোচবোধ ছিল তা নয়। আমি যা চাইতাম, ওর কাছ থেকে আমি তা পেতাম। কিন্তু আমি নির্দিষ্ট করে কিছুই চাইতে পারিনি।

অথচ আমার অস্থিরতা এমন নিদারুণ হয়ে উঠল যে আমার কামনার অতৃপ্তি আমাকে নানা প্রকার অস্বাভাবিক আচরণে অদম্য করে তুলল। আমি অস্থির হয়ে নানা অলিগলি দিয়ে ঘুরতে লাগলাম। এসব গলিতে কোনও মেয়েকে দেখলে এমন কিছু করতে ইচ্ছা হতো, যার বিনিময়ে মেয়েটাও হয়তো কিছু করত। অথচ ওরা আমার আচরণে কোনও অশ্লীলতার প্রকাশ দেখত না। আমি উত্তেজিত হলেও অশ্লীল আচরণের কথা আমি চিন্তা করতে পারতাম না। এমন অবস্থায় আমার আচরণের কথা বর্ণনার অতীত। এ কথা ঠিক, আর এক পা এগুলেই আমার ইপ্সিত কামনা আমি লাভ করতে পারতাম। আর এটাও নিশ্চিত, যে-মেয়েগুলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতো তারা আমার যে- কোনও আচরণকেই গ্রহণ করত। অথচ এ জন্য আমার যে সাহস প্রয়োজন ছিল, সে সাহস আমার ছিল না। আমার এই মূর্খতার পরিণামে এমন হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যা হাস্যকর হলেও তেমন অগ্রাহ্য ছিল না।

একদিন আমি একটা খালি উঠোনের পাশে একটা কূয়োর ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। এই ইদারাটা থেকে মেয়েগুলো জল তুলে নিত। এই জায়গাটির মুখে নিচে নামার কয়েকটা ধাপও ছিল। নামতে গিয়ে আমি বুঝতে চাইলাম নিচের এই ধাপ কোথায় নেমেছে। কিন্তু অন্ধকার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে আমি বুঝলাম, এ পথ দিয়ে বের হবার কোনও উপায় নেই। কেবল এটা বুঝলাম, এই গলিতে আমাকে কেউ যদি দেখে ফেলে তবে আমারও লুকিয়ে পড়তে কোনও অসুবিধা হবে না। এতে আমার যেন একটু সাহস বাড়ল। আর তখন যে মেয়েগুলো জলের জন্য আসছিল তাদের সামনে আমি এমন অঙ্গভঙ্গি করলাম যা ওই অবস্থায়ও আমার কাছে একেবারেই হাস্যকর বলে বোধ হচ্ছিল। আমার এমন আচরণে ওদের মধ্যে যারা একটু ভদ্র ছিল তারা আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল না। আর যারা একটু উদ্ধত ছিল তারা আমার আচরণে হেসেই আকুল হলো। কেউ কেউ আমার আচরণে অপমানিত বোধ করে চিৎকার করে উঠল। আমি ভয়ে পালাবার চেষ্টা করলাম। কেউ যেন আমার পেছনে আসতে লাগল। হঠাৎ একটা পুরুষের গলাও আমি শুনতে পেলাম। অথচ কোনও পুরুষকে তার আগে এই গলিতে দেখিনি। আমি তাই ভয় পেয়ে গেলাম। আমি অসহায় বোধ করে সেই অন্ধকারে যেন ঝাঁপ দিলাম। অন্ধকারটাকেই আমি সহায় মনে করছিলাম। কিন্তু তার মধ্যে একটা আলোর রেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে আমি দস্তুর মতো ভীত হয়ে উঠলাম। কিন্তু আর একটু এগুতে আমি একটা দেয়ালে ধাক্কা খেলাম। ফলে আমি আর এগুতে না পেরে আমার ভাগ্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমি দেখলাম একটা ইয়া মোছওয়ালা লোক আমাকে জাপটে ধরল। লোকটার মাথায় একটা হ্যাট ছিল। হাতে একটা তলোয়ারও ছিল। লোকটাকে চার-পাঁচটা বৃদ্ধ মেয়েলোক পথ দেখিয়ে নিচ্ছিল। এদের প্রত্যেকের হাতে হাতলওয়ালা একটা ঝাড়ু ছিল। এগুলোর মধ্যে আমি সেইটাকে দেখতে পেলাম যে আমাকে ধরে ফেলেছিল। এবার ও আমার মুখোমুখি দাঁড়াল।

যার হাতে একটা তলোয়ার ছিল সে এবার আমার হাতটাতে ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে উঠল : তুই এখানে কী করছিস? আমার কোনও জবাব ছিল না। আমি লোকটাকে কী বলব। তখন হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি এল, আমি একটা কাহিনী ফাঁদলাম। কাতরভাবে লোকটাকে বললাম, আমার বয়স কম, বাচ্চা মানুষ। আমাকে দয়া করুন। আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। আপনি আমাকে বাঁচান। বাড়িতে গেলে বাড়ির লোক আমাকে পাগল বলে বেঁধে রাখবে। কিন্তু আমি পাগল নই। আমি বুঝতে পারছিনে আমি কী করব। আপনি আমাকে একটু দয়া করুন। আমি আশা করিনি যে, লোকটা আমাকে দয়া করবে। তবু আমি দেখলাম, লোকটা একটু নরম হলো। বললাম, আমি ভাল ঘরের ছেলে। আমি বললাম আমাকে তাড়িয়ে দিবেন না। আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমি আপনার দয়ার কথা জীবনে ভুলবো না। আমার কাছে যথার্থই অপ্রত্যাশিত ছিল। এবং আমাকে একটা বকুনি দিয়ে লোকটা আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে ছেড়ে দিল। যে মেয়েটা আমাকে প্রথম দেখেছিল, আর যে বুড়ো মেয়েলোকগুলো এই লোকটাকে পথ দেখিয়ে এগুচ্ছিল ওরা এমনভাবে মুক্তি পাওয়াতে বিস্মিত হয়ে গেল। ওরা ভাবেনি আমি এত সহজে ছাড়া পাব। আর তখন আমি বুঝলাম এই বিরাট বপুর লোকটি সেদিন আমার কী উপকারটাই না করেছিল। মেয়েগুলি আমার বিরুদ্ধে নানা কথা বলতে লাগল। কিন্তু লোকটি তার হাত বা হাতের তলোয়ার দিয়ে কোনও বাধা দিল না। ফলে আমার সাহস বৃদ্ধি পেল, আমি এই দঙ্গলের হাত থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হলাম।

এর কয়েকদিন পরের কথা বলছি। আমি একটা রাস্তায় একজন যুবক পাদ্রীর সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ সেই মোছওয়ালা লোকটারও দেখা পেলাম। লোকটা আমাকে চিনল। কিন্তু সে কেবল ঠাট্টার সুরে বলল : কী বাহাদুর! হ্যাঁ, বাহাদুর বটে, আর তুই ঘেটা ভীতুও বটে। তবে এমন বাহাদুরি করতে এমন জায়গাতে তুই আর আসিসনে। সেদিন বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছিস। সে আর কিছু বলল না। আমি আর মুখ তুলে তার দিকে তাকালাম না। আমি নিজের মনে তাকে তার দয়ার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে সটকে পড়লাম। আমি বুঝলাম সেদিনকার মেয়েগুলো আমাকে অত সহজেই ছেড়ে দেয়ার জন্য এই লোকটিকে বোকা ছাড়া আর কিছু ভাবেনি। যাই হোক, এই লোকটি দেখতে যতই খারাপ হোক, লোকটি আমার জন্য সেদিন যথার্থই ভাল ছিল। আর তাই জীবনে যতবার লোকটির কথা আমার মনে হয়েছে ততবারই আমি তার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা বোধ করেছি। কারণ সেদিনের সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনাটা এত হাস্যকর ছিল আর যে কেউ হলে সে হাসিঠাট্টা মশকরা করে আমাকে হেনস্তার একশেষ করে ছাড়ত। তবে আমার সেদিনকার কাণ্ড থেকে আমার একটা বড় শিক্ষা হয়েছিল। যে ভয়ানক বিপদে আমি পড়েছিলাম, তা থেকে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। তাই পরে বহুদিন যাবৎ অমন মূর্খামি আর আমি করিনি। মাদাম দ্যা ভারসেলিস-এর সঙ্গে পরিচয় এবং তার আশ্রয়ে থাকার ভাগ্যে আমি ওই স্থানের আরও কিছু লোকের পরিচয় লাভ করেছিলাম। তাদের সেই পরিচয় দিয়ে আমি এই সময়ে জীবনে একটু স্থিতি লাভের চেষ্টা করেছি। তারা আমার সাহায্যে আসতে পারে, এমন কথা আমি ভেবেছি। এই সময়ে আমি মাভোর্দে মশিয়ে গেইম নামের এক শিক্ষকের পরিচয় লাভ করেছিলাম। ইনি কোঁতে দ্যাঁ ম্যালারিদের শিশুদের শিক্ষা দানে নিযুক্ত ছিলেন। এই লোকটির বয়স ছিল তখন বেশ কম। যুবকের মতো। তার চরিত্রে একটা বুদ্ধিমত্তা, সম্মানবোধ এবং সততার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। আমার তখন যে সাহায্যের প্রয়োজন ছিল এবং যে চিন্তা থেকে আমি তার কাছে গিয়েছিলাম, সে ব্যাপারে সে যে আমাকে সাহায্য করতে পেরেছিল, তা নয়। কিন্তু আমি তার কাছে সেদিন যা লাভ করেছিলাম, তার মূল্য ছিল অনেক বেশি। আর সেই সাহায্যের কথা আমি আমার জীবনে বিস্মৃত হতে পারিনি। জীবনে নৈতিকতাবোধ কাকে বলে তার একটা শিক্ষা পেয়েছিলাম তার কাছ থেকে। জীবনে যুক্তি কাকে বলব, যথার্থ যুক্তি বোধ কী তার শিক্ষাও আমি লাভ করেছিলাম। আমি ছিলাম জীবনবোধের ক্ষেত্রে একটা পেণ্ডুলামের মতো : এই উঁচু তো এই নিচু : এই বীরপুরুষ, তো তারপরেই কাপুরুষের অধম। মশিয়ে গেইম যেন আমাকে আমার সঠিক জায়গাটিতে বসিয়ে দিলেন। আমার আসল চরিত্রটিকে তিনি ধরিয়ে দিলেন। না আমাকে হতাশায় যেমন ডুবিয়ে দিলেন না, তেমনি বিরাট করেও তুললেন না। আমার চরিত্রে উত্তম যা কিছু ছিল তিনি তাকে স্বীকার করেন। আমার চোখে তা ধরিয়ে দিলেন। কিন্তু এও বললেন : তোমার এ গুণ তোমার সামনে বাধা হয়ে দেখা দিতে পারে। তিনি বললেন : তোমার যা আছে তাই দিয়েই যে তুমি জীবনে বড় হবে এমন নও। একে বাদ দিয়েও তুমি বড় হতে পারবে। তিনি মানুষের জীবনের একটা সত্যিকার চিত্র যেন আমার সামনে তুলে ধরলেন। এভাবে আমার জীবনকে আর কখনও আমি দেখিনি। তিনি বললেন, একটা প্রতিকূল অবস্থায়ও তুমি সুখ লাভ করতে পার, কিন্তু তার জন্য তোমার প্রয়োজন হচ্ছে দূরদৃষ্টির : তুমি কী যথার্থভাবে চাও তা তোমাকে উপলব্ধি করতে হবে। বাইরের আড়ম্বরের প্রতি আমার যে মোহ ছিল, কোঁতে দ্যা মেলারদি আমার সেই মোহের ওপর যথার্থই আঘাত হানলেন। তিনি বললেন : যারা অপরকে শাসন করে সুখ লাভ করার কথা ভাবে, তারা নিজেরাও অপরের দ্বারা কম শাসিত নয়। শাসক শাসিতের চাইতে আদৌ সুখী নয়। তারা নিজেকে জ্ঞানী ভাবলেও শাসিতের চাইতে জ্ঞানী নয়। তার একটা কথা আমি জীবনে ভুলিনি : এক মানুষ যদি অপর মানুষের মনকে দেখতে পারত তাহলে তার আকাশচুম্বী আশঙ্কারও শেষ হতো। এই অনুভূতি আমার জীবনকে এক অমোঘ সত্য দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এই বোধ আমার মনে যে কোনও প্রতিকূল অবস্থায় অতৃপ্তি আর অস্থিরতার বদলে আমার মনে যথার্থ তৃপ্তির সৃষ্টি করেছে। ইনিই আমাকে জীবনে সম্মান আর মর্যাদাবোধ বলতে কী বুঝায় তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝিয়েছেন। আমি যেখানে পূর্বে যে কোনও আড়ম্বরের কামনায় স্ফীত হয়ে উঠতাম সেখানে এখন আমি যেকোনও অবস্থায় আত্মতৃপ্তির বোধে যেন সম্বুদ্ধ হয়ে উঠতে সক্ষম হলাম। মশিয়ে গেইম আমাকে এই অনুধাবনে উপকৃত করলেন যে সমাজে তুমি যথার্থ সততার সাহস খুব কমই পাবে। তুমি যত উঁচুতে উঠতে চাইবে, তোমার তত নিচে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হবে। তিনি বলতেন কোনও কাজই ছোট নয়। যাকে তুমি ছোট মনে করছ, তাকে সুসম্পন্ন করতে তোমাকে তোমার বড় কাজের চাইতে কম পরিশ্রম করতে হবে না। তিনি বলতেন, অপরের অন্ত:সারশূন্য প্রশংসা বা স্তুতির চাইতে তোমার সঙ্গী আর সাথীদের কাছ থেকে তুমি যে সহানুভূতি লাভ করবে তার মূল্য অনেক বেশি।

মানুষের কর্তব্যকে যদি তুমি বুঝতে চাও তবে তোমাকে তার নীতিবোধের শেকড়ে যেতে হবে। তাছাড়া তখন আমার যে অবস্থা হয়েছিল, যে চিন্তার ফলেই তখনকার সংকটে আমার পতন ঘটেছিল তার বিশ্লেষণে আমাদের উভয়কে ধর্মের আলোচনায় না গিয়ে উপায় রইল না। আমি এখন বুঝতে পারছি, সেদিনকার 'স্যাভোয়ের ধর্মযাজকের বোধের' মূল ছিল এই মশিয়ে গেইম। তিনি যে সবকথাই খুলে বলতেন, তা নয়। তার প্রজ্ঞাই তাকে বুঝিয়ে দিত আমার মতো বালকের কাছে তার কী বলা উচিত এবং কী বলা উচিত নয়। আমার বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গেও যেমন, তেমনি অপর সব প্রসঙ্গেই তিনি তার প্রজ্ঞা এবং পরিমিতি বোধকেই প্রকাশ করতেন। বিষয়টার বিশারদের মধ্যে আর না গিয়ে আমি বরং আজ এই বলব যে, তার প্রজ্ঞাকে আমি প্রথমে অনুধাবন করতে না পারলেও তার জ্ঞান ক্রমান্বয়ে আমাকে এমন আলোকিত করে তুলছিল যে, ন্যায় বলি কিংবা ধর্ম : তার শিক্ষাদাতার মধ্যে যদি যথার্থ সততা এবং সহানুভূতির অভাব থাকে তবে তার দ্বারা তুমি কখন অনুপ্রাণিত বোধ করতে পারবে না।

[এখানে জীবিকাহীন রুশোর জীবনের একটা ঘটনার কথা বলা আবশ্যক। কোঁতে দ্যা রোকো নামের এক ভদ্রলোক কোঁতে দ্য কুভনের বাড়িতে রুশোর জীবিকার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এই গৃহেই কাউন্টের একটি পৌত্রী : মাদামসেল দ্য ব্রিলের সুনজরে পড়েছিল রুশো।]

যুবতী মাদাম সেল দ্য ব্রিল প্রায় আমার বয়সেরই ছিল। সুগঠিত ছিল তার দেহ। দেখতে ভারী সুন্দর ছিল। সতেজ রঙের এক যুবতী। তাকে বলা যায়, দীর্ঘকেশের একটি শ্যামাঙ্গী যুবতী। তার চরিত্রে একটি ভদ্রতার প্রকাশ ছিল। এমন প্রকাশ নিজেদের সৌন্দর্য সচেতন নারীর মধ্যে খুব কমই থাকে। তার এই আকর্ষণকে আমি কখনও রোধ করতে পারিনি। তার বয়োসোচিত পরিধানের বস্ত্র যেন তার সৌন্দর্যকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলত। সে বস্ত্রের স্বল্পতা তার বক্ষদেশ বা স্কন্ধকে তেমন আবৃত করে রাখতে পারত না। অবশ্য এ কথা সত্য যে আমার মতো একটা গৃহ-ভৃত্যের এসব দিকে দৃষ্টি দেয়ার কোনও অধিকার ছিল না। হ্যাঁ, আমার উচিত ছিল না। কিন্তু আমি নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারিনি। কিন্তু কেবল আমি নই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর দিকে আরও অনেকেই তো এমনভাবে তাকাত। এই গৃহের অন্য কর্মচারীরা ওর সম্পর্কে এমন সব স্থূল মন্তব্য করত, যা শুনে আমি ব্যথিত বোধ করতাম। তাই বলে আমি এত অভিভূত হয়ে পড়িনি যে আমি ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আমার অবস্থানকে আমি ভুলে যাইনি। তাই আমি নিজের অবস্থাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করিনি। এবং আমার কামনাকে যদৃচ্ছা অবারিতও করিনি। হ্যাঁ, মাদামসেল দ্য ব্রিলকে আমার দেখতে ইচ্ছা হতো। ওর কথার মধ্যে বুদ্ধির প্রকাশ থাকত। আর ওর এমন কথা আমার শুনতে ভাল লাগত। ওর কথার মধ্যে একটা বিনম্র সংকোচ ছিল। আমার কামনা ছিল, আমি যেন ওর একটু সেবা করতে পারি। কিন্তু আমি সতর্ক ছিলাম, আমি যেন আমার অধিকারকে অতিক্রম না করি। খাওয়ার টেবিলে মেয়েটির যে কোনও অসুবিধার দিকে আমি দৃষ্টি রাখতাম। ওর বসার চেয়ারটা কেউ সরিয়ে দিলে আমি আগ্রহের সঙ্গে সেটি আবার ঠিক করে দিতাম। আমি ওর চোখের দিকে তাকাতাম যেন ও কী চাইতে পারে, তা আমি বুঝতে পারি। আমি নজর রাখতাম ওর খাবার প্লেটটি কখন সরিয়ে দিতে হবে। ও যদি কেবলমাত্র একটু ইঙ্গিত দিত তাহলে ওর জন্য করার অসাধ্য আমার কিছুই থাকত না। আমার মন চাইত, ও আমার দিকে একটু চোখ তুলে তাকাক, একটা কোনও কথা বলুক, আমাকে একটা কিছু করতে বলুক। কিন্তু না, তেমন কোনও ভাগ্য আমার হয়নি। ওর কাছে আমি যেন অস্তিত্বহীন একটা পদার্থ মাত্র ছিলাম। তবে একটা দিনের কথা আমার মনে পড়ছে। ওর একটি ভাই ছিল। ও ভাই আমার সঙ্গে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কথা বলত। ওরই এই ভাইটা একদিন আমাকে আক্রমণ করে একটা কথা বলল, আমি ওর কথার জবাব দিলাম। এবং সে জবাবের মধ্যে যেমন একটা ভদ্রতা, তেমনি একটা বুদ্ধির প্রকাশ ছিল। দেখলাম মেয়েটির চোখেও তা ধরা পড়েছে। আর মেয়েটি তখন চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। অবশ্য মেয়েটির দৃষ্টি মুহূর্তের দৃষ্টি। তবু মেয়েটির দৃষ্টি, মুহূর্তের দৃষ্টি আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছিল। পরের দিনও ওর একটু চকিত দৃষ্টি লাভ আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। এদিন এই ভাগ্যকে ব্যবহারে আমি ব্যর্থ হইনি। এদিনই খাওয়ার ঘরে একটা বড় ভোজের আয়োজন ছিল। আর এদিনই আমি দেখলাম বাবুর্চিদের একজন তার চাপরাস ঝুলিয়ে মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়াল। আলাপ আলোচনায় কী একটা ফরাসি বাক্যের উচ্চারণ ঘটেছিল। কিন্তু তার উচ্চারণটা ঠিক হয়নি। এই সময়ে একজন পুরাতন ভৃত্য উচ্চারণটা সংশোধন করতে এগুল। এই সময়ে আমার দিকে তাকিয়ে সে একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। আমার দিকে তার চোখ পড়তে দেখল যে আমার ঠোঁটে যেন একটু হাসি ফুটে উঠেছে। তাতে সে যেন একটু রাগত হল। বলল : তবে তুই বল। আমি বললাম, যে অক্ষরটির উচ্চারণ নিয়ে কথা হচ্ছে, সে উচ্চারণটি ভুল নয়। অবশ্য শব্দটা একটি পুরনো শব্দ। সে দিক থেকে শব্দটি তেমন ভুল নয়। বুৎপত্তিগতভাবে বলা যায় : মেরে ফেলার ভয় দেখানো আর মেরে ফেলা এক নয়। অনেকেই হয়তো ভয় দেখায়। আবার হয়তো কেউ আঘাতও করে তবু যাকে সে আঘাত করেছে, তাকে সে মেরে ফেলেছে এমন বোঝাবে না। আমার এমন কথায় উপস্থিত সকলে আমার দিকে ফিরে তাকাল। তারপরে যেন নিজেদেরকে দেখল। কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। আমার জীবনে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি এমন বিস্মিত দৃষ্টির সাক্ষাৎ যথার্থই আমি আগে কোনওদিন পাইনি। কিন্তু আমাকে যা সেই মুহূর্তে আনন্দিত করেছিল সে মাদামসেল দ্য বেইল-এর মুখের প্রসন্ন সেই প্রকাশটি যাতে আমার মনে হয়েছিল, মাদামসেল আমার জবাবটিতে খুশি হয়েছিলেন। অবজ্ঞার ভঙ্গি নিয়ে যে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, সে এবার আমার দিকে আবার ফিরে তাকাল। এ প্রায় তার প্রথম দৃষ্টির মতোই ছিল। তারপর সে তার দাদুর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সে বলছে, এবার জবাব দাও। ওর যা প্রাপ্য তাই ওকে দাও। এখন কেন এত সঙ্কোচ। মেয়েটির এমন ভঙ্গিতে তার দাদু এবার হাসিমুখে আমার প্রতি যথার্থই স্নেহময় হয়ে উঠলেন। তিনি এত উদারভাবে, প্রাণভরে আমাকে প্রশংসা করলেন যে উপস্থিত সকলে এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এই ঘটনাটির আয়ু যে খুব বেশি ছিল, এমন নয়। তবু মুহূর্তটি আমার জন্য অতুলনীয়ভাবে আনন্দময় হয়ে উঠল। এমন মুহূর্ত খুব কম আসে। মুহূর্তটি যেমন স্বাভাবিক ছিল তেমনি সে যেন আমার ওপর ভাগ্যের বর্ষিত সকল যন্ত্রণার একটা উপশম ঘটিয়ে দিল। এর কয়েক মিনিট পরে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে যেন বলল : দে, আমাকে কিছু খেতে দে। পান করার একটু জল দে। একথা তো আমার বলার অপেক্ষা রাখে না যে মাদামসেলের হুকুমটি পালন করতে আমি বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিনি। কিন্তু মাদামসেলের এমন বদান্যতায় আমি এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম এবং তার গ্লাসটিতে আমি এতখানি জল ঢেলে দিয়েছিলাম যে সে জল গ্লাস উপচে যেমন তার প্লেটে পড়েছিল, তেমনি তার পা দু'খানিতেও পড়েছিল। ওর ভাই কাছেই ছিল। সে আমাকে বলল, তুই এত কাঁপছিস কেন? ওর ভাইয়ের এমন প্রশ্ন যে আমাকে তেমন আশ্বস্ত করতে পেরেছিল, তা নয়। কিন্তু দেখলাম, মাদামসেল দ্য ব্রিল নিজেও যেন লজ্জায় একটু রক্তিম হলো। তার চোখের তারায় তার যেন আভা প্রকাশ পেল।

আমার এ রোমান্সেরও এখানে শেষ। এ থেকে বোঝা যাবে মাদাম বাসিলের বেলায়ও যেমন, এখানেও আমার রোমান্সের কোনও ফলদায়ক পরিণাম ঘটেনি। মাদাম দ্য ব্রিলের ঘরের দিকে এরপর বৃথাই আমি উঁকি দিয়েছি। তার ঘরের মেয়ের কাছ থেকেও আমি কোনও প্রশংসার ইঙ্গিত পাইনি। সে ঘরের মধ্যে যাতায়াত করত। কিন্তু আমি তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পেতাম না। আমার বোকামির শেষ ছিল না। একদিন একটা ঘটনা ঘটল। মাদাম ব্রিলের হাত থেকে তার দস্তানাটা পড়ে গিয়েছিল। আমি এমন বোকা আর ভীতু ছিলাম যে, আমার যেখানে উচিত ছিল মাদামের দস্তানাটি তুলে চুম্বন করা, সেখানে আমি কিছুই করতে পারলাম না। আমি ঠায়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। দস্তানাটি পরে একটা চাকরানি তুলে দিয়েছিল। আমার তখন এই বাঁদিটারই গলা টিপে ধরতে ইচ্ছা করছিল। আমার ভয়ার্ত ভারে আর শেষ রইল না। আমি দেখলাম আমি যেন বুঝতেই পারছিলাম না, আমি কী করলে মাদাম ব্রিল আমার ওপর একটু খুশি হবেন। মাদাম এখন আর আমাকে কোনও কাজের হুকুমও দিলেন না। তাছাড়া আমি কিছু করতে চাইলেও তিনি খুশি হন না। দু'বার এমন হল যে আমাকে তার পাশের ঘরে দেখতে পেয়ে তিনি বেশ একটু ঠাণ্ডা গলায় বললেন : কিরে তোর কোনও কাজ নেই? ফলে আমি তার পাশের ঘরে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। এতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার প্রথমে একটু দুঃখ হলো। কিন্তু ঘরের অন্যান্য কাজে এই ঘটনার কথা আমি ভুলে গেলাম।

মেয়েটির সৎ পিতা সেখানে ছিলেন। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে আমার প্রতি মাদাম ব্রিলের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। যে ভোজপর্বের কথা আমি বলেছি তারপরের দিন ইনি আমার সঙ্গে প্রায় আধ ঘণ্টা সুন্দরভাবে আলাপ করলেন। তিনি অবশ্য বয়স্ক এবং প্রায় বৃদ্ধ ছিলেন এবং মাদাম দ্য ভারসেলিসের মতো তেমন বিশেষ কোনও গুণ ছিল না, তবু তার মনটা বেশ ভাল ছিল। ফলে তার সঙ্গে আমার কথা বলতে বা তার কাছে থাকতে আমার কোনও কষ্টবোধ হয়নি। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটি বেশ ভাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, তুই বয়স্ক আমার ছেলেটাকে দেখাশুনা কর। তার ছেলে ছিল আবে দা গুভন। আমার প্রতি তার একটু সহানুভূতিও ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছিল। আমি ভাবলাম তার ছেলেটির একটু সেবা যত্ন করলে আমার উপকারই হবে এবং আমার চরিত্রে যা নাই, একটু স্বাভাবিক হওয়ার ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে আমি তা লাভ করতে পারব। পরের দিন সকালেই আমি সেই আবের কাছে গেলাম। দেখলাম সে আমাকে ভৃত্যের মতো ভাবল না। সে আমাকে ধরে তার পাশে আগুনের চুলার কাছে বসাল। সে আমাকে নানা ব্যাপারে প্রশ্ন করল এবং দেখল যে, আমি নানা বিষয়ে জানার ভাব করলেও কোনও বিষয়েই আমার জ্ঞান গভীর নয়। সে যখন দেখল যে আমি ল্যাটিন তেমন জানিইনে, তখন সে আমাকে ল্যাটিন শেখাতে শুরু করল। সে বলল, আমি যেন রোজ সকালে তার কাছে যাই। আমি তাই শুরু করলাম। আমি তারপর দিন থেকেই তার কাছে যেতে লাগলাম। এই ভাবে সেদিনের কথা স্মরণ করে আমি বলতে পারি যে ঘটনাক্রমে আমি যেমন আমার অবস্থানের নিচে ছিলাম, তেমনি তার উপরেও উঠে গেলাম। এই গৃহে এবার আমি কেবল ভৃত্য নয়, আমি দস্তুর মতো এই গৃহে একটি ছাত্র হয়েও দাঁড়ালাম। আমি ভৃত্য রইলাম বটে, তবু আমি একজন শিক্ষক লাভ করলাম যিনি আমার নয়, রাজকুমারদেরই শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন।

সকালের অনেকটা সময়ই আমি তার সঙ্গে কাটাতাম। তিনি আমাকে দিয়ে চাকরের কোনও কাজ করাতেন না। তিনি শ্রুতিলিপি দিতেন। আমি তা শুনে লিখতাম। সেই লেখা নকল করে দিতাম। এ প্রায় তার সেক্রেটারি বা সচিবের মতো কাজ করা। এতে আমারই উপকার হতে লাগল। ল্যাটিন শেখার চাইতেও বেশি। এভাবে আমি আসল ইটালিয়ান ভাষাই রপ্ত করতে লাগলাম কেবল তাই নয়, আমি যেন একটা সাহিত্যপ্রীতি এবং সাহিত্যজ্ঞানও লাভ করতে লাগলাম। এইভাবে যে সুযোগ আমি আমার পূর্বের অবস্থান লা ট্রিব্যুসে পাইনি, সে সুযোগ এখানে লাভ করতে পারলাম। বেশ কিছু উত্তম বইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটতে লাগল। পরবর্তী সময়ে আমি নিজে যখন সাহিত্যের কাজ করতে শুরু করি, তখন এই বাসার এই সুযোগটা আমার খুবই উপকারে এসেছিল।

আমার জীবনের এই পর্যায়টি আমার জীবনে বিশেষ উপকারের পর্যায়ই ছিল। এই পর্যায়ে কোনও রোমাঞ্চের পেছনে না ছুটে এমন কাজের সুযোগ পেলাম যে কাজে আমি আবার দক্ষতার কিছু পরিচয় দেখাতে সক্ষম হলাম। 'আছে' বা মঠাধ্যক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ব্যাপারে খুবই খুশি হয়ে উঠলেন। তিনি সবাইকে এবং তার পিতাকেও আমার কথা প্রশংসার সঙ্গে বলতে লাগলেন। তার বাবা আমার প্রতি এমন স্নেহপরায়ণ হয়ে উঠলেন যে একদিন বললেন তিনি কঁতে দা ফ্যাব্রিসকে আমার কথা বলেছেন এবং কঁতে দা ফ্যাব্রিস রাজার কাছে আমার কথা বলেছেন। দেখলাম, মাদাম দ্য ব্রিল যে আমার ওপরে একটু বিরক্তি বোধ করেছিলেন, তার সে ভাবটিও বেশ দূর হয়ে গেছে। মোটকথা এই বাড়িতে আমার সম্মান বেশ বেড়ে গেল। এবং আমার এমন অবস্থায় বাড়ির অপর চাকরদের মনে আমার প্রতি ঈর্ষার সঞ্চার হলো। তারা যখন দেখল বাড়ির কর্তার ছেলেই আমার ব্যাপারে সব নির্দেশ সবাইকে দিচ্ছে, তখন তাদের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে এখন থেকে আর আমি ওদের মতো একটা সামান্য চাকর নই।

আমি পরে ভেবে দেখেছি যে এ সময়ে আমার সম্পর্কে যা একটু আলোচনা আমার কানে এসেছিল তাতে আমি বুঝতে পারছিলাম আমার ওপর কোনও এক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। রাষ্ট্রদূত জাতীয় কোনও দায়িত্ব– যা একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির ওপরই মাত্র অর্পণ করা যায়। সোঁতে দ্যা গুভনের এই পরিকল্পনাটি দস্তুরমতো তার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক ছিল। কিন্তু আমার পক্ষে এমন পরিকল্পনার পরিণাম বা এর পরিধি কোনওটাকেই বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না। আর আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূর্খতা এটা বুঝতে একেবারেই অক্ষম ছিল যে এই ঘটনাটার মধ্যে যে কোনও মেয়ে জড়িত, সেটা আমার ভাগ্যের জন্য যেমন নিরাপদ, তেমন সম্মানজনক। সব কিছুই ভালমতো এগুচ্ছিল। আমি যেন হঠাৎ সকলেরই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে গেলাম। আমার শিক্ষানবিসির সময়ও শেষ হয়ে গেল। সবাই মনে করতে লাগল এই ছেলেটার ভাগ্য খুলে যাচ্ছে। অথচ যে দায়িত্ব আমাকে দেয়া হচ্ছিল তাতে পৌঁছার রাস্তা আমার জন্য এটা নয়। আমি তাতে পৌঁছেছিলাম বটে, কিন্তু এই পথ দিয়ে নয়। সে পথটা ছিল ভিন্নতর। এবার আমি আমার চরিত্রের সেই বৈশিষ্ট্যের কথা বলব যেটি ছিল সব কিছুরই মূলে। এ বিষয়ে বেশি রহস্য না করে আমার পাঠকদের কাছে আমি এবার ব্যাপারটা খুলেই বলি।

[রুশোর জীবনের এই পর্যায়ের একটা ঘটনার কথা বলা প্রয়োজন। রুশো এই সময়ে একটা মাস্তান, বদমায়েশের খপ্পরে পড়ে। লোকটার নাম ছিল বাকল। রুশো কারোর নিষেধ না শুনে লোকটার সঙ্গে ভবঘুরের মতো সুইজারল্যান্ড এবং ফ্রান্স ভ্রমণে বেরোয়। কিন্তু এই যাত্রাতে রুশো যখন এ্যামনেসিতে মাদাম দাঁ ওয়ারেনস্ এর বাড়িতে পৌঁছে তখনি সে মাস্তান বাকল-এর কব্জা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়।]

মাদাম দ্য ওয়ারেনস-এর গৃহের যখন আমি নিকটবর্তী হলাম তখন আমার বুকে রীতিমতো কম্পন ধরে গেল। আমার পা দুটো কাঁপছিল। আমার চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার বোধ হলো। আমি যেন না কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম, না কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম। পুরনো কাউকে যেন আমি চিনতে পারছিলাম না। আমার নিজেকে স্থির করতে বারবারই আমি থেমে পড়ছিলাম।

নিজেকে স্থির করতে দস্তুরমতো আমার অনেকটাই সময় লাগছিল। কিন্তু আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাদাম দ্য ওয়ারেনস-এর গৃহের সামনে রুশো

এমন অবস্থা কেন হলো? আমি কি চাচ্ছিলাম, কেউ আমার কাছে আসুক, কেউ আমাকে একটু সাহায্য করুক? আমি কি তখন ভয়ানক ক্ষুধার্ত ছিলাম? ক্ষুধার্ত অবস্থায় কারোর কি এমন দশা ঘটে? না আমার বয়সী কারোর কি ক্ষুধার্ত অবস্থায় এমন ঘটে? না আমার বয়সী কারোর ক্ষুধার জন্যই এমন অবস্থা হয়, এটা আমি বলতে পারিনে। না, আমার জীবনে এরকম ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। কোনও অভাব অনটনের কারণে আমি আত্মহারা হয়ে যাব এমন আমি ভাবতে পারিনে। আমার জীবনে নানা উত্থান পতন ঘটেছে। আমার জীবন কখনও মসৃণ ছিল না। আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন আগে আগেও ছিলাম। তবু দারিদ্র্য কিংবা সম্পদ কোনও ক্ষেত্রেই আমার অন্তর্দৃষ্টির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। প্রয়োজনে আমি ভিক্ষা করেছি, দরকার হলে অপর যে কারোর মতো আমি চুরিও করেছি : কিন্তু তার জন্যে মনে কোনও মনস্তাপের সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘশ্বাস আমি জীবনে কম ফেলিনি, চোখের জল আমার কারোর চাইতে কম পড়েনি। কিন্তু দারিদ্র্যে আমি নিপতিত কিংবা দারিদ্র্যের আশঙ্কা আমার মনে দীর্ঘশ্বাসের সৃষ্টি করেনি, চোখেও অশ্রুর কারণ ঘটায়নি। ভাগ্যের সঙ্গে মোকাবেলা, আমার এই প্রথম নয়। ভাগ্যের ওপর আমার দোষারোপ নয়। তাই কোনও কিছুর অভাব আমার মনে শূন্যতার সৃষ্টি করেনি। বরং আমি বলব যখন জীবনে আমার কোনও কিছুর অভাব ঘটেনি, আমার মনে, তখনি যেন একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আমার তখনি মনে হয়েছে, কেন আমি সবচাইতে একটা দুঃখী মানুষ।

মাদাম দ্য ওয়ারেনস-এর ঘরে ঢুকতেই তার দর্শন পেয়েই আমার বুকে বল ফিরে এল। তার দৃষ্টিতে আমি স্থির হতে পারলাম। তিনি যখন কথা বললেন, তখন তার কণ্ঠের স্বর আমাকে উদ্বেলিত করে তুলল। আমি তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লাম। আমি নি:সঙ্কোচে তার হাত চুম্বন করলাম। আমার সম্পর্কে তিনি কিছু আগে শুনেছিলেন কিনা, তা জানিনে। কিন্তু তার উচ্চারিত কোনও শব্দে আমার প্রতি তার কোনও অসন্তোষ বা স্নেহশূন্যতার ভাব ছিল না। কিরে তুই আবার ফিরে এসেছিস! তার কণ্ঠে আমাকে আদর করার ভাব ছিল। 'আমি জানতাম এমন কষ্টের যাত্রায় তুই দুঃখ পাবি। যাই হোক, সাংঘাতিক কিছু খারাপ যে ঘটেনি, তাতে আমি খুশি হয়েছি। এখন বল : তোর কী হয়েছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তখন তাকে আমার কাহিনী বললাম। খুব লম্বা কাহিনী নয়। সব যে বলেছি তা নয়। তবে তেমন কিছু আমি লুকাইনি। আবার কিছু বাড়িয়েও বলিনি।

এখন প্রশ্ন হলো, আমি ঘুমাব কোথায়? আমার শোবার ব্যবস্থা কি হবে? মাদাম তার দাসীর সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করলেন। আমি সে আলাপ শুনলাম বটে। কিন্তু কোনও কথা বলার আমি সাহস পেলাম না। তারপরে যখন শুনলাম এই ঘরেই আমি শোব, তখন যেন আমার কানকেই আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি দেখলাম আমার যা একটু কাপড়-চোপড়ের ব্যাগ ছিল তা মাদাম দ্য ওয়ারেনস-এর কোচের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার আনন্দের সীমা রইল না যে এ ব্যবস্থা কোনও সাময়িক ব্যবস্থা নয়। এটাই আমার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা। আমি যখন নিজের মনে অন্য কথা ভাবছিলাম, আমি তখন শুনতে পেলাম মাদাম দা ওয়ারেনস বলছেন : 'যে যা বলে বলুক। ঈশ্বর যখন ওকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে, আমি তখন ওকে পরিত্যাগ করব না।'

এভাবে মাদাম দ্য ওয়ারেনস-এর গৃহেই আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। অবশ্য আমার খুশির দিনের শুরু এখান থেকেই নয়। তবু এই শুরুটি যে আমার সুখের দিনকে প্রশস্ত করেছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে একজনের হৃদয়ের এমন স্পর্শ লাভ করায় আমার যে কোনও কৃতিত্ব ছিল, এমন নয়। এ যথার্থই ভাগ্যের ব্যাপার। একে আমি শুধু ঘটনাক্রমের ফল বলতে পারি। ঘটনা যদি এমনভাবে না ঘটত তাহলে আমার মতো চেতনা-সম্পন্ন কিশোরের পক্ষে তার নিজের অস্তিত্বকেই আবিষ্কার করা সম্ভব হতো না। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় পর্যন্ত এই ছিল আমার মনের অবস্থা। মাদাম দ্য ওয়ারেনস-এর সঙ্গে পুনরায় যদি এই সাক্ষাৎ না ঘটত কিংবা তার নিকট থেকে যে স্নেহপূর্ণ ঘনিষ্ঠতার অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছিলাম তা যদি আমি না পেতাম, তাহলে আমার নিজের অস্তিত্বকেই আমি জানতাম না। আমি তাই আজও বলছি, কেবল তথাকথিত ভালবাসা লাভ করে কেউ তার জীবনের সুন্দরতম বোধকে লাভ করে না। সুন্দরতম অনুভূতি কাকে বলে, সে তা জানে না। আমার আর একটা অনুভূতির কথা মনে হচ্ছে। এ অনুভূতি আমার যতটা না দেহজ ছিল তার চাইতে অনেক বেশি মনোগত এবং আনন্দজনক ছিল। হ্যাঁ এর সঙ্গে যে ভালবাসার যোগ না আছে, তা নয়। তবু এ ভালবাসা থেকে পৃথক কিছু। আবার এটাকে আমি কেবল বন্ধুত্ব বলেও আখ্যায়িত করতে পারিনে। হ্যাঁ, এর একটা-ইন্দ্রিয়গত দিকও ছিল। আমি জানি এমন অনুভূতি কেবল দু'টি মানব এবং মানবীর মধ্যে ঘটতে পারে। দু'টি পুরুষ বা দু'টি মেয়ের মধ্যে ঘটতে পারে না। হ্যাঁ, আমি তার বন্ধু ছিলাম। একজন কিশোর কি আর একজন হৃদয়পূর্ণ মহিলার বন্ধু হতে পারে না? এবং যে বন্ধুত্বের অনুভূতি আমি মাদাম দ্যা ওয়ারেনস-এর নৈকট্যে লাভ করেছি, তেমন অনুভূতি আমার কোনও পুরুষ বন্ধুর ঘনিষ্ঠতায় লাভ করতে পারতাম না। ব্যাপারটা অবশ্যই একটু রহস্যজনক। এর যা একটু স্পষ্টতা তা কেবল আমার কাহিনীর পরবর্তী বিবরণীতেই প্রকাশ পেতে পারে। যে অনুভূতিকে আমরা কেবল এমন অনুভূতির প্রকাশ বা ফল দ্বারাই উপলব্ধি করতে পারি। অন্য কোনও উপায়ে নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাদাম দ্য ওয়ারেনস একটি পুরনো বাড়িতে বাস করতেন। তার নিজের ঘরটি বেশ বড় ছিল। ঘরটির সঙ্গে একটি ড্রয়িং রুমও ছিল। মাদাম তার এই ড্রয়িং রুমটিতেই আমার থাকার ব্যবস্থা করলেন। এই ড্রয়িং রুমের পাশেই একটি যাতায়াতেরও পথ ছিল। একটি উপরে। ওখানে দাঁড়িয়ে আমি চারদিকের বাতাস, আর সবুজের দৃশ্য উপভোগ করতে পারতাম। এখানেই মাদামের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। আমার মতো কিশোরের পক্ষে এমন দৃশ্য দেখার ভাগ্য একটা দুর্লভ ভাগ্য ছিল। আমার বসিতে বাসের পরে এমন ভাগ্য আর ঘটেনি। এর আগে আমার সেই জীবনে চারপাশের উঁচু দেয়ালগুলো দেখা ছাড়া আর কিছুই আমার চোখে পড়ত না। এবার যে সৌভাগ্য আমার ঘটল তাতে আমার আনন্দ আর আবেগের কোনও শেষ ছিল না। চারদিকের প্রকৃতির এমন দৃশ্য দেখতে পারাটা আমার মাতৃসুলভ মাদামেরই অপার দয়া বলে আমি বোধ করলাম। আমার মনে হল তিনি আমার জন্যই এই সমস্ত ব্যবস্থার আয়োজন করেছেন। তাঁরই পাশের ঘরে বাসের এই সুযোগকে আমার অন্তরের সমস্ত আনন্দ দিয়ে আমি গ্রহণ করলাম। চারদিকের সব কিছুরই মধ্যে আমি মাদামের অস্তিত্বকে অনুভব করতাম। বসন্তের বাতাস আর তাঁর নিজের সৌন্দর্যের মধ্যে কোনও ভেদ ছিল না। দুটোই আমার চোখে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আমার হৃদয়ের প্রকাশ এতদিন যেখানে সংকুচিত হয়েছিল এখন সে এমন বন্ধনহীন মুক্তিতে প্রসারিত হয়ে প্রকাশের সুযোগ যেন লাভ করল। ফল-ফলারীর বাগানের মধ্যে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চারিত হলো।

আমার এই জীবনের প্রথম দিনটিতেই আমাদের দু'জনের মধ্যে যে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল মাদামের সমগ্র জীবনেই তার প্রকাশ অব্যাহত ছিল। তিনি আমাকে সস্নেহে সম্বোধন করতেন 'রাচ্চা' বলে। আমি তাকে শ্রদ্ধাভরে 'মামমা' বা 'মা' বলে ডাকতাম। পরবর্তী সময়ে আমাদের ঘনিষ্ঠতা যতই বৃদ্ধি পায় আমাদের পারস্পরিক এই সম্বোধনের কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমি নিজে মনে করি এই দু'টি সম্বোধনের মধ্যেই আমাদের মধ্যকার সম্পর্কের সারল্য, সততা এবং অন্তরঙ্গতা প্রকাশিত হতো। আমার দিক থেকে আমি বলব, এমন মা আমি জীবনে লাভ করিনি : এমন মমতা আর স্নেহময় জননী। আমার মনে হতো তিনি আমার কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই কামনা করতেন না। আমাদের এ সম্পর্কে ইন্দ্রিয়জ কিছুর যদি কোনও প্রকাশ ঘটত তাতেও তার চরিত্রে কোনও ব্যতিক্রম ঘটত না। তার এমন আচরণে আমি আরও আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়তাম। আমার কাছে তিনি এক অত্যাশ্চর্য আদরের মা মণি হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠতেন। আমি আদর শব্দটি ব্যবহার করেছি। হ্যাঁ, আমার মা মণি আমাকে চুম্বন করেছেন। এমন চুম্বন তো মা-ই তার সন্তানকে করতে পারে। আর কে পারে? আর যেমন তিনি, তেমনি আমি এই স্নেহ আর আদরের অপর কোনও অর্থের কথা চিন্তা করতে পারিনি। পাঠক হয়তো বলবেন, তবু পরিশেষে ব্যাপারটা তো ওখানে থাকেনি। আমি তা স্বীকার করি। তবু বলব পাঠককে : একটু ধৈর্য ধরুন। একটু অপেক্ষা করুন। এক চোটেই কি আমার জীবনের এই পর্যায়ের কথা আপনাকে বলতে পারি? আমাকে বলতে দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের দু'জনার প্রথম মিলন যেদিন ঘটেছিল সেটিই ছিল আমাদের সর্বোত্তম আবেগের মিলন : মাদাম আমার জীবনের সেই আবেগটিকে কোনওদিন বিস্মৃত হতে দেননি। অথচ মিলনের সেই মুহূর্তটি আমাদের দু'জনার জন্যই ছিল অপ্রত্যাশিত। আমার নিজের দৃষ্টি কখনও তার অন্তর্বাসকে ভেদ করতে পারেনি। আমার তেমন কোনও ইচ্ছা জাগেনি। তেমন হলে আমার দৃষ্টিতেই তা প্রকাশ পেত। মাদাম সামনে এলে আমার মনে কোনও কামনার ইচ্ছা জাগত না। আমি তার সামনে যেন একটা অদ্ভুত আনন্দ এবং প্রশান্তিতে ডুবে যেতাম। এমন আনন্দ এবং প্রশান্তির কোনও বিশ্লেষণ চলে না। আমি নিজেও জানতাম না, কী বোধে আমি উদ্বুদ্ধ হচ্ছি। যদি জীবনের কথা বলি তবে আমি বলব, এমন প্রশান্তিতে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বোধ না করে আমার সমগ্র জীবনটা আমি কাটাতে পারতাম। জীবনে এমন মানুষকে আমি আর লাভ করিনি। আমাদের দু'জনার মধ্যে কখনও কথার কোন অভাব ঘটেনি। কথার অভাবে আমরা দু'জনের কেউ কখনও বিন্দুমাত্র বিব্রতবোধ করিনি। আমাদের দু'জনার আলাপ যত না কোন বিশেষ বিষয়ে নিবদ্ধ থাকত তার অধিক কেবল আমাদের মধ্যে কাহিনীর খৈ ফুটত। কারোর কোনও আগমন না ঘটলে আমাদের দু'জনের আলাপ কখনও শেষ হতো না। আর একটু কথা বলি, এমন করে আমাকে আহ্বানের তার কোনও প্রয়োজন পড়ত না। কথার জন্য আহ্বান নয়, কথা বন্ধ কখন হবে তারই কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। তার নিজের পরিকল্পনার কথা ভাবতে ভাবতে তিনি অনেক সময়ে একটা যেন গভীর চিন্তায় ডুবে যেতেন। তথাপি আমি শব্দহীন হয়ে যেতাম। আমার কথা বন্ধ করে একা আমি তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতাম। আর সেই মুহূর্তটি আমার নিজেকে মনে হতো এই জগতের যেন সর্বশ্রেষ্ঠ একজন সুখী মানুষ। আমার হৃদয়ের কথার আকাঙ্ক্ষাকে আমি প্রকাশ করতাম না। তবু হঠাৎ যদি কোনও ঘটনায় আমার অন্তরের কামনায় বাধা ঘটত তখন যেন আমি উন্মাদ প্রায় হয়ে যেতাম। কেউ যদি হঠাৎ মাদামের ঘরে আসত, সে পুরুষ কিংবা মহিলা যে হোক না কেন, অপর কারোর উপস্থিতি সহ্য করতে না পেরে আমি মাদামের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতাম। পাশের ঘরে বসে আমি কেবল মিনিট বা মুহূর্তকে গণনা করতাম, আর ভাবতাম এই অবাঞ্ছিত দুর্বৃত্তদের অস্তিত্বের শেষ কখন ঘটবে। আমি অস্থির হতাম। মাদামের সঙ্গে ওদের এমন কী কথা থাকতে পারে। এমন অসহ্য আলাপ?

মাদামের প্রতি আকর্ষণের চরম বোধ আমার মধ্যে তখনি জাগত যখন তিনি আমার দৃষ্টির মধ্যে থাকতেন না। তারপরে তাকে দেখা মাত্রই আমার মনে একটা তৃপ্তিবোধের সৃষ্টি হতো। কিন্তু তাকে দেখতে না পেলে আমার অস্থিরতা দুরারোধ্য হয়ে দাঁড়াত। তার সঙ্গলাভের স্পৃহা আমার মধ্যে এমন আবেগের সৃষ্টি করত যে আমার চোখে জল জমে উঠত। আমার জীবনের সেই ঘটনার কথা আমি কখনও বিস্মৃত হতে পারব না। সেদিনটা ছিল কোনও একটা বড় পর্বের দিন। উৎসবের দিন। মাদামকে যেতে হয়েছিল সান্ধ্যপ্রার্থনার মজলিসে। আমি তার সঙ্গহীনতাকে সইতে না পেরে ঘরের বাইরে রাস্তায় হাঁটতে বেরুলাম। আমার অন্তর তখনও তার অবয়বটিতে পূর্ণ ছিল। আমি চাচ্ছিলাম যেন আমি আমার সারাটা জীবন তার বুকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছটিতে থেকে কাটাতে পারি। অবশ্য আমি বুঝতাম আমার এমন কল্পনা একটা পাগলের কল্পনা বৈ আর কিছু নয়, এবং যে শান্তি আর সুখের আমি কামনা করছি তার ক্ষণকালের ছাড়া দীর্ঘকালের হতেই পারে না। এমন চিন্তায় আমার মন বিমর্ষতায় ভরে উঠত। অবশ্য তাই বলে আমার মনে কোনও হতাশার অভাব আসত না। এবং যতই অসাধ্য হোক না কেন আমার মন নানা ইচ্ছা পূরণে পূর্ণ হয়ে উঠত। আমার এমন একাকিত্বের মধ্যে দূরের কোনও ঘণ্টাধ্বনি, কাছের পাখ-পাখালীর গুঞ্জন, দিনের আলো, চারদিকের বন বনানীর দৃশ্য, চারদিকের ঘরবাড়ি : এসব কিছুই এমন সময়ে আমার মনে এমন একটা অবর্ণনীয় ভাবের সৃষ্টি করত যে আমার মনে হতো আমি যেনএকটা স্বর্গীয় সুখের সন্ধান পেয়েছি : এর মধ্যে ইন্দ্রিয়জ কোনও কিছুরই আমি কল্পনা করতে পারতাম না। এই ঘটনার দিনের এই ভাবটিকে আমি জীবনে বিস্মৃত হতে পারিনি। আমার বোধকে সেটা সেদিন আচ্ছন্ন করেছিল। তার একটা অত্যদ্ভূত ব্যাপার এমনি ছিল যে, এই দিনটির কথা স্মৃতিতে এলে আমি যথার্থই যেন সেই স্বর্গ-কল্পনায় স্বর্গীয় বোধে ফিরে যেতাম। আর তাতে আমি এক অনাবিল আনন্দ বোধ করতাম। এমন যদি আমি কল্পনা করতে পারি যে একটি লোকের মনের স্বপ্ন যথার্থই বাস্তবে রূপায়িত হতে সে দেখতে পেল, তখন তার যা অবস্থা হবে আমার জীবনেও যেন সেদিন সেই অবস্থাটির উদ্ভব ঘটেছিল। একথা ঠিক যে আমার স্বপ্ন এবং কল্পনা অবশ্যই অবাস্তব ছিল। আমি কল্পনা করেছিলাম যেন আমি আমার সমগ্র জীবনই এমনি কল্পিত স্বর্গরাজ্যে বাস করতে পারব। অথচ বাস্তবে তার অস্তিত্ব ঘটেছিল মাত্র মুহূর্তের জন্য। আর এখানেই আমাকে হতভাগ্য বলে বোধ হয়। আমার কল্পিত সেই শেষহীন স্বর্গীয় জীবন মাত্র মুহূর্তের জন্যই স্থায়ী হয়েছিল : তার অধিক নয়। সেটি ছিল আমার স্বর্গীয় কল্পনা। এবং সেটি ভাঙতে অধিক সময় লাগেনি। এটা সত্য। এবং এটাই বাস্তব।

যে সব প্রীতিভরা দুষ্টুমি আমি মামার সঙ্গে সে সময়ে করেছি, তার কোনও স্মৃতি আমাকে কোনওদিন কষ্ট দেবে, এমন কথা বুঝলে আমি সে কাজ করতাম না। মামা যে শয্যায় একবার শয়ন করেছেন, সে শয্যাকে আমি প্রীতিভরে কতবার যে চুম্বন করেছি। কেবল শয্যা নয় যে কিছুকে তিনি স্পর্শ করেছেন : সে ঘরের যে কোনও আসবাব, এমন কি যে মেঝেতে তিনি পদচারণা করেছেন সবই ছিল আমার অপার আকর্ষণের বিষয়। আপনারা একে আধিক্য বলেন, আমি স্বীকার করব আমার ভালবাসার প্রকাশে আধিক্য ছিল। একদিন খাওয়ার টেবিলে মামা যখন একটু কি যেন মুখে পুরেছেন, অমনি আমি চীৎকার করে উঠলাম : মাম্মি আমি যে একটা চুল দেখতে পেলাম, তোমার খাবারের মধ্যে! আমার চীৎকার শুনে মামা তার মুখের খাবার বের করে টেবিলের প্লেটের ওপর রাখলেন? আর আমি খপ করে তার মুখের খাবারটা আমার মুখে পুরে খেয়ে ফেললাম! কেবলএকটা কথায় আমি বলতে আমাদের দু'জনার প্রেম-প্রীতির মধ্যে একটি মাত্র ব্যাপার ঘটেছিল যা আমি স্মরণ না করে পারছিনে। এ ব্যাপারটাই আমার চিন্তার একেবারে বাইরে ছিল।

ইতালি থেকে আমি ফিরে এলাম বটে, কিন্তু যে আমি ইতালিতে গিয়েছিলাম সে আমি নই। কেবল যে আমার নৈতিক কৌমার্য নিয়েই ফিরে এলাম তাই নয়। আমার দৈহিক কৌমার্য সেদিনও অটুট ছিল। হ্যাঁ, আমার বয়স বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পারছিলাম। আমার অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তারপর এর দৈহিক এমন একটা প্রকাশ ঘটল যাতে আমি একেবারে আতঙ্কিত বোধ করলাম। আমার এমন ভীতির বোধই সাক্ষ্য দিল যে আমার কৌমার্য সেদিনও কত অটুট ছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে আমি বুঝলাম এতে ভীত হওয়ার কিছু নেই। এ প্রাকৃতিক প্রয়োজন এবং তার প্রশান্তির একটা প্রকাশ। এটাতে কিছু নেই। বরঞ্চ প্রকৃতির এমন চাহিদা অস্বীকার করলে আমার রুমের তরুণদের জীবনেরও বিপদ ঘটতে পারে। এটাকে যদি পাপ বলি পাপ। তবে এমন পাপের মধ্যেই নিহিত থাকত একটা প্রশান্তির ভাব। এমন ঘটনার স্মৃতিও আমাকে নানা কল্পনায় উত্তেজিত করে তুলত। নিষ্কৃতির এমন সুযোগ পেয়ে আমি এর ব্যবহারে কখনও নিবৃত্ত হইনি। ফলে আমার স্বাস্থ্যের হানি ঘটতে লাগল। অবশ্য ক্রমান্বয়ে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টাও করছিলাম। এর কারণ ছিল আমার স্নেহময়ী মামার কোনও ক্ষতির কথাই আমি চিন্তা করতে পারতাম না। তার সঙ্গে আমার এই বন্ধনের ঘোর অত সহজে কাটেনি। আমি সর্বক্ষণ তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতাম। তিনি যে শয্যায় শায়িত হয়েছেন, তিনি ঘরে না থাকলে আমি তাতে শয়ন করেছি। উত্তেজনার এমন সুলভ উপায়ের কথা আর চিন্তা করা যায় না। যে পাঠকরা আমাকে এ পর্যন্ত পাঠ করেছেন তাদের মনের ভাবের প্রকাশ ঘটেছে এমন ভাষায় যে ব্যাটা মরেছে! কিন্তু ব্যাপারটা তা ছিল না। যা আমাকে নষ্ট করতে পারত, মামার সঙ্গে আমার সম্পর্ককে, আসলে তাইই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল! মামার সঙ্গে আমি আছি, এর চাইতে আনন্দের আর কী আছে? তিনি আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকুন আর না থাকুন, আমি তাকে আমার জন্য এক অপার স্নেহ এবং মমতার পাত্রী বলে দেখতাম। এমন চিন্তায় তিনি আমার জননীবৎ ছিলেন, আমার ভগ্নীবৎ ছিলেন, তিনি আমার এক আনন্দবন্ধ বন্ধুবৎ ছিলেন। এর অধিক আর কিছু আমি চিন্তা করতে পারতাম না। এইভাবেই আমি তাকে দেখতাম। সবসময়েই একই রূপে, একই স্নেহের মমতার পাত্রী হিসেবে আমি দেখতাম। আমার অন্তরের মধ্যে তার জায়গাতে অপর কারোর স্থান ছিল না। তিনি তখন ছিলেন আমার জীবনের একমাত্র নারী। এবং যে মমতা দিয়ে তিনি আমাকে সর্বদা আবৃত করে রাখতেন সেখানে অপর কোনও চিন্তার, অন্য কোনও ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির জায়গা ছিল না। ফলে আমি আমার অনুভূতির ক্ষেত্রে কোনও বিচ্যুতির শিকার হইনি। যেন তার মাতৃস্নেহের বর্ম সবদিক দিয়ে আমাকে রক্ষা করেছে। এককথায় আমি দেহমনে পুত-পবিত্র ছিলাম। এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ আমার প্রতি আমার মাম্মার পূত-পবিত্র ভালবাসা। আমার এমন অনুভূতির কোনও প্রকাশ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তেমন প্রকাশে অক্ষম। পাঠকদের কেউ যদি আমার অন্তরটিকে বুঝতে পারেন, তাহলে তার পক্ষেই সম্ভব হবে সহানুভূতির দৃষ্টিতে সেদিনের আমাকে অনুভব করা। আমার নিজের জন্য এতটুকু আমি বলতে পারি এ পর্যন্ত বিবৃত আমার কাহিনী যদি আপনাদের নিষ্পাপ বলে বোধ হয় তাহলে আমি বলতে পারি আমাদের পরবর্তী সম্পর্কও ঠিক এর চাইতেও মহৎ আরও পূত-পবিত্র ছিল।

[রুশোর বিবরণে দেখা যায় রুশো তার মাদাম দা ওয়ারেনস-এর সাংসারিক কার্যাদিতে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সাহায্য করছে। এই সুরেই রুশো তার কাহিনীটি বলে চলেছে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাদাম দ্যা ওয়ারেনস যে রুমটিতে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সে রুমটিতে বেশ কিছু বই এবং পত্র-পত্রিকা ছিল। আমার পড়ার বাতিক আগের মতো উদগ্র না থাকলেও এই ঘরে আমি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বই পাঠের সুযোগ পেয়েছিলাম। এগুলির মধ্যে ছিল : 'দি স্পেকটেটর' 'পুফেনডর্ফ' 'সেইন্ট এভারমণ্ড' 'দা হেনরিএড্'। পড়ার আগের বাতিক না থাকলেও কিন্তু হাতে কোনও কাজ না থাকলে আমি ঘরের এই বইগুলি পড়তাম। এর মধ্যে 'দি স্পেকটেটর'-এর আমি রীতিমতো ভক্ত হয়ে পড়লাম। এই পত্রিকাটি আমার বেশ উপকারে এসেছিল। সেই যে এ্যরে দ্যাঁ গুভনের কথা বলেছিলাম তার কথা ছিল : বই পড়বে, কিন্তু গোগ্রাসে গিলবে না। চিন্তা করে পড়বা। তার এই উপদেশটি আমার ভাল লেগেছিল। ফলে আমার পড়ার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা এসেছিল। ...

আমার মাদাম আর আমি : আমরা দু'জনে মিলে লা ব্রুইয়ার পাঠ করেছি। লা ব্রুইয়ারকে মাদাম লা রচেফুলভ-এর চাইতে বেশি পছন্দ করতেন। রচেফুলভ অবশ্য একটু গম্ভীর ধরনের লেখক ছিলেন। তবু আমার মতো তরুণদের পক্ষে তাকে পাঠ করতে কোনও অসুবিধা হতো না। মাদাম যখন আমাকে নানা প্রকার উপদেশ দিতে চাইতেন তখন অনেক সময়ে তিনি অনেক জ্ঞানগর্ভ সমস্যায় ডুবে যেতেন। আমি তখন তা থেকে বাঁচার জন্য তার হাত বা মুখে চুম্বন এঁকে দিতাম। আর তাতে তার ক্লান্তিকর উপদেশ মালা থেকে আমি যেন কিছুটা মুক্তিও অর্জন করে নিতে পারতাম। ...

কিন্তু আমার চরিত্রের দুটো বিপরীত বৈশিষ্ট্যকে আমি তখনও বুঝতে পারিনি। একদিকে আমার মধ্যে ছিল একটা মনভরা আবেগ, আর একটা ছিল আমার মধ্যে নানা দুর্বোধ্য ভাবের উদয়। এসব ভাবের মাথামুণ্ড আমি সহজে বুঝতে পারতাম না। আমার মনে হচ্ছে আসলে আমি একটা ব্যক্তিই নই। আমার হৃদয়াবেগ আর আমার মন : এ দু'য়ের সহাবস্থান আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হতো। আবেগটা যেন কোনও কোনও সময়ে হঠাৎ বিদ্যুৎ বেগে আমার অস্তিত্বকে দখল করে ফেলত। কিন্তু আবেগ তো একটা মানুষের বুদ্ধিকে কোনও সংকটে আলোকিত করতে পারে না। আবেগ আপ্লুত মুহূর্তে আমি যেন কী এক অনুভূতির মধ্যে ডুবে যেতাম যেখান থেকে আমি কী একটা বোধ করতাম কিন্তু কিছু বুঝতাম না। এমন সময়ে আমি নিজের অস্তিত্বের ওপর আমার নিয়ন্ত্রণকেই হারিয়ে ফেলতাম। যে উপলব্ধির জন্য আমার স্থিরতার প্রয়োজন হতো, সে স্থিরতা তখন আমার মধ্যে থাকত না। এ নিয়ে চিন্তা করলে আমার কাছে এইটা বিস্ময়কর মনে হয় যে, আবেগে আপ্লুত হলেও তার ফলে আমি তেমন কোনও কাণ্ড ঘটিয়ে বসতাম না। মুহূর্তের আবেগে আমি অস্বাভাবিক কিছু রুখনও করেছি বলে আমি মনে করতে পারছিনে। আবেগ-আপ্লুত সময়েও আমি আর একজনের সঙ্গে স্বাভাবিক কথাও বলতে পারতাম। এ ব্যাপারে স্পেনীয়দের বেশ খ্যাতি আছে। আবেগের মধ্যেও দাবার চালে নাকি তারা বিশেষ ওস্তাদ। আমি স্যাভয়ের ডিউকে যখন পাঠ করেছি তখন এর একটা দৃষ্টান্ত পেয়েছিলাম। তার অভিযাত্রার এক মুহূর্তে একটা প্যারিসিয়ান ফেরিওয়ালার সাক্ষাৎ পেয়ে সে চীৎকার করে উঠেছিল : এবার তোকে পেয়েছি, এখন তুই যাবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায়? এই দৃষ্টিতে আমি খুব আমোদিত হয়েছিলাম। এই গল্প পড়েও আমিও চীৎকার করে উঠেছিলাম : এবার তোমারে পাইছি রুশো, এখন তুমি যাইবা কোথায়?

একদিকে আমার এই চিন্তার জড়তা আবার আমার অনুভূতির তীব্রতা কেবল যে আমার আলাপের অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত হয়ে গেল, তাই নয়। আমি যখন নিজের একাকিত্বের মধ্যে ডুবে যেতাম কিংবা কোনও কাজে ব্যস্তও হতাম তবু এই বোধ থেকে আমার মুক্তি ঘটত না। আমার মস্তিষ্কে আমার ভাবগুলো অবিশ্বাস্যভাবে আমাকে আলোড়িত করে তুলত। তখন যেন আমি নানা শব্দ শুনতে পেতাম। সে শব্দে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠতাম। আমার শরীরে কম্পন জাগত। আমি স্তব্ধ হয়ে যেতাম। কিন্তু ধীরে ধীরে এ অবস্থাটা কেটেও যেত। আমার মাথাটা যেন আবার পরিষ্কার হয়ে উঠত। সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠত। কিন্তু এমন বোধের যাতায়াত সহজে ঘটত না। যখন আমি আক্রান্ত হতাম তখন আমি যথার্থই বিভ্রান্ত এবং অস্থির হয়ে পড়তাম। পাঠককে বলি, আপনি কখনও ইটালির অপেরা দেখেছেন? সেই মঞ্চে যখন দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটত, তখন অপেরার বিরাট মঞ্চে বেশ কিছুক্ষণ ধরে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হতো। যা কিছু সাজ-সজ্জা সব এলোমেলো হয়ে যায়। দৃশ্যের দড়িদড়ার সব টানাটানি শুরু হয়। তখন মনে হয় যেন সব শেষ হয়ে গেল। আর কিছুই হবে না। আবার কিন্তু আস্তে আস্তে সব কিছু ঠিক হতে থাকে। এবং ক্রমে আবার একটি সুন্দর দৃশ্য যেন মঞ্চে ভেসে ওঠে। আমার মাথার মধ্যেও যেন এই রকম একটা কিছু ঘটে। আমি যখন কিছু লিখতে বসি তখন এরকমটাই যেন হয়। কেবল আমি যদি অস্থির না হতাম। একটু যদি অপেক্ষা করতে পারতাম, তাহলে আর কোনও লেখকই আমার দৃষ্টিকে অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হতো না। আমার কিছু লেখার ব্যাপারে এই হচ্ছে আমার বড় অসুবিধা। আমার পাণ্ডুলিপিতে নানা রকমের আচড় পড়ে। সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। আর হাতের লেখার যা অবস্থা দাঁড়ায় তা পড়ার ক্ষমতা আমারই থাকে না। আমার পাণ্ডুলিপির এমন অবস্থা আসলে আমার মনের অবস্থারই সাক্ষ্য। আমার এমন কোনও পাণ্ডুলিপি নাই যাকে ছাপার জন্য প্রেসে পাঠাবার আগে আমাকে চারবার এমন কি পাঁচবারও কপি করতে না হয়েছে। কলম হাতে নিয়েই আমি কখনও কিছু করতে পারিনি। কেবল যে চেয়ার টেবিলে কলম হাতে বসাই যথেষ্ট ছিল এমন নয়। আমার মধ্যে আমি কলম বাদেই লিখেছি। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে লিখেছি। বিছানায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লিখেছি : আমি ঘুমিয়েও লিখেছি। কাজেই পাঠকরা আমার দুরবস্থার কথা বুঝতে পারবেন। জীবনে দু'টা ছত্র আমি সুখস্থ করতে পারিনি। কত চিন্তা-ভাবনাকে যে আমি রাতের পর রাত মাথার মধ্যে কতবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেছি, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। আসলে আমার লেখার গুণই বলেন, আর দোষই বলেন : বিনা পরিশ্রমে এর কোনও কিছুরই তর তর করে জন্ম ঘটেনি। আবার আমার একাকিত্বও আমার কিছু লেখার একটা আকর্ষণ। কারোর সামনে আমি কখনও কিছু লিখতে পারিনি। আমার দিকে কেউ তাকিয়ে থাকলে তার পক্ষে আমি যে একটা ছত্রও লিখতে পারি এমন ভাবা তার পক্ষে সম্ভব হত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[যা হোক, শেষপর্যন্ত ধর্মযাজকরা স্থির করল : রুশোকে পাদ্রী বা ধর্ম যাজক উপাধিতে ভূষিত করা হবে। এবারে সে যে খুব খুশি হলো তা নয়। মনের বেদনা নিয়ে সে তার নির্ধারিত প্রশিক্ষণের মঠের উদ্দেশে যাত্রা করল। তার ধর্মাধ্যক্ষ হয়ে দাঁড়াল আবেগাতিয়ার।]

মশিয়ে গাতিয়ারের প্রতিকৃতিটি আমি কোনও দিন বিস্মৃত হতে পারিনি। কোনও ধনাঢ্য পরিবার থেকে সে আগত ছিল না। বয়সেও অধিক নয়। তার প্রতিকৃতিটি ছিল সুন্দর শ্মশ্রুমণ্ডিত একটি নিষ্পাপ সদৃশ ব্যক্তির প্রতিকৃতি। তার শ্মশ্রুতে কিছুটা লাল রঙের আভা ছিল। তিনি যে অঞ্চল থেকে এসেছিলেন তার বৈশিষ্ট্য তার প্রকৃতিতে স্পষ্টই ছিল। তার নিজের অঞ্চলের মানুষের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল বাহ্যত : গম্ভীর প্রকৃতির অভ্যন্তরে জ্ঞানের আলোর আভা। কিন্তু মশিয়ে গাতিয়ারের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল একজন হৃদয়বান, সেবাপরায়ণ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। তার নীলাভ চোখ দু'টির মধ্যে একটা সৌজন্য এবং বিষণ্ণতার মিশ্রণ কারোর দৃষ্টি এড়াতে পারত না। যে কেউ তার এমন বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট বোধ না করে পারত না। তার আচরণ এবং বিষণ্ণতা থেকে যে কেউই বোধ করতে পারত যে লোকটির চরিত্রের মধ্যে যেন একটা আজন্মলালিত দুঃখবোধের ভাব ছিল।

এর কয়েক বছর পরে আমি জানতে পারলাম যে, একটি মঠের অধ্যক্ষ থাকাকালীন অবস্থায় সে একটি অল্প বয়স্ক মেয়ের প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের এমন মিলনে মেয়েটির একটি সন্তানও হয়েছিল। এর ফলে তার মঠের মধ্যে তার বিরুদ্ধে বড় রকমের একটি কলঙ্কের ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এ ব্যাপারে মঠগুলির শৃঙ্খলা ছিল ভয়ানক রকমের কঠোর। কোনও যাজকেরই কোনও মেয়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে কোনও সন্তানের জন্ম হওয়া ছিল মারাত্মক অপরাধের ব্যাপার। মশিয়ে গাতিয়ারের এই ভয়ানক অপরাধের জন্য তাকে বন্দি করে কারাগারে আবদ্ধ করা হলো। তাকে অসম্মানিত করে পদচ্যুত করা হলো। তিনি তার পদ আবার ফিরে পেয়েছিলেন কিনা, তা আর আমি জানতে পারিনি। তবে আমি যখন 'এমিলি'৫ রচনা করি তখন বারংবার এই চরিত্রটি আমার মনে উঁকি দিতে থাকে। এই মশিয়ে গাতিয়ার এবং মশিয়ে গায়মি; এই দু'টি মর্যাদাবান চরিত্রের মিলনেই তৈরি হয়েছিল আমার এমিলির 'স্যাভোয়ার্ত ভাইকার'। আমার এমন সৃষ্টিতে এঁদের দু'জনের কারোরই যে কোনও বিকৃত রূপের প্রকাশ ঘটেছিল, তা আমি মনে করিনে। আর তাতেই আমার আনন্দ।

এবার আমি নিশ্চিত হলাম : কোনও দায়িত্বপূর্ণ পদেরই আমি উপযুক্ত নই। মশিয়ে গাতিয়ার উপরস্থের নিকট আমার বিরুদ্ধে তেমন কোনও বিরূপ রিপোর্ট যে পেশ করেছিলেন, এমন নয়। তবু ওপর তলার অধ্যক্ষরা মনে করল ধর্মযাজক হওয়ার মতো উপযুক্ত কোনও লোক আমি নই। আর তাই আমি এ পর্যন্ত যতদূর এগিয়েছিলাম তার অধিকের জন্য তাদের কাছ থেকে কোনও সুপারিশ আমার ভাগ্যে ঘটল না।

তারা আমাকে মাদাম দ্য ওয়ারেনস-এর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিমত ছিল, ছেলেটার চরিত্র খারাপ নয় বটে, তুব এ ছেলে ধর্মযাজক হওয়ার উপযুক্ত নয়। এজন্যই আমার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সত্ত্বেও মাদাম আমাকে তার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করলেন না।

মাদাম আমাকে যে সব মূল্যবান সঙ্গীত গ্রন্থ বা রেকর্ড দিয়েছিলেন : তার সবই আমি তাকে ফেরত দিলাম। তার সেই সস্নেহ উপহার আমার দুর্লভ ভাগ্য স্বরূপ ছিল। সেই সঙ্গীতভাণ্ডার আমার অপরিমেয় উপকার সাধন করেছিল। যে মঠে আমি অধ্যয়নরত ছিলাম সেখানে আমার শিক্ষা অ্যালাকিউস এবং এ্যারেথুসা পর্যন্ত পৌছেছিল।৬ সঙ্গীতের প্রতি আমার আকর্ষণ আমার প্রতি মাদামের স্নেহের আধিক্যের অবশ্যই একটি উৎস ছিল। তিনি আমাকে একটি সঙ্গীতশিল্পীতে পরিণত করতে চাইলেন। তার গৃহে এর উপযুক্ত পরিবেশও ছিল। প্রায় প্রতি সপ্তাহে তার গৃহে একটি সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন হতো। এবং সেখানকার ধর্মীয় মঠের যিনি সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন তিনি প্রায়ই তার গৃহের এই সঙ্গীতমিলনীতে উপস্থিত থাকতেন। যে সঙ্গীত পরিচালকের কথা বললাম তার নাম ছিল লা মিতার। তিনি যথার্থই একজন ভাল সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। তিনি এসেছিলেন প্যারিস থেকে। তিনি বেশ উৎফুল্ল ধরনের লোক ছিলেন। দেখতে তখনও তিনি সুন্দর এক যুবক ছিলেন। বুদ্ধি যে বেশি ছিল, তা নয়। তবু মোটামুটি একজন ভদ্রলোক তো বটে। মামা আমাকে তার সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন! তাকে আমার বেশ পছন্দ হলো। তিনিও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন না। তার কাছে সঙ্গীত শেখার জন্য আমার কত লাগবে তারও একটা আলোচনা হলো। মোট কথা এই সঙ্গীত শিক্ষকের বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। তাতে আমার কোনও অসুবিধা হলো না। শীতটা সেখানে আমার ভালই কাটল। কারণ মাদাম তথা আমার মামমার বাসগৃহ থেকে তার বাড়ির দূরত্ব ছিল মাত্র বিশ গজের মতো। আমরা 'মামমার' গৃহে কয়েক মিনিটে পৌছে যেতাম এবং প্রায়শই আমরা সকলে মিলিতভাবে আহার করতাম।

এটা অবশ্য বুঝতে তেমন অসুবিধে হবে না যে, সঙ্গীত শিক্ষকের বাড়ির আবহাওয়াটা ধর্মীয় মঠের আবহাওয়ার চাইতে আমার জন্য বিশেষ আনন্দজনকই ছিল। তাই বলে আমার এই জীবনে যে কোনও নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলা ছিল না, তেমনও নয়। একটা কথা বলতে পারি, জন্মগতভাবে আমি যেমন আমার স্বাধীনতাকে ভাল বেসেছি, তেমন স্বাধীনতার কোনও অপব্যবহার আমার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল না। পুরো ছ'মাস আমি মামমার কাছে যাওয়া, গির্জার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া ছাড়া বাইরে কোথাও যাইনি। আর পেছনে তাকালে আমি বলতে পারি, এই সময়টার মতো মনের শান্তি আমি খুব কমই পেয়েছি। তাই এই সময়ের স্মৃতিটা আমার মনকে আজো ভরে তুলে। সব চাইতে আনন্দময় বলে বোধ হয়। নানা অবস্থাতেই আমি জীবন কাটিয়েছি। তবু এর মধ্যে এমন কিছু জীবনও আমি পেয়েছি যার স্মৃতি আমাকে যেন সাক্ষাৎ জীবনের মধ্যেই নিয়ে যায়। তাকে আমি অতীত বলে মনে করতে পারিনে। এর স্মৃতিতে কেবল সময়, পরিবেশ, নানা ব্যক্তি আমার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তাই নয়, পুরো রেশটার মধ্যেই যেন আমি প্রবেশ করি, তার আলো বাতাস, গাছপালা : সব কিছুর মধ্যে। এমন পরিবেশের সাক্ষাৎ স্মৃতি আমাকে বর্তমানেও উদ্বেল করে তোলে। যেমন ধরুন সেই সঙ্গীত শিক্ষকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহের কথা : সেখানে যা কিছু ঘটেছিল, যে সঙ্গীত গীত হয়েছিল, সেখানকার সকল এবং প্রত্যেকটি বস্তু, যাজকদের পোশাকাদি, সঙ্গীত শিল্পীদের তাল নয়, তাদের মুখের আকার আকৃতি, বাড়ির একজন পঙ্গু মিস্ত্রী, একজন তরুণ সেই যাজক যিনি ভায়োলিনে বেশ সুন্দর সুর তুলতে পারতেন, সেই মশিয়ে লা মাইতার যখন তিনি তার এতক্ষণ ফেলে রাখা আলখিল্লাটা আবার গায়ে পরতেন, এবং যাজকের সেই সুন্দর লম্বা পোশাকটি যা গায়ে জড়িয়ে তিনি সঙ্গীতের অর্কেস্ট্রাতে যোগ দিতেন উঠে দাঁড়াতেন, তাছাড়া মশিয়ে লা মায়তার যে কবিতাটি আমার ওপর তৈরী করেছিলেন তার আবৃত্তির জন্য আমি উঠে দাঁড়াতাম, এ সবের পরে সুন্দর যে ভোজের অনুষ্ঠান আমাদের জন্য অপেক্ষা করত : এই সব এবং আরও ঘটনার কিংবা ঘটনার ক্ষুদ্র একটি অংশ যখন বার বার আমার স্মৃতিতে ফিরে আসে তখন সে কেবল যে অতীতের স্মৃতি তা নয়, সে আমার যথার্থই বর্তমান অস্তিত্বেরই অনুভূত অংশ। আনেনসিতে আমি প্রায় এক বছর কাটিয়েছিলাম। এজন্য আমার কোনও দুঃখ ছিল না। সেখানকার সবাই আমাকে ভালবেসেছে। সেই যে তুরিন ছেড়ে এসেছিলাম তার পরে আমি আর তেমন কোন মূর্খতার পরিচয় দিইনি। আর তাছাড়া আমার দুষ্ট হওয়ার কোনও উপায়ই ছিল না। কেননা আমার ওপর তার স্নেহের আচ্ছাদন বিছিয়ে ছিলেন মাদাম দ্য ওয়ারেনস। আমার জননী স্বরূপা। তিনিই ছিলেন আমার পথপ্রদর্শক, আমার পরিচালক তার সে পরিচালনায় আমার জন্য তার কল্যাণ কামনা ছাড়া অপর কিছুরই স্পর্শ ছিল না। তার প্রতি আমার সকল অস্তিত্বের আকর্ষণই ছিল আমার একমাত্র আকর্ষণ। আর সে কারণেই বলছি, তার মধ্যে আমার কোনও মূর্খতা ছিল না। আমার অন্তরের মধ্যেই আমার সেই আকর্ষণের মহৎ যুক্তি ছিল। একথা ঠিক যে মাদামের প্রতি আমার সর্বাত্মক আকর্ষণের কারণে আমার কোনও ক্ষমতাকেই আমি কোনও কাজে লাগাতে পারিনি। সঙ্গীত শেখার যে কথা আমি বলেছি, তার প্রতিও আমি কোনও দৃষ্টি দিতে পারিনি। আমি যে চেষ্টা করিনি তা নয়। সর্বান্তকরণে আমি চেষ্টা করেছি। কিন্তু মাদামের বাইরে আমি কিছু চিন্তা করতে পারিনি। আমি কেবল স্বপ্ন দেখতাম ; এবং কোনও কিছুই সাধন না করতে পারার দীর্ঘশ্বাসই ছিল আমার তখনকার অস্তিত্ব আর কর্মের একমাত্র প্রকাশ। কিন্তু আমি কী করব? এমনতর ছিল আমার অসহায় বোধ। আমার মাথার মধ্যে ভাবের অভাব ছিল না। আর এমন ভাবের প্রত্যেকটির মধ্যে ছিল আমার মূর্খতার প্রকাশ। একবার কিন্তু একটা কাজের ভাব আমার মধ্যে ঢুকেই গেল : বলতে পারি মূর্খতার ভাব নয়। যথার্থ কাজের ভাব। কিন্তু তার কথা এখন থাকা মূর্খতার মধ্যেও যে সার্থকতার কিছু থাকে, আমি তার প্রমাণও তখন পেয়েছিলাম। ফেব্রুয়ারি মাসের এক ভয়ানক শীতার্ত ঠাণ্ডায় আমরা যখন সবাই অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বসেছিলাম, তখন বাইরে রাস্তার দিকের দরজায় আমরা একটা শব্দ শুনতে পেলাম। বাসার পরিচারিকা পেরিন ওর হাতের বাতি ধরে বাইরে গেল। দরজা খুলে একটি যুবককে নিয়ে এল। যুবকটি উপরে এসে মশিয়ে ল মিতারকে বেশ সম্মানসূচক কথায় নিজের পরিচয় দিয়ে বলল : সে একজন ফরাসি সঙ্গীত শিল্পী। তার আর্থিক অবস্থা ভাল নয় বলে সে কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মঠে কাজ করতে চায়। মশিয়ে কো মিতার ওর মুখ থেকে 'আমি একজন ফরাসি সঙ্গীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পী' কথাটি শুনেই অসম্ভব আনন্দ বোধ করলেন। কেননা মশিয়ে লা মিতারও ফরাসি সাহিত্য শিল্পের জন্য বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি বেশ আনন্দের সঙ্গেই প্রায় ভবঘুরে এই যুবকটিকে তার গৃহে আশ্রয় দিলেন। যেদিন তরুণটি এসেছিল মঁশিয়ে লা মাইতার তাকে রাতে থাকতে জায়গা দিলেন। যুবকটি এমন আশ্রয় পেয়ে সে রাতে যথার্থই উপকৃত হয়েছিল। আমার সাথে তার কোনও কথা হয়নি। কিন্তু সে যখন আগুনের পাশে বসে আগুন পোহাচ্ছিল আমি তখন তাকে দেখছিলাম। এরপরে আমাদের খাবারও দেয়া হলো। লোকটির দিকে আমি দৃষ্টি রাখছিলাম। ওর দৈহিক গঠনে কিছুটা অস্বাভাবিকতা ছিল। ঘাড় এবং পিঠটা যেন একটু বাঁকা ছিল। তাই তাকে মনে হচ্ছিল যেন একটু কুঁজো। ওর গায়ের কালো কোটটা যেমন ময়লা ছিল তেমনি অতি ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। গায়ের জামাটা কিন্তু দামি কাপড়ের ছিল। কিন্তু যত না পুরনো তার চাইতে অধিক ময়লা পায়ের মোজা এমন ছিল যে একটার মধ্যেই ও দুটো পা-ই ঢুকিয়ে দিতে পারত। রুফের হাত থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য ও ওর বগলের নিচে একটা টুপিও ধরে রেখেছিল। এমন খাপছাড়া পোশাকেও কিন্তু লোকটার মধ্যে একটা মহত্ত্ব ছিল বলে আমার মনে হলো। তার ব্যবহার যাই হোক, এটা বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল না। তার কথা-বার্তা শুনে আমার তাকে বুদ্ধিমান বলেই বোধ হলো। কথার পাশে কথার জবাব দিতে সে আটকাচ্ছিল না। হয়তো-বা জবাবের দ্রুততা একটু বেশিই ছিল। সব মিলিয়ে আমার মনে হলো লোকটা শিক্ষিত, তবুও ওর মধ্যে নীতিবোধ তেমন না থাকতে পারে। অভাবী ছিল। তবু আচরণে ভিক্ষুক ভাবটা তত ছিল না। সে তার নাম বলল : ভেঞ্চার দা ভিলেনুভা। বলল সে প্যারিস থেকে আসছিল। কিন্তু আসতে আসতে পথ হারিয়ে ফেলেছে। তার কথার মধ্যে কিছু এলোমেলো ভাব ছিল। এতক্ষণ যদি-বা সে তার পথের কথা বলছিল, এখন বলল সে তার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে আর এই আত্মীয় ফরাসি পার্লামেন্টের একজন সদস্য। এজন্য তাকে গ্রেনোবল যেতে হবে।

খাবার খেতে খেতে এই লোকটির আলাপ আবার সঙ্গীতে ফিরে এল। এ ব্যাপারে তার আলাপকে আমার বেশ ভাল লাগল। তার পরিচয়ের পরিধি বেশ ব্যাপক বলে মনে হলো। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এবং তাদের মূল্যবান গ্রন্থাদির কথাও সে বেশ সহজেই বলল। শিল্প সঙ্গীত জগতের বিভিন্ন নায়ক-নায়িকার কথাও সে উল্লেখ করল। এদের মধ্যে অভিজাত ব্যক্তিদেরও নাম ছিল। মনে হলো এদের অনেককে যথার্থই সে দেখেছে। কিন্তু দেখা গেল কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের আলাপ উঠলে সে যেন আলাপটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাচ্ছে। হঠাৎ হয়তো এমন একটা কথা বলল যাতে সবাই হেসে উঠল। দিনটা ছিল শনিবার। পরের দিনই গির্জাতে একটা সঙ্গীতের জলসা ছিল। মঁশিয়ে লা মাইতার তাকে সঙ্গীতের জলসাটিতে যোগ দিতে বললেন। তাতে লোকটি আনন্দের সঙ্গেই রাজি হলো এবং কী বিষয়ে সে বাজাবে এ কথাতে সে 'অলটো' গীতের কথা উল্লেখ করল। কিন্তু তার পরেই কথাটা অন্যদিকে মোড় নিল। গির্জার জলসার আগে তাকে তার কনসার্টের অংশটি দেখান হলো। কিন্তু সেটিতে একটু চোখ বুলানোরও সে প্রয়োজন বোধ করল না। লোকটার এমন মাতব্বরী আচরণে লা' মাইতার বিস্মিত হলেন। মাইতার একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্তে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন : তুমি দেখবে, এ ব্যাটা আসলেই কিছু জানে না। আমি বললাম, মঁশিয়ে আমারও তাই মনে হচ্ছে। যাই হোক জলসার আগে সকলেই মিলে যখন মঠের দিকে যাত্রা করলাম তখন আমার মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ বোধ করলাম। সঙ্গীত যখন শুরু হলো আমি যেন আমার হৃদস্পন্দন শুনতে পেলাম। কারণ লোকটাকে আমার উড়িয়ে দেবার ইচ্ছা হচ্ছিল না।

আমি দেখলাম, আমার অস্বস্তি বোধ করার কোনও কারণ নেই। ওর গাওয়া সঙ্গীতের দুটো অংশ খুবই সঠিক ছিল। তার মধ্যে ওর একটা সঙ্গীতবোধেরও প্রকাশ ঘটছিল। ওর গলাটা খুবই সুন্দর লাগছিল। সেদিন আমি ওর এই ক্ষমতার প্রকাশ দেখে যথার্থই বিস্মিত এবং আনন্দ বোধ করছিলাম।

[কিন্তু মাদাম দ্য ওয়ারেনস গানের ওই ছেলেটাকে তেমন পছন্দ করলেন না। তার ভয় ছিল ওটার প্রভাবে রুশোও খারাপ হয়ে যাবে। ফলে দেখা গেল ম লা' মাইতারও সরে পড়তে চাইল। ও একদিন পালিয়ে গেল। আর রুশোও ওর সঙ্গ ছাড়ল না। দু'জনের লিয়নস পর্যন্ত এক সঙ্গে গেল। কিন্তু রুশোও শেষে লা মাইতার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল। সেদিন গানের সেই ছেলেটার মৃগী রোগের একটা আক্রমণ ঘটেছিল। রুশো সেই সুযোগে ওই লোকটা থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলল।]

যে সব ঘটনা আমি এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছি, তার কোনও কোনও ঘটনা, কোনও কোনও স্মৃতি আমার মনের ভেতরে এখনও ভেসে ওঠে। আমার পরের অংশে এর কিছু বিবরণ আমি আমার পাঠকদের দেব। সেগুলো আমার পাঠকদের কাছে একেবারেই অজানা। এগুলো সাংঘাতিক রকমের বাড়াবাড়ি ঘটনা। আমার ভাগ্য ভাল যে আরও খারাপ কিছু আমার জীবনে ঘটেনি। তবে সঙ্গীতের ব্যাপারটায় আমি আর তাল সামলাতে পারলাম না। সঙ্গীতের বাতিক আপনাআপনিই একদিন শেষ হয়ে গেল। আমি আমার মূর্খতাগুলোকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম। একেবারে যে পেরেছিলাম, তেমন নয়। তবু আমার চরিত্রবিরোধীগুলোর অনেকগুলো আমি পরিত্যাগ করতে পেরেছিলাম। আমার জীবনের এই পর্যায়টার ব্যাপারে আমি এখনও কোনও স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে পারিনি। এই পর্যায়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করার তেমন কোনও ঘটনাই যেন ঘটেনি। ফলে এর কোনও স্পষ্ট স্মৃতিও আমার নেই। আমার নিত্য পরিবর্তনশীল ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যে নানা রকম ঘটনাই ঘটছিল। কেবলমাত্র স্মৃতির ওপর ভর করেই আমি আমার জীবনের এই পর্যায় সম্পর্কে বলছি। এ পর্যায়ের ওপর আমার কোনও দিনলিপি বা ডায়েরি বা লিখিত কোনও কিছুই ছিল না।

আমার জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছে যার স্মৃতি এত তীব্র এবং উজ্জ্বল যেন তা মাত্র গতকালই ঘটেছে। আগে নয়। কিন্তু আবার এমন ঘটনাও ঘটেছে যার বর্ণনা কেবল অনুমানের ওপর ভর করেই আমাকে করতে হচ্ছে।

কাজেই এটা খুবই সম্ভব যে এমন ঘটনাও আমার মনে ভেসে উঠছে বলে মনে হচ্ছে, যা আসলে আদৌ ঘটেনি। এর পুনরাবৃত্তি যে না ঘটবে তেমনও আমি বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছিনে। অবশ্য সেগুলো তেমন মূল্যবানও কিছু নয়। হয়তো এগুলো আর তখন ঘটবে না যখন আমার দৃঢ় স্মৃতি আমি ফিরে পাব। তবে যেগুলো আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট, সেগুলোর বর্ণনায় আমার মিথ্যাচার বা কল্পনা নেই। এ ব্যাপারে পাঠকরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

[এর পরবর্তী সময়ে রুশো যখন আবার এ্যানেসিতে ফিরে এল তখন সে দেখল মাদাম দ্য ওয়ারেনস প্যারিসে চলে গেছেন। তাঁর নানা রহস্যজনক কর্মকাণ্ড ছিল। তার হদিস রুশো জানত না। তারই কোনওটির কারণে হয়তো রুশো এ্যানেসিতে ফিরে আসার পূর্বেই মাদাম দ্য ওয়ারেনস প্যারিসে চলে গিয়েছিলেন।]

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ পুস্তক

[১৭৩১-১৭৩২]

আমি এ্যানেসিতে এলাম বটে, কিন্তু সেখানে মাদাম দ্য ওয়ারেন্স-এর সাক্ষাৎ পেলাম না। আমি এরকম আশঙ্কা করিনি। ফলে আমার বিস্ময় আর দু:খের অন্ত ছিল না। এবার আমি বুঝতে পারলাম লা-মাইতারকে ওভাবে ফেলে রেখে আমার চলে আসা উচিত হয়নি। পরে আমি যখন জানতে পারলাম বেচারি কী সাংঘাতিক দুর্ভোগে পড়েছিল তখন আমার পরিতাপের সীমা রইল না। তার যে গানের বাক্সটি ছিল তার মধ্যেই তার কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র ছিল, সেটাও তার লিয়নস-এ আসার পরে সে দেখল যে সেটিও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এর মূলে কোঁতে দরতান থেকে পাঠানো একটা পত্র যার মধ্যে তার সব কিছু বাজেয়াপ্ত হওয়ার কারণ বর্ণিত ছিল। লা' মাইতার বহু চেষ্টা করেও তার জিনিসপত্র আর উদ্ধার করতে পারেনি। তার জীবনধারণের উপায়, তার সমগ্র জীবনের উপার্জন সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য সেই গানের বাক্সের মালিকানার ব্যাপারে একটা গণ্ডগোল ছিল। কিন্তু সেটার কারণে তার সবকিছু খোয়া গিয়েছিল, এমন কথা কেউ বলেনি। বেচারির কোনও অপরাধের উল্লেখ পর্যন্ত না করে জবরদস্তিভাবে লা মাইতারকে দণ্ডিত করা হলো। বেচারি লা মাইতার এভাবেই তার দক্ষতার সব অর্জনকে হারিয়ে তার বার্ধক্যেরও বাঁচার সব সম্বল হারিয়ে নি:স্বতে পরিণত হয়েছিল। এই ঘটনা আমার জীবনে একটা বিরাট আঘাত হিসেবে এসেছিল। কিন্তু আমারও তখন এমন বয়স, যে কোনও আঘাতেই আমি পরাজিত বোধ করতে পারতাম না। মাইতারের ক্ষতি সইতে আমার তেমন কোনও সময় লাগল না। আমার প্রত্যাশা ছিল মাদাম দ্য ওয়ারেনস-এর একটা খবর আমি পেয়ে যাব। কিন্তু আমি তার কোনও ঠিকানা জানতাম না এবং তিনিও জানতেন না যে আমি ফিরে এসেছি। আর সব মিলিয়ে আমি মনে করলাম, লা মাইতারের দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে আমার কোনও অপরাধ ছিল না। ও যখন মাদাম ওয়ারেনস-এর কাছে থেকে পালায় আমি ওকে তখন সাহায্যই করেছিলাম। আর এর বেশি সাহায্য করার কোনও ক্ষমতাও আমার ছিল না। আমি যদি ওর সঙ্গে ফ্রান্সে থেকেও যেতাম তবু তাতে ওর মৃগীরোগের কোনও উপশম ঘটতো না। ওর গানের বাক্সও আমি বাঁচাতে পারতাম না। ওকে কোনও রকমে সাহায্য করতে পারার বদলে আমার নিজের বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে ওর কষ্টই কেবল বৃদ্ধি করতে পারতাম। আমার তখনকার মনের অবস্থায় সমস্ত ব্যাপারটার মীমাংসা এভাবেই করেছিলাম। আমি আমার তখনকার মনের অবস্থার কথা বলছি। এখন অবশ্য আমি ব্যাপারটাকে ওভাবে দেখিনে। একটা নিন্দনীয় কাজ আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন করি ঠিক তখনি আমরা তার লজ্জাটাকে উপলব্ধি করতে পারিনে। অনুশোচনা বা লজ্জা যদি আমাদের আসে তবে তা আসে ঘটনার বহু পরে, একমাত্র স্মৃতিতে। এবং এটাও ঠিক, নিজের জীবনের এমন লজ্জাজনক আচরণের স্মৃতিতে সেই লজ্জাটা সহজে দূরও হয় না। লজ্জাটা আমাদের কুড়ে কুড়ে খায়।

[রুশো বাহাদুরির সঙ্গেই একদিন যাকে বিরাটভাবে প্রশংসা করেছিল, তাকে নির্মমভাবেই পরিত্যাগ করল এবং তাকে বিস্মৃত হলো।]

মাদাম দ্য ওয়ারেনস তাঁর সঙ্গে কেবল এ্যানেতকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মারসারেতকে পেছনে রেখে গিয়েছিলেন। এটি তার পরিচারিকা ছিল। এর কথা আমি আগে বলেছি। আমি ফিরে এসে দেখলাম, সে মাদাম ওয়ারেনস-এর সেই ঘরেই থাকছে। এই মারসারেত বয়সে আমার চেয়ে একটু বেশি ছিল। খুব যে সুন্দরী তা নয়। তবু অপছন্দের নয়। একটু বুর্জোয়া ধরনের। কিন্তু অপাপবিদ্ধ তরুণী। ওর মধ্যে আমি ওর চরিত্রগত দোষ কিছু দেখিনি। তবু এটা সত্য যে মারসারেত মাঝে মধ্যে বড় অবাধ্য হয়ে উঠত। তার কর্ত্রীকেও সে মানতে চাইত না। আমি প্রায়শই ওকে দেখতে যেতাম। ওতো আমার পুরনো পরিচিত লোক। আর ওকে দেখলে আমার আর একজনের কথা মনে পড়ত যাকে আমি ওর চেয়েও অধিক ভালবাসতাম। বলা চলে তার জন্যই আমি মারসারেতকে ভালবাসতাম। এ মেয়েটার অনেক বন্ধু ছিল। এদের মধ্যে মাদ্রিমসেল জিরদও ছিল। এ এসেছিল জেনেভা থেকে। ও আমার কিছু পাপ কামনার জন্যই আমাকে পছন্দ করেছিল। সে মারসারেতকে চাপ দিত যেন ও আমাকে তার কাছে নিয়ে যায়। আমার তাতে বাধা দানের কিছু ছিল না। কারণ, আমি তো মেয়েটাকে যথার্থই পছন্দ করতাম। সে পরিবারে পছন্দের পুরুষ আরও ছিল। জিরদ মাঝে মাঝেই আমার কাছে আসত। তার প্রতি আমার কোনও অনিচ্ছা ছিল না। তবু তার কিছু কিছু আচরণ আমাকে বিতৃষ্ণা করে তুলত। বিশেষ করে যখন ওর শুকনো শূয়োরের মতো কালো লম্বা নস্য ভরা নাকটা আমার মুখে ঘষতে চাইত তখন আমার মনে হতো ওর মুখে আমি থু থু ছিটিয়ে দিই। কিন্তু আমি তা করতাম না। আমি ওকে সহ্য করতাম। আর তাছাড়া যে মেয়েগুলো ছিল তাদের আমি পছন্দই করতাম। ওরা একে অপরের সঙ্গে খুনসুটি করত যে, মাদাম সেল জিরদকে তুষ্ট করতে কিংবা আমার কাছে ঘেঁষার জন্য। আমি তখন এর মধ্যে খারাপ কিছু বোধ করিনি। এর মধ্যে বন্ধুত্ব বৈ আর কিছু ছিল? তখন থেকে আমি ভেবেছি এর মধ্যে এর অধিক কিছু থাকার কথা ভাবার থাকলে সে তো আমাকেই ভাবতে হবে। ওদের কী দোষ? কিন্তু আমার তেমন কিছু মনে হয়নি। আমি কখনও এ নিয়ে চিন্তাও করিনি।

তাছাড়া, জামা-কাপড়ের দাসী, শোবার ঘরের পরিচারিকা বা বাজার করার মেয়ে : এদের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ ছিল না। আমার আকর্ষণ ছিল তরুণী, যুবতী মেয়েদের জন্য। সবার স্বভাব তো এক নয়। আমার ক্ষেত্রেও তাই। তাই এ ব্যাপারে হেরেস[৭]-এর সঙ্গে আমার চিন্তার যে মিল হবে এমন তো কোনও কথা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটকথা মেয়েটার জাত কী, তার বংশের মর্যাদা ইত্যাদি আমার আকর্ষণের কারণের মধ্যে পড়ত না। হ্যাঁ, রঙটা ফর্সা হলে, ওর হাত দু'টি যদি সুন্দর হতো, চুলগুলো লম্বা, স্বভাবে একটা সুচারুতা এবং পরিচ্ছন্নতা থাকত, কাপড় চোপড়ে বাহারি তবে সেটি আমার আকর্ষণের বিন্দু হয়েই দাঁড়াত। পোশাক-পরিচ্ছদে মনোমুগ্ধকর হলে তার দেহের সৌন্দর্যের চাইতেও আমার মনকে অধিক ভোলাত। আমি বুঝি আমার এমন পছন্দের কথা খুলে বলা উচিত নয়। তবু একথা আমি স্বীকার করি এসব ক্ষেত্রে যা আমি বললাম, তাকেই আমি গুরুত্ব দিতাম।

হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে। আর একবার একটা সুযোগ জুটে গিয়েছিল। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে তাকে নিয়ে আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারতাম। আমার কৈশোরের সেই দিনগুলোতে আমার বারবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। এগুলো আমার জীবনে এমন মধুর স্মৃতি ছিল এবং সেগুলো এত ক্ষণকালের ছিল : অথচ আমি তাদের একেবারে একটা সহজ প্রাপ্তি বলে মনে করতাম। এখন সেদিনের দিকে তাকালেই আমার মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং বাকি জীবন যেন তাকে এমনি করে স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারি, তার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি।

একদিনের একটা সকাল : কী চমৎকার আমার মনে হয়েছিল যে ঘুম থেকে উঠে আমার কাপড়-চোপড়ের পরোয়া না করে সূর্য ওঠার দৃশ্যটা দেখার জন্য আমি ছুটে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলাম! আমার মন ভরে, আমার বুক ভরে সে দৃশ্যটা আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। দিনটা ছিল 'সেন্ট জন' উৎসবের পরের দিন। চার দিকের পৃথিবীটা যেন বিচিত্র রঙে আর ফুলের বাহারে ভরে গিয়েছিল। কোকিলগুলো যেন ওদের কণ্ঠের শেষ ডাকটি শোনাচ্ছিল। এ যেন বসন্তের বিদায়ের মুহূর্তে প্রকৃতির সকল চরিত্রের মিলিত সঙ্গীত। গ্রীষ্মের আগমনে সকলেই সমস্বরে কণ্ঠ মেলাচ্ছিল। এমন শীতের দেশে এমন দৃশ্য খুব কমই দেখা যায়।

এসব খেয়াল ছিল না। আমি শহর থেকে তখন বেশ কিছু দূরেই চলে গিয়েছিলাম। গরম ক্রমে বাড়ছিল। একটি পাহাড়ি ঝরনার পাশ দিয়ে আমি তখন হাঁটছিলাম। আমার পেছনে আমি ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলাম। মেয়েদের গলার আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল। আমার পেছনে তাকালে আমি দেখলাম কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। ডাকটা শুনে একটু এগুতে দু'টি পরিচিত মেয়ে আমার নজরে পড়লো! অল্প বয়সের মেয়ে। এদের একটির নাম ছিল মাদামসেল গ্রাফেনরিড, অপরটির নাম মাদামসেল দা গ্যালি। এরা ওদের অশ্বের পরিচারিকা ছিল। কিন্তু ওরা ওদের ঘোড়াকে ঝরনাটা পার করাতে পারছিল না। মাদাম গ্রাফেনরিডের স্বভাবটি বেশ ভাল ছিল। ওর বাড়ি ছিল বোধ হয় বারনস-এ। কী এক ঘটনায় ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এই মেয়েটাও মাদাম দ্য ওয়ারেনস-এর দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করেছিল। আর মাদাম দ্য ওয়ারেনস-এর বাড়িতেই মেয়েটাকে আমি প্রথম দেখি। কিন্তু ওর নিজের কোনও বেতনাদি না থাকতে ও মাদাম গ্যালের সঙ্গে থাকতে শুরু করে। এই মাদাম গ্যালে তার মাকে বলে বাড়িতে আশ্রয় দেয়ার ব্যবস্থা করে। গ্যালের সাথী হিসেবে মেয়েটা তাদের বাড়িতে থাকতে শুরু করে। গ্যালে এই মেয়েটার চাইতে বছর দুই ছোট ছিল। দেখতেও বেশি সুন্দর ছিল। ওর দৈহিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভাবলাম, বরং আর একটা কাজ করি। গ্যালের ঘোড়াটার লাগাম ধরে টান দিই। তাহলে ঘোড়াটা নিশ্চয়ই ঝরনার স্রোতটা পার হয়ে যাবে

গঠনটাও বেশ বাড়-বাড়ন্ত ছিল। আসলে একটা মেয়ের শরীরের গঠনটাই আসল। ওরা পরস্পরকে ভালবাসত। ঝরনার ধারের ঘটনার সময়েই ওরা আমাকে এ কাহিনী শুনিয়েছিল। ওরা বলল : ওরা তুষারের দিকে যাচ্ছে। গ্যালেরই সেখানে নাকি একটা বাড়ি ছিল। ওরা আমাকে মেয়েটা পার করে দিতে অনুরোধ করল। ওদের দুটো ঘোড়া ছিল। আমি ভাবলাম, ঘোড়া দুটোকে চাবুক দিয়ে মারলে ওদের ঝরনা পার করানো যাবে। কিন্তু মেয়ে দুটো ভয় পেল। পাছে ঘোড়া দুটো লাফ দেয় এবং ওদের পিঠ থেকে ফেলে দেয়। আমি ভাবলাম, বরং আর একটা কাজ করি। গ্যালের ঘোড়াটার লাগাম ধরে টান দিই। তাহলে ঘোড়াটা নিশ্চয়ই ঝরনার স্রোতটা পার হয়ে যাবে। এই বুদ্ধিতে কাজ দিল। ঘোড়াটা আমার পেছনে পেছনে এসে ঝরনাটা পার হলো। অন্য ঘোড়াটাও প্রথমটার পেছনে এল। আমার একাজ সেরে আমি মেয়ে দুটোর কাছে আর কিছু দাবি না করে চলে আসাই ঠিক করেছিলাম। ওরা একটা আর একটার কানে ফিস ফিস করে কী যেন বলল। তখন মাদামসেল গ্রাকেনরিড আমার দিকে তাকিয়ে বলল : না, ছেলে তুমি এমন করে আমাদের ফাঁকি দিয়ে যেতে পার না। আমাদের সাহায্য করতে এসে তোমার কাপড়-চোপড় তো ভিজে একাকার হয়ে গেছে। আমাদের কিছু করার নেই নাকি? তোমার কাপড় চোপড় শুকাতে হবে না? তুমি আমাদের সঙ্গে এসো, বাছা। এখন তুমি আমাদের হাতে বন্দি। ওদের এমন কথাতে আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। আমি মাদামসেল গ্যালের দিকে তাকালাম। সেও বলল : ঠিকই তো। তুমি এমন করে আমাদের ছেড়ে যেতে পারো না। তুমি ঐ ঘোড়াটার পেছনে ওর সঙ্গে চেপে বস। কিন্তু আমার ভয়কাতুরে ভাব দেখে ওরা দু'জনে আমোদ পেল এবং হাসতে লাগল। আমি প্রথমে আপত্তি করলাম। আমি তোমাদের মাকে চিনিনে। তিনি আমাকে দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি লাফ দিয়ে ওই মেয়েটার ঘোড়ার পেছনে চড়ে বসলাম।

কী মনে করবেন? এর জবাবে গ্রাকেনরিড বলল : ওর মা তো এখন তুনের বাড়িতে নেই। আমরা আজ রাতেই ফিরে আসব। তুমিও তো তখন আমাদের সঙ্গে ফিরতে পারবে।

ওদের এমন কথায় আমার মধ্যে যেন একটা বিদ্যুৎ বয়ে গেল। আমি আনন্দে গলে গেলাম। আমি লাফ দিয়ে ওই মেয়েটার ঘোড়ার পেছনে চড়ে বসলাম। ঘোড়ার পিঠে উঠে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরার জন্য আমি যখন ওর দু'পাশ দিয়ে হাত বাড়ালাম আমার হৃদস্পন্দন তখন এমনভাবে আরো বেড়ে গেল যে মেয়েটাও তা টের পেল। সে বলল, আরে আমার বুকও তো কাঁপছে। আমি যদি পড়ে যাই তার এমন কথায় আমি ভাবিলাম ওকে আমার সাহায্য করা দরকার, আর ওর বুক যেন না কাঁপে তার জন্য ওকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরা দরকার। মনে হলো ও যেন আমাকে তাই করতে বলছে। কিন্তু আমার কিছুতে সাহস হচ্ছিল না। তবু সমস্ত পথটা আমি ওকে আমার দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলাম। একটা বেল্টের মতো আমি ওকে বেঁধে রাখলাম। আমার এ কাহিনী যে মেয়েরা পাঠ করবে, তারা আমাকে বিশ্বাসই করবে না। বিশ্বাস করবে না। সে কথা আমিও মনে করি। কিন্তু তবু আমি এর চাইতে বেশি তো সেদিন করিনি। করতে পারিনি।

আমাদের অভিযানটা সেদিন ভালই জমেছিল। সারাটা ফেরার পথ আমরা তিনজনে কথায়, আলাপে একেবারে টইটুম্বুর ছিলাম। মেয়ে দুটো তো বটেই। আমারও কথা আর হাসি ঠাট্টার কোনও অভাব ঘটেনি। এক মুহূর্তও আমরা নি:শব্দ ছিলাম না। আমাকে ওরা এমন স্বচ্ছন্দ করে তুলল যে আমার কথার উচ্ছলতার যেমন কোনও বিরাম ছিল না, তেমনি চোখের দৃষ্টিতে কোনও পলক ছিল না। অবশ্য মুখ আর চোখের ক্রিয়া অভিন্ন ছিল না। কেবল যখন আমি দু'টার একটার সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে ছিলাম তখনই মাত্র আমাদের পারস্পরিক আলাপের কিছুটা ভিন্নতা ঘটছিল। কোনও সময়ে হয়তো একটা নেমে যাচ্ছিল, আর একটা আমার সঙ্গেই ছিল। কথার বিরতি তখনি মাত্র। কিন্তু ও ফিরে এলেই আবার শুরু হতো। এবং তখন আমরা এতক্ষণ কে কতটুকু বিব্রত বোধ করেছি তার কারণ অনুসন্ধানের কোনও ব্যাপার ঘটেনি।

যখন আমরা তুনে পৌঁছলাম তখনি আমি একবার মাত্র কিছুটা প্রাকৃতিক কার্য সাধন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলাম। তুনে পৌঁছে আমরা সকালের নাশতা সম্পন্ন করলাম। পরের দিকে রাত্রির ভোজ বা ডিনারের আয়োজন হলো। তরুণী দু'টি দু'এক সময়ে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে কৃষকটির বাচ্চা ক'টিকে আদর করছিল। আমাদের আচার আচরণ যে সেখানকার ভৃত্যের চোখে খুব উপাদেয় ঠেকছে না, তা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। কিন্তু বেচারীর কিছু করার ছিল না। শহর থেকে খাবারের সবকিছুই আনা হয়েছিল। কেবল ভুলক্রমে মদ্য আনা হয়নি। এতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। মেয়ে দুটো মদ খায়নি। কিন্তু আমার বড় পিপাসা পাচ্ছিল। কারণ ওই বস্তুটি বাদে আমি আমার আচরণে সাহস যোগাড় করতে পারছিলাম না। আমার সাহসের জন্য ওটারই তখন বিশেষ প্রয়োজন পড়ছিল। মেয়ে দুটোরও মনে যে এ বস্তুর একটা অভাববোধ জাগছিল, তাও আমার মনে হয়নি। তবে ওদের আচরণ যেমন মনোহর, তেমনি নিষ্পাপ ধরনের ছিল। তাছাড়া ওরা দুটো আমাকে নিয়ে কী-বা করতে পারত? ওরা দেখলাম, গ্রামটির চারদিকেই খুঁজে বেড়াল কিছু মদ্য সংগ্রহ করা যায় কিনা। কিন্তু তেমন কিছুই জুটল না। চারপাশের লোকজনের দারিদ্র্য ছিল এমনি ভয়ানক। এই ক্যানটনটির চাষীরা এতই দরিদ্র ছিল। গ্রামের লোক নিজেদের মনের দুঃখ প্রকাশ করল। আমি বললাম : আপনারা এত দুঃখ করবেন না। আমাদের উত্তেজনার জন্য ওই বস্তুর তেমন দরকার নেই। আমি এভাবেই সেদিন তাদের প্রশংসা করার একটু সাহস দেখিয়েছিলাম। তবে গ্রামের লোকজনরা আমার প্রশংসাকে আমার আন্তরিকতারই প্রকাশ হিসেবে নিয়েছিল।

কৃষকদের রান্নাঘরেই আমাদের সন্ধ্যার আহারের ব্যবস্থা করা হলো। একটি লম্বা টেবিলের দু'পাশে আমরা বসলাম। বাড়ির আর যে অতিথি ছিল তারা ভিন্ন টুলে বসল। কিন্তু তবু সেদিনের সেই ভোজটি আমার মনের মধ্যে আটকে আছে। এটি আমার মনের একটি মধুর স্মৃতি। একটি লোক যখন এত সহজে এমন সুন্দর আনন্দ লাভ করে, তখন তার ভিন্নতর আনন্দের কী প্রয়োজন? প্যারিসের কোনও অভিজাত ভোজনালয়েই সেদিনের সেই গ্রামের এমন আপ্যায়ন আমি লাভ করতে পারতাম না। শুধু সাধারণ আনন্দের জন্য নয়। এমনকি ইন্দ্রিয়জ আনন্দও আমি সেদিন কম পাইনি।

রাতের এই ভোজের পরে আমরা একটু বিরাম নিলাম। কফি না খেয়ে একটু পরে আমরা চা খেলাম। চায়ের সঙ্গে আমরা ক্রিম আর কেকেরও ভাগ পেলাম। আমি আমার ক্ষিধেটাকে বাড়াবার জন্য একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। ফল-ফলারির বাগানের মধ্যে ঘুরলাম। আমি তো একটা চেরী গাছের ওপর উঠে পড়লাম। বেশ কিছু চেরী ফলও আমি পাড়লাম। আমি গাছ থেকে নিচে ওদের দিকে জাম ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম। ওরা আবার জামের আঁটিগুলো আমার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। একবার দেখলাম মাদামসেল গ্যালী নিজের গায়ের এ্যাপ্রন ধরে মাথাটি পেছনে ঠেলে একটি সুন্দর মূর্তিতে আমার গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেন। আমিও মজা করতে এক গুচ্ছ চেরী এমনভাবে তাকে তাক করে ছুঁড়ে মারলাম যে চেরীগুলো যথার্থই তার বুকে গিয়ে আছড়ে পড়ল। এমন ঘটনায় আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আমি তখন নিজের মনেই বললাম : আমার ঠোঁট দু'টি যদি যথার্থ চেরী হতো তাহলে সে দুটোকেও আমি এমনি করে তার বুকের ঠিক জায়গাটি তাক করে ছুঁড়ে মারতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনটা এভাবেই কাটল ভারী মজায় এবং আনন্দে। আমরা পরস্পর যেমন ইচ্ছা তেমন আচরণে রত হলাম। কিন্তু কোনও সময়েই আমরা শালীনতাকে অতিক্রম করিনি। আমাদের শালীনতাতে কোনও কৃত্রিমতা ছিল না। যেমন স্বত:স্ফূর্ত, তেমন সারল্যপূর্ণ। আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছি, যেমন মন চাইছে তেমনভাবে কথা বলেছি। মোটকথা আমার এমন শালীনতা এবং সারল্যকে অপর কেউ হয়তো নির্বুদ্ধিতা বলেই আখ্যায়িত করবে। তবু আমি বলব, আমাদের সেদিনকার ব্যাপারটা যথার্থ এরকমই ছিল। এর মধ্যে যে ঘটনাটিতে আমি একটু সাহসের পরিচয় দিয়েছিলাম, সে কেবল তখন যখন আমি মাদামসেল গ্যালের একটি হাতকে চুম্বন করেছিলাম। এ কথা সত্য যে আবহাওয়াটা এমনি হয়ে উঠেছিল যে আমার এমন আচরণে কোনও আধিক্য ঘটেনি। আমরা দু'জনে : গ্যালে এবং আমি একটু আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল। ওর চোখ দু'টিও আমার হাতের দিকে নত হয়ে পড়েছিল। আমার ঠোঁটে কোনও শব্দ ছিল না। কেবল ঠোঁট দু'টি ওর হাতের ওপর নেমে এসেছিল। সে হাতটি টেনে নেয়নি। আমার চুম্বনটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত গ্যালে তার হাতটি আমার ঠোঁটের ওপর ধরেই রেখেছিল। আমার চুম্বনটি শেষ হলেই মাত্র গ্যালে তার হাতটি সরিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল। তার দৃষ্টিতে কোনও অনিচ্ছার ভাব ছিল না। ওকে আর একটু পেলে আমি ওকে কি বলতাম জানিনে। কিন্তু অপর মেয়েটা তখনি ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমার মনটা অবশ্য তখন ওর প্রতি ঘৃণায় বিষিয়ে উঠেছিল।

এমনভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গিয়েছিল। শেষে ওরাই বলল শহরে ফিরে যেতে হবে। আর আমাদের অপেক্ষা করা উচিত নয়। তাহলে বেশি রাত হয়ে যাবে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। তাই আমরা একটু তাড়া করে যেমন এসেছিলাম তেমন করেই আবার শহরে ফিরে গেলাম। আমার যদি সাহস থাকত তাহলে ফেরার পথে আমি গ্যালের ঘোড়াটাতেই উঠে বসতে পারতাম। মাদামসেল গ্যালের আচরণটি আমার মনকে সেদিন অভিভূত করে ফেলেছিল। কিন্তু আমি যেমন কিছু বলতে সাহস পেলাম না, তেমনি ওর পক্ষেও কোনও কথা বলার ছিল না। ফিরে আসার পথে অবশ্য আমরা সকলেই বললাম : আহা! দিনটা এত দ্রুত শেষ হয়ে গেল! কিন্তু তাতে আমাদের কোনও খেদ ছিল না। বরং আমরা যে সময়টাকে নষ্ট করিনি। সময়টাকে আমরা ব্যবহার করতে পেরেছি, তাতেই আমাদের মন আনন্দে ভরা ছিল।

যে জায়গাটিতে ওরা আমায় পেয়েছিল, ফেরার পথে সেই জায়গাটিতেই ওদের ছেড়ে আমি চলে এসেছিলাম। আমাদের বিদায়ের মধ্যে একটা বেদনাবোধ ছিল। যে বারটা ঘণ্টা আমরা এক সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে কাটিয়েছিলাম, সে কয়েকটা ঘণ্টা আমাদের কাছে শতবর্ষের মতোই দীর্ঘ বলে বোধ হয়েছিল। সেই দিনটির মধুর স্মৃতি মেয়ে দু'টির কিংবা আমার কোনও ক্ষতিই সাধন করেনি। আমাদের তিন জনেরই অন্তরঙ্গতা অনন্ত আনন্দেরই ব্যাপার ছিল। আমরা তিনজনেই সেদিন পরস্পরকে যথার্থই ভালবেসেছিলাম। সে ভালবাসাতে কোনও লুকোচুরি ছিল না। তাতে আমাদের কারুরই লজ্জাবোধের কোনও কারণ ছিল না। আমাদের মনে এমন ইচ্ছাই ছিল যেন আমাদের এই অন্তরঙ্গতা অনন্তকালই স্থায়ী হয়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্রের এমন নিষ্কলঙ্ক আচরণের আনন্দটা অপর কিছুর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। আমার দিক থেকে বললে আমিও বলব এমন আনন্দের স্মৃতি আমার জীবনে খুব কমই ঘটেছে। আমি এখনও বুঝিনে মেয়ে দু'টিকে একান্তে পেয়ে আমি কী করতে পারতাম। কী আমি করতে চেয়েছিলাম। আমি দু'জনকেই ভালবেসেছিলাম। অবশ্য দু'টিকে যদি বাছাই করতে হতো তাহলে একটি যে অপরটির চাইতে আমার কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় বলে বোধ হতো না, এমন কথাও আমি বলতে পারিনে। দুয়ের মধ্যে একটির প্রতি আমার একটু অধিকতর আকর্ষণের ব্যাপার অবশ্যই ছিল। মাদামসেল গ্রাফেনরিডকে কাছে পেলে আমি অবশ্যই অধিকতর খুশি হতাম। আমার হাতে আমার ভাগ্যকে সেদিন স্থির করার ক্ষমতা যদি থাকত তাহলে আমি অবশ্যই গ্রাফেনরিডকেই আমার জীবন সঙ্গিনী করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতাম। তাকে আমি একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করতাম। সে যাই হোক আমাদের বিদায়ের মুহূর্তে আমার মনে হলো, এ দু'টির কাউকে আমি ছাড়তে পারিনে। দু'টিই আমার জীবনকে ভরে থাকুক, এটিই আমার ইচ্ছা ছিল। এদের কাউকে আমি আর জীবনে দেখতে পাবো না, এ কথা আমি সেদিন ভাবতে পারিনি। সেই একদিনের ভালবাসা একদিনেই শেষ হয়ে যাবে, এমন আমি কল্পনা করতে পারিনি।

আমি জানি আমার এই কাহিনীর পাঠকরা আমার প্রেমের এমন কাহিনী শুনে না হেসে পারবেন না। তারা বলবেন : যার জন্য এত প্রস্তুতি তার পরিণতি কিনা শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র চুম্বনে! আমি আমার পাঠকদের বিনীতভাবে বলব : এ মহাশয়গণ, একটু ভুল করছেন। আমার যে-প্রেম সেদিন একটি হাতের চুম্বনে শেষ হয়েছে সেই চুম্বনটি থেকে আমি যে আনন্দ লাভ করেছিলাম, আপনারা চুম্বন দিয়ে শুরু করে যা দিয়ে শেষ করেন তাতে আপনারা আমার আনন্দের ভগ্নাংশটুকুও লাভ করতে পারেন না!

AMARBOI.COM

[পরবর্তীতে রুশো নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সরকারের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন। তার নাম ছিল মশিয়ে সাইমন।]

সেই মশিয়ে সাইমনের কথা বলছিলাম। তিনি তার ক্ষমতাবোধে গর্ববোধ করতেন। তবু তার চেহারার একটু বর্ণনা না দিলে তার চরিত্রটিকে আপনারা ধরতে পারবেন না। তিনি উচ্চতায় খাটো ছিলেন। কিন্তু তা বলে মাত্র তিন ফুট নন। তাঁর পা দুটি শীর্ণকায় এবং সরু ছিল। সে দুটিকে যদি তার ৯০ ডিগ্রীর সমকোণ তৈরিকারী বিস্তারে বিস্তারিত না করে আর একটু ভেতরে আনা যেত তাহলে তিনি আর একটু দীর্ঘ বলেই দৃষ্ট হতেন। কিন্তু বেচারার কী দুর্ভাগ্য! তা সম্ভব ছিল না। তিনি দাঁড়ালে তার শীর্ণ সেই পা দু'টি বিস্তারে একটি জ্যামিতিক 'অবট্যন' বা সমকৌণিক ক্ষেত্রই তৈরি হতো। কম্পাসের দু'টি কাঁটার বিস্তারে যেমন তৈরি হয়। তার দেহটি কেবল যে ক্ষুদ্র ছিল তাই নয়। সেটি বর্ণনাতীতভাবে খর্বকায় ছিল। বস্ত্রবিহীন অবস্থায় তাকে নিশ্চয়ই একটি ফড়িং-এর মতো মনে হতো। তার মাথাটিতে কোনও অসাধারণত্ব ছিল না। সেটি বেশ সুগঠিতই ছিল। তার মুখটি সুন্দর ছিল, তার চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'টি আকর্ষণীয় ছিল। তবু মাথাটির দিকে চাইলে মনে হতো যেন একটি নাতিদীর্ঘ কাঠির ওপর বসানো মাথা নয়, একটি বস্তু। তার নিজের দেহটি আবৃত করতে পোশাকাদিতে তেমন কিছু তাকে খরচই করতে হতো না। তার লম্বা আলখাল্লাটিতেই তার দেহের আপাদমস্তক ঢাকা পড়ে যেত। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরটি আশ্চর্য ছিল। তার কণ্ঠ থেকে একটি নয় দুটি স্বর বেরিয়ে আসত। এবং উচ্চারিত হওয়ার পরে একটি জায়গাতে এসে দুটি স্বর যেন অভিন্ন হয়ে উঠত। তার এমন কণ্ঠস্বর শুনতে প্রথমে মজাই লাগত। কিন্তু একটু বিলম্বিত হলেই সেটি অসহনীয় বলে বোধ হতো। স্বরের একটি ছিল ভারী, গম্ভীর প্রকৃতির। অপরটি উচ্চ ধ্বনিশীল। আমি এখনও বলতে পারি যে সেই স্বরের একটি ছিল মস্তিষ্কের স্বর। অপরটি স্পষ্ট তীক্ষ্ণ দেহভেদী। এটি ছিল তার দেহের স্বর। তবে তিনি যখন চিন্তা করে কথা বলতেন এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাস তার নিয়ন্ত্রণে থাকত তখন তিনি ভালভাবেই কথা বলতে পারতেন। কিন্তু একটু উত্তেজিত হলেই এবং একটু উচ্চস্বরে শব্দ উচ্চারণের চেষ্টা করতেন তখন তার কণ্ঠ থেকে একটি যেন বাঁশির আওয়াজ বের হতো এবং তখন আবার সেই স্বরকে একটি স্থিরতায় আনতে তাকে বিষম বেগ পেতে হতো।

যথার্থই কোনও অতিরঞ্জন বাদে মশিয়ে সাইমনের আকার-আকৃতির যে বিবরণ আমি দিলাম তা সত্ত্বেও মশিয়ে সাইমন একজন ভদ্র এবং পদস্থ অমাত্য ছিলেন। তার বেশভূষায় তিনি সচেতন এবং ফিটফাট ছিলেন। তাতে কিছুটা আধিক্য থাকলেও তা কোনও অন্যায্য ব্যাপার ছিল না। তার নিজের গুণসম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন এবং তাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করতেন। একজন দর্শনার্থীকে তার শয্যায় শায়িত অবস্থাতেই দর্শন দিতেন। ফলে কারোর পক্ষে তার মাথাটি দেখে তার বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আন্দাজ করা আদৌ সম্ভব হতো না। ফলে কোনও কোনও সময়ে এতে অবাঞ্ছিত অবস্থারও সৃষ্টি হতো। এ্যানেসি পরিবারের সকলেই ব্যাপারটিকে বুঝতে পারতেন এবং তাদের স্মৃতিতে যে ব্যাপারটি এখন বিরাজ করছে, তাও আমি বিশ্বাস করি।

এক সকালে এমন হলো যে মশিয়ে সাইমন যখন তার শয্যায় একটি সুন্দর টুপি পরিহিত অবস্থায় দর্শন প্রার্থীদের দর্শনদানের জন্য অবস্থান করছিলেন তখন গ্রাম থেকে একজন দেশোয়ালী দরজায় এসে শব্দ করল। ঘরের দাসীটি তখন ঘরে ছিল না, বাইরে গিয়েছিল। দরজায় আবার শব্দ হতে মশিয়ে সাইমন চিৎকার করে উঠলেন : ভেতরে আসতে বলছি না? তার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত সে শব্দ এমন কর্কশ ছিল যে আগন্তুক মনে করল এ বুঝি ঘরের দাসীটির গলা। কিন্তু সে অবাক হচ্ছিল এই ভেবে কোনও মেয়েলোকের গলা কি এমন কর্কশ হতে পারে? লোকটি ভেতরে ঢুকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল যে মেয়েলোকটি শব্দ করল সে মেয়েলোকটি কোথায়? কিন্তু কোনও মেয়েলোককে না দেখতে পেয়ে সে নিজের সঙ্কোচ থেকে আঝর ঘরের বাইরে চেলে গেল। এতে মশিয়ে সাইমনের ক্রোধ আরও বেড়ে গেল এবং আগের চাইতেও কর্কশ কণ্ঠে তিনি হুকুমটি আবার উচ্চারণ করলেন : কী হলো? ভেতরে আস। গ্রাম থেকে আগত লোকটি বুঝল এই লোকটিই আসল লোক। সে এই লোকটির আচরণে যথার্থই রাগান্বিত হলো এবং সেও চিৎকার করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল : আসলেই তুই একটা বেশ্যা। মশিয়ে সাইমনের ক্রোধের সীমা রইল না। তার হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে টেবিলের ভারী ফুলদানিটা তার দিকে ছুঁড়ে মারতে যাচ্ছিল : এমন সময়ে তার ঘরে দাসীটি এসে ঘরে ঢুকল।

[মাদামসেল মারসিরেট ফ্রি ভোর্জে তাঁর পরিবারের নিকট ফিরে যাওয়ার ঠিক করলেন এবং তিনি রুশোকে তার নিজের পরিচর্যাকারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন।]

আমার এতগুলো মেয়েপ্রেমিক সম্পর্কে এমন বিস্তারিতভাবে কথা বলতে আমার সংকোচই হচ্ছে। তবে এসব প্রেমোপাখ্যান থেকে আমি যা লাভ করেছি তা নিয়ে গর্ব করছিনে। আর সে জন্যই সত্যই যা ঘটেছিল তাকে স্মরণ করতে আমার কোনও বাধা নেই। মারসারেত যে বয়সে একটু যুবতী ছিল সে জিরদের ন্যায় চালাক ছিল না। কিন্তু সে আমাকে তেমন অধিক প্রেম নিবেদনও করেনি। তবে ও যেরূপ নিখুঁতভাবে আমার গলার স্বর, কথার উচ্চারণ সব কিছু নকল করতে পারত, তাতে এখন আমার মনে হচ্ছে ওর প্রতি আমার আর একটু নজর দেয়া উচিত ছিল। আমার চরিত্রে একটা সংকোচ ছিল। তাই রাতে আমরা দু'জনে এক ঘরেই ঘুমাতে যেতাম। কিন্তু একটি বিশ বছরের আমার মতো যুবক আর আমার চাইতে একটু বড়, একজন ২৫ বছরের যুবতী এদের রাত যাপন কি ঘটনাবিহীন থাকে?
কিন্তু যখনকার কথা বলছি তখন কিন্তু ব্যাপারটা এমনিই ছিল। ঘটনাবিহীন। আমার সারল্য এমনিই ছিল যে, মারসারেত দেখতে শুনতে তেমন আকর্ষণীয় না হলেও, কোনও সময়ই আমি ওর প্রতি কোনও পুরুষত্বের ভাব দেখাইনি। সে ছিল আমাদের দু'জনের একটা ভ্রমণের ঘটনা। তবু দীর্ঘ যাত্রার সেই পথে আমার মনে দেহজ কোনও অনুভূতি আদৌ জাগ্রত হয়নি। আর যদি বা কখনও এমন কোনও অনুভূতির উদয়ও হতো, তবু আমি তো জানতাম না, কী দিয়ে কী করতে হয়। আমার নিজের কল্পনায়ও আসেনি একটি যুবক যদি একটি যুবতীর সঙ্গে দীর্ঘপথ পাড়িও দেয়, তবু আবার কল্পনায় এমন ভাব আমার কখনওই আসেনি যে তাহলে আমাদের দু'জনার কী করা আবশ্যক। এক সাথে দু'জনার শয্যা গ্রহণের কথাটা আমি ভাবতেই পারতাম না। আসলে আমার এখনও মনে হয় একটি যুবক-যুবতীর এমন অন্তরঙ্গের জন্য তাদের উভয়কে যুগ যুগ ধরে তৈরি হতে হয়। মারসারেতটা গরিবই ছিল। ও যদি আমার জন্য কিছু খরচ করত তখন যদি ও কোনও প্রতিদানের আশা করত, তখন তাকে আশাহতই হতে হতো। শেষ পর্যন্ত আমরা দু'জনেই ক্রাইবোরগ পৌঁছলাম : একেবারে যেমনভাবে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম, এ্যানেসি থেকে। ঠিক সেভাবেই।
জেনেভা পৌঁছার পর আমি কারও সঙ্গে দেখা করিনি। কিন্তু জেনেভা সেতু অতিক্রমকালে আমি যেন ভয়ানকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এই সুখি সুন্দর নগরটির প্রকারগুলো আমি কোনওদিন দেখিনি, বেদনায় বিদ্ধ না হয়ে কোনওদিন এর দ্বারগুলো পার হইনি। তখন আমি গভীর আবেগে অভিভূত হয়েছি। এই নগরীর মুক্ত দরোজায় দাঁড়িয়ে আমি এই নগরীর মহৎ স্বাধীনতার বোধ দ্বারা আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি : আহা সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং মানুষের একের প্রতি অপরের আচরণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌজন্যের দৃশ্যে আমার চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার অনুতাপ হয়েছে এই দেখে : হায়, আমি তো এসবই হারিয়েছি। আমার দুঃখ এ জন্য যে আমি ভেবেছি আমার হৃদয়ে অন্তর্গত এই সম্পদ তো আমি বহন করছি এবং তাতেই যেন আমার দর্শন ঘটে গেছে। না আমি দেখিনি, এই বোধটাই ছিল আমার ভ্রান্ত।

নিয়ন পার হয়ে আমাদের এগুতে হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে আমার পিতাকে না দেখে আমি এগুব? যদি আমি সত্যই এমনটা করতাম, তাহলে তা আমার মৃত্যুরও বাড়া হতো। আমি পান্থশালাতে মারসারেতকে রেখে, যা হয় হোক ভেবে আমি আমার পিতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন যে অবস্থা হলো তা একেবারেই অবর্ণনীয়। কী মূর্খ আমি ছিলাম। এই বাবার কাছে আসতে আমি ভয় পেয়েছিলাম! আমাকে দর্শন মাত্র তিনি তার বুকে রক্ষিত সমস্ত স্নেহের স্বর্গ আমার জন্য মুক্ত করে দিলেন। তিনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। আমরা দু'জন আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলাম। তিনি প্রথমে ভাবলেন আমি বোধ হয় তার বুকে সত্যই ফিরে এসেছি। আর তাকে ছেড়ে যাবো না। কিন্তু আমি তাকে আমার সব কাহিনীর কথা বললাম। আমার স্থির সিদ্ধান্তের কথাও তাকে জানালাম। তিনি আমার সিদ্ধান্তে বিস্মিত হলেন না। এর বিরুদ্ধে তার বাধা তেমন কিছু প্রবল ছিল না। তিনি অবশ্য আমাকে বললেন, এমন সিদ্ধান্তের মারাত্মক বিপদ কী হতে পারে। তবু তিনি আমাকে বাধা দিলেন না। বললেন ক্ষণিকের ভুলও পরিণামে মহৎ বলে দৃষ্ট হতে পারে। আর তাই আমাকে জোর করে আটকে রাখার বিন্দুমাত্র চেষ্টা তিনি করলেন না। এখন সে স্মৃতিতে আমি মনে করছি, তার বোধটিই সঠিক ছিল। আবার একথাও ঠিক যে আমাকে আমার পথ থেকে ফেরাবার যে চেষ্টা তিনি করতে পারতেন। তা তিনি করেননি। আমি জানিনে তিনি একথা ভেবেছিলেন কিনা, আমি যে রাস্তায় নেমেছি তা থেকে আমার যথার্থই ফেরা উচিত কিনা। অথবা আমার সেই বয়সে আমাকে নিয়ে তিনি কী করবেন তা তিনি যথার্থই বুঝতে পারছিলেন না। তবে আমার মনে হচ্ছে আমার পথের সঙ্গী সম্পর্কে যে ধারণা তিনি তৈরি করেছিলেন, তা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হলেও, সে ধারণা তাঁর ভুল ছিল।...

কোনও দুর্ঘটনা বাদেই আমরা ফ্রিবুর্গ পৌঁছে গেলাম। এই ভ্রমণের শেষের দিকে আমার প্রতি আমার সঙ্গিনীর প্রীতি প্রকাশে কিছুটা ভাটা পড়ল। এখানে পৌঁছার পর আমার প্রতি আচরণ, বলা চলে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তার বাবাও যে টাকায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল, এমন নয়। এবং আমার প্রতিও তার আচরণে তেমন কোনও সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেনি। রাতে ঘুমাবার জন্য আমি একটা সরাইতে গেলাম। পরের দিন তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গেলো তারা আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজেরও আমন্ত্রণ জানাল। আমন্ত্রণটি আমি গ্রহণ করলাম। তারপরেই আমরা শুকনো চোখেই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিকেলে আমার পরিচিত শারাবের দোকানটাতে গেলাম এবং এখানে পৌঁছার দু'দিনের মাথায় আমার গন্তব্য কোথায় তা না জেনেই আমি অজানার উদ্দেশ্যে জায়গাটা পরিত্যাগ করলাম।

আবার এই সময়েই আমার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যার ফলে আমি যেন যা চাচ্ছিলাম ভাগ্য আমাকে তাই দিয়ে দিল। আমি সুখের মুখ দেখতে পেলাম। মারসারেত মেয়েটা বেশ ভাল মেয়েই ছিল। খুব যে সুন্দরী তা অবশ্য নয়। ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছ থেকে উত্তেজনা পাওয়ার মতো কিছু ছিল না। ওর আচরণ মাঝে মাঝে খারাপ হতে লাগল। দু'জনের মধ্যে রাগারাগির প্রকাশ ঘটত : কান্নাকাটিরও ব্যাপার ঘটত। তবে এর বেশি মারাত্মক কিছু নয়। এদিক থেকে বলতে হয় মেয়েটার বুদ্ধি ছিল। আমার প্রতি ওর একটা আকর্ষণও ছিল। আমি চাইলে ওকে বিয়ে করে ওর বাবার ব্যবসাতে যোগ দিতেও পারতাম। সঙ্গীতের প্রতি আমার আকর্ষণ আমার জীবনটাকে সুখি করেই তুলত। ফ্রিবুর্গ একটা ছোট শহর ছিল। তেমন সুন্দর নয়। কিন্তু শহরের লোকজন বেশ সরল স্বভাবের ছিল। আনন্দফূর্তির জায়গা তেমন ছিল না। তবু সেখানে থাকলে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত আমি শান্তিতেই কাটাতে পারতাম।

আর এমন ক্ষেত্রে কী সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার তা আমার চাইতে ভাল আর কে জানত। তবু আমার মনের প্রশ্ন যে আমি আমার কৈশোরে এমন সব সুন্দর মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, সে কেন তার উত্তর জীবনে মহৎ মানুষের এমন অভাবের মধ্যে পড়লাম? তাহলে কি উত্তম মানুষ জাতিগতভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল? না, কথাটা তা নয়। আসলে এখন আমার জীবন যে শ্রেণীটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল, সে আমার কৈশোরের সেই শ্রেণী নয়। উচ্চতর যে শ্রেণীর সঙ্গে আমার কৈশোরের সেই যোগ ঘটল তাদের মধ্যে আবেগ আর মায়া-মমতার প্রকাশ কালে-ভদ্রেই মাত্র ঘটে। নিম্নতর শ্রেণীর মানুষের মায়াই আসল মায়া। উচ্চতর শ্রেণীর মুখোশধারী মানুষের মধ্যে তার প্রকাশ একেবারেই দুর্লভ। এখানে কেবলই স্বার্থ, অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্যের প্রকাশ। ...

এবার আমি এক সঙ্গীত শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম। অথচ সঙ্গীতের রাগ-রাগিনীর আমি কিছুই জানিনে। যে মাইতারের সঙ্গে আমি যে ছ'টা মাস কাটিয়েছিলাম তার অভিজ্ঞতাও এ ব্যাপারে আমার খুব উপকারে আসেনি। তাছাড়া আমি যে শিক্ষকের কাছ থেকে সঙ্গীত শিখেছিলাম সে আমাকে প্রায় সঙ্গীতের মূর্খতেই পর্যবসিত করে দিয়েছিল। সে ছিল জেনেভা থেকে আগত এক প্যারিসীয় এবং বিশ্বাসে একটা প্রটেস্ট্যান্ট দেশে এক ক্যাথলিক। আমি নিজের কথা বলছি। আমি ভাবলাম, এবার আমার নিজস্ব বলতে যা বুঝায়, তার সবই আমাকে পরিবর্তন করতে হবে। আমার নামকে বদলাতে হবে। আমার ধর্মীয় বিশ্বাসকে এবং আমার দেশকে পরিত্যাগ করতে হবে। আমার যেটি আদর্শ ব্যক্তি ছিল, আমি তাকে যথাসাধ্য অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। তার নাম বলতে পারি ডেনচার। সে গান বাঁধতে জানত, একথা ঠিক। তবে একথা সে আমাকে কখনো বলেনি। আর আমি গানের কিছুই না জেনে নিজেকে এক সঙ্গীত বিশারদ বলে চালাতে শুরু করলাম।

[রুশো এবার একটি যাত্রাদলের জন্য গান বাঁধতে শুরু করল।]

দলটি একটা জায়গায় আমার বাঁধা গানের প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিল। আমি কোরাস দলের প্রত্যেককে বলতে লাগলাম, কোথায় কী রাগের ওঠা-নামা করতে হবে। ড্রামগুলোর বাদন কেমন হবে। রিহার্সাল হলো। আহা মূর্খ রুশোর কী করুণ অবস্থা। কপালে আমার ঘাম জমছে। দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠছে : একি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাগলামী, পাগলের গান : অসহ্য! আহা বেচারি রুশো : কেবল তুমি যদি জানতে একদিন এই রুশোই ফ্রান্সের সম্রাটের রাজ দরবারে সঙ্গীত পেশ করবে এবং দরবারের নামীদামি সবাই তাকে বাহবা দানে ফেটে পড়বে। চারপাশে উপবিষ্ট সুন্দরীগণ রুশোর সঙ্গীতের দক্ষতায় একেবারে বিমোহিত হয়ে বলবে : আহা কী মহৎ সঙ্গীত। কী রাগ, কী রাগিনী! একেবারে মর্মের ভেতরে প্রবেশ করে যায়। কী অদ্ভুত!

কিন্তু যেটা সকলকে আমোদিত করে তুলল সে হচ্ছে 'মিনুরেটের' কার্য। কয়েকটি রাগ বাজাতেই আমি চারপাশে হাসির হল্লা শুনতে লাগলাম। সবাই আমার অভিনন্দনে কেটে পড়ল। আমার সুরের জ্ঞানের গভীরতায় তারা একেবারে বিমোহিত হয়ে গেল। তারা সবাই চলতে লাগল 'সিনুয়েটে' আমার এই দক্ষতা আমাকে খ্যাতির চূড়ায় অবশ্যই নিয়ে যাবে। আমার গানের পালা সবখানেই অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার বলে তারা সবাই উচ্চৈস্বরে মত প্রকাশ করতে লাগল। এ সম্পর্কে আর বেশি না বলাই ভাল। আমার মনে দু:খেরও শেষ ছিল না। আর এটাই যে আমার প্রাপ্য তাকে বুঝতেও আমার কোন অসুবিধা হয়নি।

[সঙ্গীত শিক্ষাদানের এমন প্রচেষ্টায় রুশোর জীবনে নেমে এল এক চরম দুরবস্থা।]

রুশোর যে অভিজাত মাদামের আশ্রয়ে থাকার সময়ে তাঁকে মামা বলে সম্বোধন করত, তাঁকে সে জীবনে আর বিস্মৃত হতে পারেনি।

হ্যাঁ, একথা ঠিক যে বেশ ক'দিন যাবৎ আমি আমার মনের স্মৃতিতেও মামার কথা উচ্চারণ করিনি। তবু একথা ঠিক নয় যে, আমি তাঁকে বিস্মৃত হয়ে গেছি। না, আমি তাঁকে কখনও বিস্মৃত হইনি। আমার সর্বক্ষণের কামনা আহা, আমি যদি আবার তার কাছে ফিরে যেতে পারতাম! তাঁর কাছে আমার প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা আমার অস্তিত্বরক্ষার কারণে নয়। তা আমার অন্তরের তৃষ্ণার কারণে। আমি তাঁর মমতার কাছে চিরবন্দি। কিন্তু সে বন্দিত্ব আমার এমন নয় যে তা আমাকে আমার জীবনে অপর কাউকে ভালবাসা থেকে নিবৃত্ত রেখেছে। কিন্তু অপরকে ভালবাসা আর আমার সেই মামাকে ভালবাসা এক কথা নয়। হ্যাঁ, অপর কাউকে ভালবেসেছি তাদের আপন আপন সৌন্দর্যের কারণে। আর তাই এমন সুন্দরীদের বিদায়ে আমার কোনও বেদনা ছিল না। কিন্তু মামার প্রতি আমার ভালবাসা কেবল তার সৌন্দর্যের কারণে নয়। তিনি বৃদ্ধ হতেন এবং অসুন্দরও হতেন তবু আমি আমার সেই কৈশোরের ভালবাসা দিয়ে জীবনভর ভালবাসতাম। তিনি আমার কৃতজ্ঞতার উৎস তা আমি জানি। তবু তিনি আমার জন্য যাই-ই করে থাকুন বা না থাকুন, তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটত না। আমি তাঁকে ভালবেসেছি কোন স্বার্থ বা কর্তব্যবোধ থেকে নয়। আমি তাঁকে ভালবেসেছি, কারণ এই আমার যে আমার জন্মই ঘটেছে তাঁকে ভালবাসার জন্য। অন্য কোনও মেয়েকে যখন আমি ভালবেসেছি তখন আমার আকর্ষণের কেন্দ্র থেকে তিনি হয়ত ক্ষণিকের জন্য সরে গেছেন। তবু আবার যখন আমার চিন্তায় মনে ফিরে এসেছেন তখন আমিও তাঁর ভালবাসায় অবগাহন করেছি। আমিও প্রত্যাবর্তন করেছি তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালবাসার প্রতিমূর্তির কাছে। এবং তাতেই আমার ঘটেছে জীবনের যথার্থ সুখ। তাই তাঁর অস্তিত্ব থেকে আমার জীবনে কখনও বিচ্ছেদ ঘটেনি।

[এর পরবর্তীতে আমরা দেখি, রুশোর 'ভেভে' নামের ক্যান্টনে চারদিনের পদযাত্রার শেষে এসে পৌঁছেছে।]

যখনি আমি এই ক্যান্টন ভেভের কথা স্মরণ করি তখনি আমি যেমন মাদার ওয়ারেনসকে স্মরণ করি। কারণ তাঁর জন্মও এখানে, তেমনি আমি স্মরণ করি আমার পিতাকে। তিনিও তো এক সময় এখানে ছিলেন। আমি স্মরণ করি মাদামসেল দা ভালসনকে। আমার কৈশোরের অন্যতম পাত্রী ছিলেন মাদামসেল দা ভালসন। ভেভে ক্যান্টনের স্মৃতি নানা কারণে আমার মনে স্থায়ী দাগ কেটে রেখেছে। তার কোনওটি থেকে অন্য কোনওটিকে আজ আমি বিচ্ছিন্ন করতে পারিনে। সেই বিগত মুখ আর শান্তিময় জীবনের কথা ভাবি তখন আমি আর নিজেকে স্মৃতির টানে সেই ক্যান্টন ভেভেতে প্রত্যাবর্তনের আকর্ষণকে রোধ করতে পারিনে। চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে অপার সুন্দর সেই হ্রদটি আমার স্মৃতির পুকুরে ভেসে ওঠে। আর এই হ্রদের পাড়ে যদি আমার একটি বাগান থাকত। এবং সেখানে যদি আমার একটি ভালবাসার পাত্র থাকত, একজন বন্ধু থাকত। আর আমার যদি একটি বউ থাকত। এবং একটি গরু এবং হ্রদের জলে ভেসে বেড়াবার জন্য একটি ছোট নৌকো থাকত!

আর যথার্থই কতবার যে আমি স্থানটিতে এসেছি : কেবল আমার কল্পনার সেই জীবনটিকে বাস্তবে অস্তিত্বময় হিসেবে দেখতে। পুরো সুখ কাকে বলে আমি জানিনে। তবু যতদিন না আমি তাকে পাব ততদিন এই স্থানটিতে বারংবার আমাবে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে। এখানে এলেই এই জনপদের মানুষদের, বিশেষ করে এখানকার মেয়েদের আচরণে বিস্ময় বোধ না করে আমি পারিনি। না, প্রকৃতির দৃশ্য আর তাদের আচরণে অভিন্নতা ছিল না। আর তাই তারা উভয়েই যেন আমার কাছে বিপরীত অস্তিত্ব বলে বোধ হয়েছে। এর পরিবেশ এবং এর মানুষ : এরা উভয়ই যেন পরস্পরের প্রতিরোধী এক অস্তিত্ব।

এবার যখন ভেভেতে এলাম তখন হ্রদের পাড়ে বেদনার্ত মনে পদচারণা করতে করতে আবার আমি ফিরে গেলাম আমার সেই আনন্দ আর বেদনার স্মৃতিতে। মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে ভেসে উঠতে লাগল সহস্র আনন্দের স্মৃতিময় নিষ্পাপ ঘটনা। আমার চোখে জল জমে উঠল। আমি শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কতবার যে আমার স্বপ্নে, স্মৃতিতে এই স্থানটিতে বারবার এসেছি। এরই তীরে একটি পাথর খণ্ডের উপর উপবিষ্ট হয়েছি আর আমার স্মৃতির আনন্দের জলের ফোটাকে এই হ্রদের বুকে আমি পড়তে দেখেছি!

ভেভেতে আমি অবস্থান করেছিলাম 'লা ক্লেকে'। যে দু'দিন আমি এখানে ছিলাম, সেদিন আমার সঙ্গে কারুর সাক্ষাৎ ঘটেনি। কিন্তু আমি এই শহরটির প্রতি আমার একটা মায়া জন্মে যায়। এর কথা আমি আর জীবনে বিস্মৃত হতে পারিনি। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমান্সের সকল নায়ক-নায়িকার তাই অবস্থান ঘটেছে এই শহরেই। আমি তাই এখনও বলব। যার একটু রুচিবোধ আছে, যার একটু আবেগ আছে, যাও ভেভেতে যাও, ভেভেকে ভালবাস, তাকে আবিষ্কার কর, তার দৃশ্য দিয়ে তোমার মনকে ভরে তোল, তার হ্রদের বুকে নৌবিহারে বিহার কর। তার পরে আমাকে বল প্রকৃতি কি ভেভেকে একজন জুলি, একজন ফ্রেয়ার এবং সেইন্ট প্রুকস-এর জন্যই তৈরি করেনি? তাই বলে এদেরকে তুমি ভেভেতে চাইলেই চোখের সামনে দেখতে পাবে, এমন কথা আমিও বলিনে। তবু আমার স্বপ্নের আর কামনার আবাসভূমিই হচ্ছে এই ভেভে।

সঙ্গীত আমি রপ্ত করেছি। যত না সচেতনভাবে তার অধিক চেতনার বাইরে, একটা স্বতস্ফূর্ততায়।

এই পর্যায়ে আমার নিজের জীবন মোটামুটি বহনযোগ্য ছিল। বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তির পক্ষে এর চাইতে অধিক চাওয়ার কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু আমার অস্থিরচিত্র হৃদয়ে যেন আরও কোনও কিছুর আকুতিতে পূর্ণ ছিল। রবি কিংবা অপর কোনও বারে আমি যত্রতত্র ঘুরে বেরিয়েছি। বনের গভীরে গমন করেছি। কেবল ঘুরেছি। নিজে গুঞ্জন করেছি। দীর্ঘশ্বাসে আমার হৃদয় ভরে উঠেছে। এমনি করে সূর্য ডুবে রাত নেমেছে। একদিনের সেই বোদ্রির ব্যাপারটা মনে পড়ছে। আমি সেদিন সরাইখানায় ভোজনে বসেছিলাম আমার নজরে পড়ল সামনে রয়েছেন গ্রীক রীতিতে একটি দীর্ঘ কোট পরিহিত, শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত এক পুরুষ। তার উচ্চারিত কথা প্রায় দুর্বোধ্য থাকত। কারণ তার উচ্চারণ এবং শব্দগুচ্ছের মধ্যে একটি বৈদেশিকতার ভাবছিল। তার ভাষাকে মাঝে মাঝে মনে হতো ল্যাটিন তথা ইতালীয় বলে। তবুও আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে তার কথা কিছুটা বুঝতে পারতাম। কেবল তাই না, শব্দ ছাড়া আকারে ইঙ্গিতে সে যা বলত চাইত তার অর্থ বুঝতে আমার কোনও অসুবিধা হতো না। এই আকার-ইঙ্গিতেই সে ভূ-স্বামী এবং দেশীয় সাধারণের সঙ্গে তার ভাব বিনিময় করত। একবার আমি তাকে ইতালীয় ভাষায় কিছু বললাম। দেখলাম, কথাটি সে বেশ ধরতে পেরেছে। আমার কথা শুনে সে এগিয়ে এসে আমাকে আনন্দের সঙ্গে আলিঙ্গন করল। আমাদের মধ্যে অচিরে একটা পরিচয়ের বন্ধন সৃষ্টি হলো। তখন থেকে আমি তার আলাপের ব্যাখ্যাতা হয়ে দাঁড়ালাম। আমার আহার যেখানে সাধারণ প্রকারের ছিল, তার ভোজন সেখানে বেশ সমৃদ্ধ ধরনেরই ছিল। অনেক সময়ে সে আমাকে তার টেবিলে খাওয়ার জন্য ডেকে নিত। আমি নি:সঙ্কোচে তার টেবিলে গিয়ে আসন নিতাম। সারাব পান আর গাল-গল্পে আমরা দু'জনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। খাওয়া শেষে আমরা যেন অচ্ছেদ্য এক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম। তার কথায় বুঝলাম সে একজন গ্রীক যাজক এবং সন্ন্যাসী। সে এসেছে জেরুসালেম থেকে। ইউরোপে সে এসেছে জেরুসালেমের একটি সমাধি তৈরির জন্য অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে। সে বেশ কিছু সুন্দর নকশাকেও দেখাল। এগুলো নাকি রুশ সম্রাজ্ঞীর নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও অন্য দেশ থেকে প্রাপ্ত অনেক মূল্যবান দ্রব্যও তার নিকটে আছে বলে সে আমাকে বলল। কিন্তু সে বলল, এ কাজে তার বড় অসুবিধা হচ্ছে— তার ভাষার অসুবিধা। সে জার্মান ভাষার একটা শব্দও জানে না। ল্যাটিন বা ফরাসিও জানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। কেবল জানে গ্রীক। কিছুটা তার্কিশ। যা একটু সাধারণ ভাষা বা লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা সে জানে তাতে তার সুবিধা হচ্ছে না। সে বলল, আমি তার সঙ্গী হয়ে তার অনুবাদক এবং ব্যাখ্যাতা হিসেবে কাজ করলে, সে খুব খুশি হবে। আমার পোশাক-পরিচ্ছদ তখনও একেবারে সাধারণ। একটা হলুদ বর্ণের কোর্ট আমি জোগাড় করেছিলাম। তাতে অবশ্য তার সেক্রেটারিগিরি করতে আমার তেমন অসুবিধা হবার কথা নয়। লোকটি দেখল, আমি সরল বোকা জাতীয় একটি বালক। তাই আমাকে ব্যবহার করতে তার তেমন অসুবিধা হবে না। আমি বলব, তার এ বোধটি ঠিকই ছিল। এ নিয়ে আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা রফাই হয়ে গেল। আমি নিজের থেকে অনেক কিছু চাইলাম না। কিন্তু নিজ থেকেই আমাকে অনেক কিছু দেবার কথাই বলল। কোনও নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা বাদেই আমি নিজেকে তার হাতে ধরা দিলাম। আর তারপর দিনই আমরা দু'জন জেরুসালেমের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। ব্যাপারটা এমন ত্বরিত গতিতেই ঘটেছিল।

[ব্যাপারটা এখানে একটু সহজ করে বলা যায় যে সেই গ্রীক পাদ্রীর সঙ্গে কিছু অর্থসংগ্রহের বেপরোয়া চেষ্টায় ফরাসি দূতাবাসের কর্তৃপক্ষ তাদের দু'জনকে ধরে ফেলে গ্রেপ্তার করল। রুশো অবশ্য ফরাসি রাষ্ট্রদূতের হস্তক্ষেপে মুক্তি পেল। এবং সে তাকে প্যারিসে পাঠিয়ে দিল। সেখানে সে মশিয়ে গো দারদের ভাগ্নের সঙ্গী হওয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত হলো।]

পথে গাড়িতে যদি কেউ আমাকে একটা বসার আসন দিতে চাইত বা রাস্তায় কোনও সম্বোধন করত আমি মহারাজার মতো ঘাড় নাকাতাম। আমি নিজের মনে নিজেকে সাহসী বোধ করতে লাগলাম। ভাবটা এমন দাঁড়াল : দেখা যাক, ভাগ্য আমার কোথায় টেনে নেয়। আমার ভাবটাই দাঁড়াল যুদ্ধংদেহী। আমি বুঝলাম, এক সামরিক অফিসারের সঙ্গে আমি যুক্ত হতে যাচ্ছি এবং আমি নিজেই একজন বড় সৈনিক হয়ে দাঁড়াব। কারণ আমার পৃষ্ঠপোষক এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে আমি গোড়াতেই ক্যাডেট হতে পারি। আমি যেন নিজেকে সামরিক এক অফিসারের পোশাকে ভূষিত দেখলাম। আমার এমন চিন্তায় আমার নিজের বুক উদ্বেল হয়ে উঠল। আমি একটু জ্যামিতিতে দক্ষ ছিলাম। আমার একজন ইঞ্জিনিয়ার আত্মীয় ছিলেন। আর আমার মনে হলো আমি সামরিক কিছু হবার জন্যই জন্ম নিয়েছি। আমার একটু অসুবিধা ছিল আমার চোখের দৃষ্টির সমস্যা। তবে এ নিয়ে আমার খুব উদ্বেগ হলো না। আমি শুনেছি এক মার্শাল শেমবার্গ চোখে তেমন দেখতে পেতেন না। তাই যদি হয়, তাহলে একজন মার্শাল রুশোরই বা দৃষ্টিশক্তির একটু অসুবিধাতে কী আসবে যাবে। হ্যাঁ, আমি মূর্খ রুশো তো বটেই। তাই আমার চারদিক নিজেকে সর্বক্ষণ সেনা পরিবেষ্টিত বলে ভাবতে লাগলাম। আমি চার দিকে কামান আর যুদ্ধের সব দৃশ্য দেখতে লাগলাম। যেন কামানের গোলা ছুটে যাচ্ছে। চারদিক ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আমি দেখলাম দুরবীণ হাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু একটু অগ্রসর হতে যেন আমি পাহাড়ি ঝর্নার দেখা পেলাম, একটি মনোহর দৃশ্যের সাক্ষাৎ পেলাম, অমনি আমার বুকে সামরিক পোশাকের বদলে প্রকৃতির সৌন্দর্যের ডাকের শব্দ বেজে উঠল। আমি বুঝলাম কামানের গর্জন শোনার জন্য আমার জন্ম হয়নি। আর আমি যেন আমার চারদিক মেষ চারণের মাঠে আমার প্রিয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেষপালকে দেখতে পেলাম। আর মুহূর্তে আমার সমর অধিনায়কের স্বপ্ন-বিলাসিতা কোথায় যে শূন্যে মিলিয়ে গেল।
আহা আমার প্যারি বা প্যারিস! তার দুর্গ দিয়ে আমি রুশো অবশেষে প্রবেশ করলাম। কিন্তু হাহতোস্মি!
কী আমার ভাগ্য! এই কি আমার স্বপ্নের প্যারিস! তুরিনের সেই বাহার আর প্যারিসের এই দুর্গন্ধভরা বস্তি! তুরিনের রাস্তার কী সৌন্দর্য, লম্বা লাইন বাঁধা সড়ক, সড়কের পাশে সৌন্দর্যময় গৃহসমূহ। তাই দেখে দেখে ভেবেছিলাম প্যারিস হবে তুরিনের চাইতেও বাহারী, সুন্দর। আমাকে উদ্বুদ্ধ করে দেবে আমার স্বপ্নের প্যারি। কিন্তু একি আমি দেখলাম। কোথায় আমার কল্পনার প্যারিস, বৃহৎ আকাশছোঁয়া প্যারিস, সৌন্দর্যের রানী। সুন্দর বাদে যার কুৎসিত হওয়ার উপায় নেই। সুন্দর হবে তার সড়ক। মার্বেল পাথরে বাঁধাই করা। স্বর্ণের মন্দিরবৎ গৃহরাজি!

সেন্ট মার্সের শহরতলী দিয়ে এই প্যারিসে ঢুকে যেন আমি অদৃষ্ট পাতালের এক নরকের মধ্যে আমার প্রবেশ দেখলাম। দুর্গন্ধে ভরা ক্ষুদে সব গলি। ক্লান্তদেহী বিব্রস্ত সব মানুষ। হাঁটছে না যেন ঝিমুচ্ছে? দারিদ্র্যের শেষ নেই। ভিখারির দল তোমার পথ আগলাচ্ছে। ঠেলাগাড়িগুলো যত্রতত্র পড়ে আছে। পুরনো কাপড়ের হকারগুলো হাঁক ছাড়ছে! ধেনো মদের সরাই। পুরনো হ্যাট মাথায় সড়কভর্তি মানুষ!
আহা! এই আমার প্যারি প্রবেশ! শুরুতেই এমন! এই শুরুটাই আমাকে শেষ করেছে? যা কিছু মহৎ আমি আবিষ্কার করেছি প্যারিসে, আমার পরবর্তী জীবনে তার কোনও কিছুই আমার প্যারিস প্রবেশের এই দৃশ্য থেকে আমাকে মুক্তি দিতে পারেনি। আমি বলব এরপরে যতটা কাল আমি প্যারিসে কাটিয়েছি তার সবটাই যেন আমি ব্যয় করেছি সেই প্রথম দিনের দু:সহ দৃশ্যের স্মৃতির থেকে মুক্তির অন্বেষণে!
আসলে অবাস্তব স্বাপ্নিকের কপালে শেষকালে এটাই জোটে! প্যারির আমি এত স্তুতি, এত প্রশংসা শুনেছি যে আমার মনে হয়েছে যেন আমি প্রাচীন ব্যাবিলনকে সাক্ষাৎ দেখতে পাব। সেই ব্যাবিলনের স্বপ্নময় দৃশ্য থেকে আমি আহরণ করতে পারব আমার জীবনের বিস্ময় আর আনন্দকে। এই একই অভিজ্ঞতা ঘটেছে আমার প্যারিতে। পৌঁছার দিনই আমি প্যারির একটা অপেরাতে গেলাম। পরবর্তী সময়ে ভারসাইতেও আমার একই অভিজ্ঞতা ঘটেছে। তারপরে আমার যখন সমুদ্র দর্শন ঘটলো তার স্মৃতিও মনের মুকুরে স্থির হয়ে আছে। আসলে যার সম্পর্কে তুমি প্রথমে খুব শোন, পরিণামে তাতে তোমার পরিতাপের ব্যাপার ঘটবেই। আমার কল্পনার যে বিস্তার তাকে অতিক্রম করার সাধ্য না আছে প্রকৃতির, না কোনও মানুষের।

[এ কথা বলা আবশ্যক, প্যারিতে রুশোর খুব ভাল সংবর্ধনা ঘটেনি। প্যারিসে এসে রুশো যখন শুনলো যে মাদাম দা ওয়ারেনস সুইজারল্যান্ড ফিরে গেছেন, তখনি রুশো আবার মাদাম দ্য ওয়ারেনস-এর অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে। এপথেও প্রকৃতির দৃশ্য তাকে মোহিত করে তোলে। তার কল্পনারও আর সীমা থাকে না।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিনের ঘটনার কথা বলি। একটা জায়গা দূর থেকে দেখতে আমার খুব মনোহর লাগলো। জায়গাটি দেখে আমার এত ভাল লাগলো যে জায়গাটিকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে আমি কেবল ঘুরতে লাগলাম। এমনিভাবে চক্কর দিতে দিতে আমি যেন নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেললাম। তারপরে কয়েকটা ঘন্টা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় আমি প্রায় মরে যাচ্ছিলাম। তখন কাছেই একটি কৃষকের ঘর পেলাম। আমি তাতে ঢুকে পড়লাম। তার ভেতরে যে দেখার কিছু ছিল, এমন নয়। কিন্তু আশপাশে আর ঘর পাচ্ছিলাম না। আমার মনে হলো জেনেভা বা সুইজারল্যান্ডে একটু সচ্ছল মানুষ যেখানে অতিথিপরায়ণ, এই প্যারিসেও আমি তেমন মানুষের সাক্ষাৎ পাব। যে ঘরে আমি ঢুকলাম তার মধ্যে যে লোকটির আমি সাক্ষাৎ পেলাম তার কাছে কিছু খাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালাম। বললাম, কিছু যদি ফ্রাংকের দরকার হয়, তাও আমি তাকে দিতে পারব। সে অবশ্য আমাকে কিছু দিল। দইটানা দুধ এবং মোটা বার্লির একটা রুটি। এই দিয়ে সে বলল, তার ঘরে আর কিছু নেই। আমার তাতে দুঃখ হলো না। দুধটুকু দিয়ে আমি বার্লির রুটিটা তার খোসাশুদ্ধই খেয়ে ফেললাম। তবে আমি যেভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাতে আমার ক্ষুধা মিটলো না। ঘরের কৃষকটি দু'চোখ ভরে আমার খাওয়া দেখছিল। আমার খাওয়ার মধ্যেই যেন সে আমার কাহিনীর সত্যাসত্যকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করছিল। আর দেখলাম পরমুহূর্তেই লোকটির মুখ খুশিতে ভরে উঠলো এবং বলেই ফেলল, না, বাছা, তোমার দুঃখ আমি বুঝি। তুমি নিশ্চয়ই ভাল ঘরের একটি সন্তান। তুমি অন্যের কাছে টাকার লোভে আসোনি, একথা আমি জানি। এই বলে সে রান্নাঘরের একটা দুয়ার খুলে নিচে নেমে গিয়ে একটু পরে সুন্দর একটি গমের রুটি আমার জন্য নিয়ে এল। অল্প হলেও একটু মাংসও এনে দিল। সাথে একটু পনিরও। এমন দৃশ্যে আমার মনের উৎফুল্লতার আর সীমা রইল না। শুধু তাই নয় এবার সে আমার জন্য একটি অমলেটও নিয়ে এল।

এসব দিয়ে আমি আহার শেষ করলাম। কোনও পথের ভিখারির ভাগ্যে এমন আহার জোটার কথা নয়। এরপরে যখন এমন আপ্যায়নের দাম দেয়ার কথা উঠলো তার মধ্যে আমি যেন একটা ভয়ের লক্ষণ টের পেলাম। সে আমার দেয়া কোনও ফ্রাংকই নিতে অস্বীকার করল। সে যেমন কোনও অর্থ নিতে অস্বীকার করল, তেমনি তার মধ্যে আমি একটা উদ্বেগকেও লক্ষ করলাম। শেষে সে যেন আমার কাছ থেকে কোনও কিছু গ্রহণ করতে একটা ভীতি বোধ করছে। তারপরে হঠাৎ বলে উঠল : বাবা, তুমি ট্যাক্স অফিসার! দেখ বাবা, আমার কিছু নেই। এই মদটুকু আমি অফিসারদের ভয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম। রুটিও যা রেখেছিলাম, তাও তোমার মতো অফিসারের ভয়ে। তার অবস্থা বা চরিত্রের এই দিকটা একেবারেই আমি কল্পনা করতে পারিনি। জীবনে এই ঘটনার কথাটা আমি কখনও ভুলতে পারিনি। সেদিনই আমি বুঝলাম মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার কাকে বলে। মানুষের অত্যাচারের ভয়ে মানুষ কোন্ পর্যায়ে যেতে পারে। এই চাষীটি নিজের রাখা রুটির টুকরা খেতে পারল না, পাছে কখন্ কোন অফিসার এসে হাজির হয় আর চীৎকার করে ওঠে : দে আমার খাবার দে। কোনও অত্যাচারী অফিসারকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবৃত্ত করার তার আর কী উপায় ছিল তার দারিদ্র্যের প্রদর্শন বাদে। আমি তার ঘর থেকে ভারী মন নিয়ে বেরিয়ে এলাম। এবার এই জায়গার চারিপাশের সুন্দর দৃশ্য আমার কাছে বিষময় মনে হলো। প্রকৃতি যেন এমন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে এই অসহায় চাষীকুলকে অত্যাচারী ট্যাক্স তহসিলদারের চরম নির্যাতনের উপায়হীন শিকারে পরিণত করার জন্য।

[লিয়নসে রুশোর অবস্থা হয়ে দাঁড়াল একেবারে কপর্দকহীন।]

এক সন্ধ্যায় বেলেকোরে বসে ভাবছিলাম এখন কি করি। এমন সময় দেখলাম মাথায় টুপি পরা একটি লোক আমার পাশে এসে বসল। তাকে মনে হলো যেন সে সিল্ক পোশাকের কোনও ব্যবসায়ী। এদেরকে এ অঞ্চলে বলা হয় 'চটফেকটাটিয়ের।' সে আমাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। আমি তার প্রশ্নের স্বাভাবিক জবাব দিলাম। প্রায় পনের মিনিট এভাবে কাটল। হঠাৎ সে বলল : এসো, আমরা একটু ফুর্তি করি। কী ধরনের ফুর্তি জিজ্ঞেস করতে না করতে সে দস্তুর মতো দেখাতে লাগল ফুর্তি করা কাকে বলে। আমরা দু'জনে প্রায় এক দেহতে পরিণত হয়ে গেলাম। সন্ধ্যায় অন্ধকার তখনও লাগেনি। আর এ দৃশ্য কারোর চোখের আড়ালে পড়ারও উপায় ছিল না। লোকটি যে আমার ওপর বলাৎকার করতে চাচ্ছে এমনও মনে হলো না। আর জায়গাটাও এমন নয় যে ব্যাপারটা ও লোকচক্ষুর আড়ালে করতে পারে। মনে হল লোকটা বরং চাচ্ছে ও ওর অঙ্গাদি নিয়ে যা করছে, আমিও যেন তা করি। লোকটার মনে হলো ব্যাপারটা কিছুই না। ও নিজের অঙ্গ নিয়ে যা করবে, আমিই বা তা নিয়ে কেন করব না, এটা যেন লোকটা বুঝতে পারছিল না। এমন অবস্থায় আমার ভয় ধরে গেল। আমি ওর কাছ থেকে উল্টা দিকে ছুটতে লাগলাম। আমি পেছন ফিরে তাকালাম না। তবু মনে হলো লোকটা যেন আমার পেছনে ছুটে আসছে। আমি এমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে আমার নিজের বাসার দিকে না ছুটে তার বিপরীতে জাহাজঘাটের দিকে দৌড়াচ্ছিলাম। ছুটতে ছুটতে জেটির ব্রিজটাও আমি পার হয়ে তবে থামলাম। আমি হাঁপাতে লাগলাম যেন আমি মারাত্মক কিছু করে ফেলেছি। আমার মনে হলো এই কুকর্মে আমি নিজেও যেন আসক্ত হয়ে পড়েছি। এমন মানসিক অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আমার বেশ সময় লেগেছিল।

এই সময়ে এই পথে এরকম, বরং আরও ভয়ঙ্কর একটা বিপদে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমার হাতে তখন টাকা পয়সা প্রায় কিছুই ছিল না। যা ছিল তার ব্যয়ে আমাকে ভয়ানক সতর্ক হতে হচ্ছিল। এখন থেকে দিনের খাওয়া আমি কমিয়ে দিলাম। দু'বেলার বদলে একবেলা। এতে পাঁচ বা ছ'মাসের বেশি লাগতো না। এতে পান্থশালা যা সবাই এর পঁচিশ সোর পরিমাণ খাবার হয়ে যেত। আর ঘুমের ব্যাপারটারও পরিবর্তন ঘটালাম। সরাইতে নয়। কারণ যে ভদ্রমহিলার বাড়িতে আমি ঘুমাব আর তার তাতে কিছু অর্থাগম ঘটবে না, সেটা আমার ভাবতে ভাল লাগল না। কিন্তু তখন আবহাওয়াটা বেশ সুন্দর লাগছিল। আমি ভাবলাম, পার্কেই-বা আমি ঘুমাতে পারব না কেন। একদিন, যখন এক রাতে পার্কের একটা বেঞ্চে আমি বেশ গুছিয়ে বসেছিলাম, তখন দেখলাম কোনও একটি মঠের মঠাধ্যক্ষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো জোব্বাপরা একটি লোক আমাকে লক্ষ করছে। সে দেখছে, আমি বেঞ্চটিতে শুয়ে পড়ছি। সে আমার কাছে এসে বলল : কী বাছা, তোমার কি শোবার কোনও জায়গা নেই? আমি তাকে আমার সত্যিকার অবস্থার কথা বললাম। দেখলাম ভদ্রলোক আমার কথা শুনে বেশ বেদনার্ত হলেন। তিনি আমার পাশে এসে বসলেন এবং আমার সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করলেন। তার আলাপে আমার আনন্দ হলো। তার কথা শুনে তাকে আমার খুবই ভাল লাগল। তিনি যখন দেখলেন আমি তাকে খারাপ ভাবছিনে, তখন তিনি বললেন দেখ আমার বাসাও তেমন ভাল নয়। তিনি বললেন, 'আমারও একমাত্র ঘর। তবু এই রাতে আর কোনও জায়গা যখন তুমি জোগাড় করতে পারবে না তখন তুমি আমার সঙ্গে আমার ঘরে চল। এই পার্কে শোবার চাইতে সেটা খারাপ হবে না। তোমাকে আমি এই পার্কে রেখে যেতে পারিনে'। এবং সত্যি তাই, তিনি আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন এবং তার সঙ্গে তার শয্যাতেই আমার শোবার ব্যবস্থা করলেন। আমি তাতে আপত্তি করলাম না। লোকটিকে আমার ইতোমধ্যে ভাল লাগছিল। তার কাছ থেকে আমি উপকারও তো পেতে পারি। এই ছিল আমার মনের ভাব। ঘরে ঢুকে তিনি একটা বাতি জ্বালালেন। ঘরটি কিন্তু আমার বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হলো। আমার সঙ্গে তার সহৃদয় বিনয়ের প্রকাশ দেখলাম। তিনি আমাকে শারাবে ভেজা কিছু চেরী বাদাম খেতে দিলেন। আমরা দু'জনেই তা খেলাম এবং তার পরে দু'জনে একই শয্যায় শয়ন করলাম।

কিন্তু ক্রমে আমি বুঝতে পারলাম, এই লোকটিও বিশেষ সুবিধার নয়। আর একটা ধর্মশালায় একটা ইহুদি আমাকে নিয়ে যে ব্যবহার করেছিল, এর চরিত্রও প্রায় সেই পদের। তবে লোকটা একচোটে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না। আমাকে সে আস্তে আস্তে উত্তেজিত করে তুলতে চাইল। আমার ওপর কোনও জোর খাটাল না। এসব ব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞতা তো আমার ইতিপূর্বে ঘটেই ছিল। তাই লোকটা কী চায় তা আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি। কিন্তু ওর কোনও আচরণে বাধা দিতে বা চীৎকার করতেও আমি ভয় পেলাম। কারণ কোনখানে আমি এসে পড়েছি তারও কোন ধারণা আমার ছিল না। আর বাধা দিলে বা চীৎকার করলে লোকটাতো আমাকে খুন করতেও পারে। কিন্তু তার আদরে আমি উদ্ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলাম। আমি তাকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি লোকটাকে আমার জীবনের কাহিনী বলতে লাগলাম। আর এমন দুর্ভোগে যে আমি আগেও পড়েছি তাও আমি তাকে বললাম। আমি যে এসব পছন্দ করি না, তা আমি তাকে এমনভাবে বললাম যে দেখলাম লোকটি শেষপর্যন্ত তার চেষ্টা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হলো। ফলে ওর বিছানায় সে রাতটা কাটাতে আমার আর তেমন অসুবিধা হলো না। লোকটা অবশ্যই একটা নীতিহীন খারাপ লোক ছিল। তবু এসব বিষয়ে ও যা আমাকে সে রাত্রে বলল তাতে বুঝলাম লোকটা বুদ্ধিহীন নয়। এবং নানা অভিজ্ঞতায়ও লোকটা অভিজ্ঞ।

সকালে মনে হলো মঠের অধ্যক্ষটা আমার ব্যাপারে তেমন অসন্তুষ্ট নয়। সে আমাকে তার সকালের নাশতায় আমন্ত্রণ জানাল। সে বাড়ির গিন্নীর একটি সুন্দরী মেয়েকে কিছু নাশতা এনে দিতে বলল! কিন্তু মেয়েটা বলল, তার সময় হবে না। একথা বলে সে তার নিজের বোনের কাছে চলে গেল। লোকটা ওই মেয়েটাকেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল। এ মেয়েটাও তাকে পরোয়া করল না। অপেক্ষা করতে লাগলাম। নাশতা আর তেমন কিছু এল না। শেষপর্যন্ত আমরা দু'জনই মেয়ে দুটোর ঘরে গেলাম। মেয়ে দুটো মঠাধ্যক্ষকে তেমন কোনও সমাদর দেখাল না। আর ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে ভিন্নতর কোনও ব্যবহার পাওয়ার তো কোনও কথাই ওঠে না। বোন দুটোর বড়টা হঠাৎ আমার জুতোর মাথায় এমন এক চাপ দিল যে সে চাপে আমার জুতোয় একটা ফুটো হয়ে গেল। অপর মেয়েটা আমি যে চেয়ারটাতে বসতে যাচ্ছিলাম, সে চেয়ারটা হঠাৎ সরিয়ে নিয়ে গেল। ওদের মা ওপর থেকে জল ঢেলে আমাদের বসার সব জায়গাটাই ভিজিয়ে দিল। ওরা ভাব দেখাচ্ছিল এমন যেন ওরা সারা ঘরটায় কী যেন খুঁজছে। আমার জীবনে এমন পরিস্থিতিতে আর কখনও পড়িনি। ওদের হাসি ঠাট্টা মশকরায় আমার প্রতি ওদের রাগের চিহ্ন আদৌ অপ্রকাশিত ছিল না। আসলে বোকা ছিলাম আমি। ওদের রাগের কারণটা আমার বোঝা উচিত ছিল। এদের কারোর ভাবগতিক আমার ভাল লাগল না। ব্যাটা মঠাধ্যক্ষও, এমন ভাব দেখল যেন সে কিছু বুঝছে না। আর নাশতা খাওয়ার তো কথাই এল না। আমি প্রায় ভয় পেয়ে গেলাম। মঠাধ্যক্ষটাও আমার সঙ্গে ছিল। আমরা দু'জনেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলাম। আমি লোকটার পেছনে বেরিয়ে এলাম। ভাগ্য ভাল যে এই তিনটা শয়তানের থাবা থেকে আমি যেন কোনও প্রকারে বেঁচে গেলাম।

আমরা একটু এগুতে লোকটা বলল, এসো আমরা একটা ক্যাফে থেকে কিছু নাশতা খেয়ে নিই। আমার ক্ষিধে লেগেছিল ঠিকই। কিন্তু এই লোকটার সঙ্গে আমি আর বসতে চাইলাম না। আমি তার প্রস্তাবে না করলাম। সেও আর পীড়াপীড়ি করল না। আমি লোকটার কাছ থেকে সরে পড়লাম। অভিশপ্ত এই বাড়িটার বাইরে আসতে পেরে চারদিকের সব কিছুই আমার ভাল লাগতে লাগল। লোকটাও যেন আমাকে বাদ দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আমি যেন ওকে আর চিনতে পারবো না, এটিও ও বুঝলো। এরকম আর কোনও ঘটনা আমার জীবনে প্যারিসে বা অপর কোথাও ঘটেনি। লিয়নস-এর এই ঘটনায় লিয়নস-এর সকল লোকের ওপরই আমার মন বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল। আমার মনে হলো সমস্ত ইউরোপেই এই লিয়নস-এর মতো খারাপ জায়গা আর কোথাও নেই।

[রুশো তার হাতের টাকা খরচ করে একটা কাফেতে নাশতা করল। আর কয়েকদিন কিছু সঙ্গীতের কোনও রকম চর্চা করল। বিশেষ করে একটা মঠে সময় কাটাল। এবং তারপরে আবার সে চাম্বেরীর দিকে এবং মাদাম দা ওয়ারেনসকে খোঁজ করে বার করার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল।]

এমন যাত্রার শুরুতে আমার আনন্দের আর অবধি রইল না। আমার পদক্ষেপে কোনও দ্রুততার ব্যাপার ছিল না। আমি জানতাম আনন্দ আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আমি যা চাচ্ছি তাই আমি পাচ্ছি, তাই আমি পাব। কোনও সমান মাঠ নয়। আমি চাচ্ছি উঁচু-নীচু পাহাড় ঘেরা বন, বনানী। যেখানে যেমন ইচ্ছা তেমন, আমি উঠতে পারব, আর নামতে পারব। আমার কোনও তাড়া নেই। আমি নিশ্চিত, আমি জানি যাত্রার শেষে আনন্দ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কেমন দেশকে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালবাসি, তাতো আমি জানি। দিগন্তবিস্তারী কোনও মাঠের আমি কামনা করিনে। পাহাড় আর প্রস্রবণ। আর বৃক্ষ। অন্ধকারাচ্ছন্ন বন, খাড়া পাহাড়, খাড়া সড়ক, যে খাড়া পাহাড় থেকে নিচে তাকাতে আমার ভয় হবে। এই হচ্ছে আমার আনন্দলোক। আমি তো তা পেয়েছি। চাম্বেরী পৌঁছতে পৌঁছতে এ সবই আমি পেয়েছি। এখানে একটা উঁচু পাহাড়ের নাম ছিল লা পাস দা, লা একেলি। বেশ একটু উঁচু জায়গাতে প্রস্রবণ নেমে আসছিল। চায়লিসে দেখলাম, একটা ছোট নদী যেন সেই উঁচু থেকে মাথায় ফেনা বেঁধে নিচে অঝোর ধারায় নেমে আসছে। যেন সে হাজার যুগ ধরে এমনি করে নেমে আসছে। সড়কের দু'পাশে বাঁধও ছিল যেন কেউ না পড়ে যেতে পারে। এমন বাঁধ থাকতে বাঁধের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে আমার মাথা ঘুরে গেলেও কোনও কষ্ট হয়নি। সেই অভয়ে বাঁধের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে লাগলাম। মাঝে মাঝে আমি জলের ধারার মাথায় আমি ফেনাপুঞ্জকে দেখছিলাম, চারদিকে উড়ন্ত পাখিকুলের আওয়াজ শুনছিলাম। নিচে তাকাতে বুঝলাম নিচ থেকে কত ফ্যাদম উপরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। মাঝে মাঝে ঢালু এবং সমান জায়গাও আমি পাচ্ছিলাম এবং জলের সঙ্গে পাথরকুচিগুলো পেরিয়ে যেতে কোনও অসুবিধা ঘটছিল না। এমন অনেক পাথর কুচিকে তুলে তুলে নিজের ইচ্ছেমতো বাঁধের ওপর জমাতেও শুরু করছিলাম। তার পরে আর সেই পাথর কুচির একটা দুটোকে নিচে জলের স্রোতের মধ্যে ফেলে মজা দেখছিলাম। টুকরোগুলো পড়ছিল এবং আরও হাজার টুকরোয় যেন ভেঙে যাচ্ছিল। এবং পড়তে পড়তে একেবারে নিচের গভীরে গিয়ে জমছিল।..

শেষপর্যন্ত আমি তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম। বলা চলে আমার অন্তরের দিগন্তে : এবার ওই আবার আমি দেখলাম। তিনি যে একা ছিলেন তা নয়। নয়া পরিচারক দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত ছিলেন। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে কোনও শব্দ উচ্চারণ করলেন না। কাছে এসে আমার একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন। তারপর তিনি সামনের সকলের নিকট এমনভাবে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন যেন আমি এক অপূর্ব রাজকুমার। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে বাহবা দিয়ে উঠল। এই তাহলে আমাদের সেই রাজপুত্র। যিনি রাজপুত্র হওয়ার জন্যই জন্মেছিলেন। মাদাম দা ওয়ারেনস বললেন, যাক এবার আমার চিন্তা গেল। আমার দিকে তাকিয়ে এবার তিনি বললেন : প্রিয় পুত্র আমার, তুমি রাজপুত্র হওয়ারই যোগ্য। যে মশিয়ে তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে, সে অবশ্যই তোমার একটা ব্যবস্থা করে দিবেন।

আমি দু'চোখ মেলে সবাইকে দেখলাম। কোনও শব্দই আমি উচ্চারণ করতে পারলাম না। আমি কী করব তাও আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমার অন্তরের কামনা আমাকে যেন কোনও উত্তুঙ্গে নিয়ে চলল। অবশ্য এমন উচ্চাশার পূরণ যে পরবর্তী সব ঘটনায় ঘটেছিল তা আমি বলতে পারিনে। কিন্তু সে তো পরের কথা। এই মুহূর্তে আমি যা পেলাম তার আর কোনও তুলনা হয় না।

[যা হোক ঘটনায় দেখা গেল রুশোকে ট্যাক্স আদায়ের একজন তহসিলদারের দায়িত্ব দেয়া হলো।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জানি আমার জীবনের এই পর্যায়ের এমন বিস্তারিত বর্ণনা আমাকে বালসুলভ বলেই সবার কাছে তুলে ধরবে। একদিক দিয়ে এতে এখন আমার একটা দুঃখবোধ হচ্ছে। কিন্তু যেভাবে আমার জন্ম এবং জীবনের এ ঘাট থেকে ওঘাটে উৎক্ষিপ্ত হওয়া তাতে আমার এমন অবস্থার কোনও গত্যন্তর ছিল না। কোনওকালেই আমি একটি শিশু বৈ আর কিছু ছিলাম না। একটি জীবনের শিশু। আর দেখতে গেলে আজ এই বয়সেও আমি সেই শিশুটিই রয়ে গেছি। জনসমাজে আমি বড় কেউকেটা হব, এমন চিন্তা আমি কখনও করিনি। আমি কেবল চেয়েছি আমি যেমন আছি তেমনি যেন থাকি। আর সে জন্যই কেউ যদি আমার বয়সের পর্যায়ে আমাকে বুঝতে চায় তবে তাকে আমার শৈশবেই ফিরে যেতে হবে। ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভেবেছি। আসলে কোনও ঘটনা যদি আমার জীবনে ঘটে থাকে তাতে আমার স্মৃতিতে ঘটনাটার চাইতে ঘটনাটা আমার মনকে যেভাবে আলোড়িত করেছে, সেই ভাবটাই আমার মনের মধ্যে আটকে রয়েছে। ঘটনাটা নয়। মানুষের মনের অস্তিত্বেও ঘটনার পরে ঘটনার সৃষ্টি হয়। সে ঘটনা একটা লোকের মনকে কীভাবে আলোড়িত করে, ঘটনাটার চাইতে সেটার দিকেই আমাদের দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। আমার তো তেমনই মনে হয়। আমি চাই যে কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে মনের ওপর ঘটনার আঘাতটাকে বড় করে দেখি, ঘটনাটার চাইতে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই আমি একটি লোককে চেষ্টা করি যেন সে নিজেকে এভাবে দেখাতে চেষ্টা করে। আমি নিজে চেষ্টা করি পাঠকের দৃষ্টিকে আমার মনের দিকে আকৃষ্ট করতে। মূল ঘটনাটার চাইতে মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়াটিকেই আমি অধিক মূল্যবান বলে মনে করি। তাই তার চরিত্রের বিভিন্ন দিক থেকে তার চরিত্রের মূলের দিকে তার দৃষ্টিকে আমি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করি। আমি তার কাছে তার চরিত্রের সবদিককেই তুলে ধরতে চাই। যেন সে নিজেই নানান দিক থেকে নিজেকে বিচার করতে সক্ষম হয়।

AMARBOI.COM

আমার এমন চেষ্টায় ফল যাই হোক না কেন, সে যদি আমার প্রতি বিশ্বাস না রাখে তাহলে অন্তত আমি তাকে বলতে পারব, আসলে সে নয়, আমিই খারাপ। এর চাইতে কোনও ঘটনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণই আমি বর্ণনা করতে থাকি তাতে আমি যতই তার কাছে তাকে খারাপ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করি না কেন তাতে সে নিজে স্বীকার করবে না যে সে ঘৃণার পাত্র বা খারাপ। আসলে তাকে সাহায্য করতে হবে যেন সে নিজেকে চিনে; নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে। আমার কথায় নয়, আমার চোখ দিয়ে নয়; তার নিজের চোখ দিয়ে। হ্যাঁ সে যেন নিজের চোখে নিজেকে দেখতে পায়। অন্যের চোখ দিয়ে নয়। তার নিজের সিদ্ধান্তে যদি ভুল হয় তাহলেও সে নিজেকেই ভুল বলে স্বীকার করবে। আমাকে নয়। কারণ আমি তো তাকে খারাপ বলিনি। অবশ্য এমন উদ্দেশ্যে আমাকে যে ঘটনার প্রতিটি ব্যাপারে সত্য বলতে হবে, এমনও নয়। তবু আমি যা বলব, তা মিথ্যা নয়। সে সত্যকে দেখুক নিজের চোখ দিয়ে। আমার চোখ দিয়ে নয়।

আমি এ পর্যন্ত আমার উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এভাবেই এগুবার চেষ্টা করেছি। আর ভবিষ্যতেও আমার জীবনে এটিই হবে আমার চেষ্টা। মানুষ নিজের চোখে নিজেকে দেখুক। অপরের চোখে নয়।

কিন্তু এর একটা মুশকিলকে আমি স্বীকার করি। সেটি হচ্ছে আমাদের নিজেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৈশোরের স্মৃতি যত উজ্জ্বল হয়ে আমার মনে ভেসে ওঠে, আমার অধিকতর বয়সের ঘটনার স্মৃতির ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটে না। কৈশোরের স্মৃতির উজ্জ্বলতা মধ্য বয়সের চাইতে অনেক বেশি। আমি তাই যে কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে আমার কৈশোরকে নিয়ে শুরু করতে চেয়েছি। অধিকতর বয়সের ঘটনা নিয়ে নয়। আমার কৈশোরের কথার পুনরাবৃত্তিতে আমার পাঠকরা অধৈর্য হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু আমি নিজে আমার নিজের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই একটি লোককে চেষ্টা করি যেন সে নিজেকে এভাবে দেখতে চেষ্টা করে। আমি নিজে চেষ্টা করি পাঠকের দৃষ্টিকে আমার মনের দিকে আকৃষ্ট করতে। মূল ঘটনাটার চাইতে মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়াটিকেই আমি অধিক মূল্যবান বলে মনে করি। তাই তার চরিত্রের বিভিন্ন দিক থেকে তার চরিত্রের মূলের দিকে তার দৃষ্টিকে আমি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করি। আমি তার কাছে তার চরিত্রের সবদিককেই তুলে ধরতে চাই। যেন সে নিজেই নানান দিক থেকে সে নিজেকে বিচার করতে সক্ষম হয়।

আমার এমন চেষ্টায় ফল যাই হোক না কেন, সে যদি আমার প্রতি বিশ্বাস না রাখে তাহলে অন্তত আমি তাকে বলতে পারব, আসলে সে নয়, আমিই খারাপ। এর চাইতে কোনও ঘটনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণই আমি বর্ণনা করতে থাকি তাতে আমি যতই তার কাছে তাকে খারাপ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করি না কেন তাতে সে নিজে স্বীকার করবে না যে সে ঘৃণার পাত্র বা খারাপ। আসলে তাকে সাহায্য করতে হবে যেন সে নিজেকে চিনে; নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে। আমার কথায় নয়, আমার চোখ দিয়ে নয়; তার নিজের চোখ দিয়ে। হ্যাঁ সে যেন নিজের চোখে নিজেকে দেখতে পায়। অন্যের চোখ দিয়ে নয়। তার নিজের সিদ্ধান্তে যদি ভুল হয় তাহলেও সে নিজেকেই ভুল বলে স্বীকার করবে, আমাকে নয়। কারণ আমি তো তাকে খারাপ বলিনি। অবশ্য এমন উদ্দেশ্যে আমাকে যে ঘটনার প্রতিটি ব্যাপারে সত্য বলতে হবে, এমনও নয়। তবু আমি যা বলব, তা মিথ্যা নয়। সে সত্যকে দেখুক নিজের চোখ দিয়ে। আমার চোখ দিয়ে নয়।

আমি এ পর্যন্ত আমার উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এভাবেই এগুবার চেষ্টা করেছি। আর ভবিষ্যতেও আমার জীবনে এটিই হবে আমার চেষ্টা। মানুষ নিজের চোখে নিজেকে দেখুক। অপরের চোখে নয়।

কিন্তু এর একটা মুশকিলকে আমি স্বীকার করি। সেটি হচ্ছে আমাদের নিজেদের কৈশোরের স্মৃতি যত উজ্জ্বল হয়ে আমার মনে ভেসে ওঠে, আমার অধিকতর বয়সের ঘটনার স্মৃতির ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটে না। কৈশোরের স্মৃতির উজ্জ্বলতা মধ্য বয়সের চাইতে অনেক বেশি। আমি তাই যে কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে আমার কৈশোরকে নিয়ে শুরু করতে চেয়েছি। অধিকতর বয়সের ঘটনা নিয়ে নয়। আমার কৈশোরের কথার পুনরাবৃত্তিতে আমার পাঠকরা অধৈর্য হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু আমি নিজে আমার নিজের কৈশোরের খারাপ কিংবা ভাল, কোনও কিছুর স্মৃতিতেই কখনও ক্লান্ত বোধ করিনে। এ ব্যাপারে আমার একটামাত্র ভয় : ভয় এই নয় যে, যে আমার স্মৃতির অধিক পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছি, আবার যা সত্য নয় তাই বলছি। তার চাইতে আমার ভয় পাছে না আমি কিছু গোপন করি এবং সেই গোপন করায় আমার জীবনের কোনও সত্যকে আমি গোপন করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম পুস্তক

[এই পর্যায়ে দেখা যায় জ্যাঁ জাঁকে তথা রুশো আবার প্রিয় 'মামার' সঙ্গে বাস করতে শুরু করেছে। ওর বাসের ঘরটা ছিল কিছুটা অন্ধকারময় আর বিষণ্ন। মামার আলাপে বোঝা গেল তার নিজের চাকরটিও তার আর একটি প্রেমিক।]

কিন্তু আমার মনটা একটু খারাপই লাগল যে, মামার সঙ্গে আমি ছাড়া এত ঘনিষ্ঠতায় আর কেউ থাকবে। এই নয় যে, আমি কোনওদিন তার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা কামনা করেছি। তবু অপর কেউ আমার চাইতে তার ঘনিষ্ঠ এমনটাও আমার সহ্য হচ্ছিল না। কী করব। এমন ভাবা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। এই লোকটার প্রতি আমার একটা বিতৃষ্ণা জেগেছিল, একথা ঠিক। তবু তা সত্ত্বেও এই লোকটাকেও আমি ভালবাসতে লাগলাম। কারণ আমি আবার যাতে খুশি হই, তাতেই আমি খুশি হব। কাজেই এ লোকটিকে যখন মামা ভালবাসে তখন আমিও লোকটিকে ভালবাসব। লোকটাকে দেখলাম, একদিকে সে যেমন মাদামকে ভালবাসছে, তেমনি আমাকেও ভালবাসছে। আমার উপর তার নিজের কোনও মাতব্বরি না ফলিয়ে, সে বরং তার স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আমাকেই ওর দিকে আকৃষ্ট করে তুলল। এই লোকটি যা অপছন্দ করে আমি নিজে তেমন কিছু করতাম না। আর সেও তাকে খারাপ ভাবত যাকে আমিও খারাপ মনে করতাম। ফলে আমাদের সবারই পারস্পরিক সম্পর্কটি যথার্থই মধুর হয়ে উঠল। আমরা পরস্পর এমন একাত্মতায় বাস করতে লাগলাম যে মৃত্যু বাদে অপর কিছুতে আমাদের মধ্যকার এমন অবিচ্ছিন্নতার কখনও ইতি ঘটতে পারে। আমার এই মাদামের এ গুণটি আমাকে বিমোহিত করত যে, এই লোকটিকে যারা যারা ভালবাসত তারাও পরস্পরকে ভাল না বেসে থাকতে পারত না। ঈর্ষাই বলি, বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বলি সবকিছু তার অমৃত আচরণের কাছে নত না হয়ে পারত না। যথার্থই তাই। আমি কোনওদিন দেখিনি আমরা যারা তার ঘনিষ্ঠতায় থাকতাম তারা নিজেরা কেউ কারোর প্রতি ঈর্ষা বোধ করেছি। আমি আমার পাঠকদের বলব তারা যেন ব্যাপারটা ভেবে দেখেন। তারা কেউ যদি এমন মহৎ মহিলার ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন তবে তারা যেন সকলেই তাকে এমন করেই ভালবাসে।

১৭৪১ এর কথা বলছি। চাখেরিতে পৌঁছার পর প্যারি থেকে চলে আসার পরে আমার জীবনে আট কিংবা নয় বছরের একটা নতুন পর্যায়ের যেন সূচনা ঘটল। এই পর্যায়টি যথার্থই আমার জীবনের একটা সুখের পর্যায় ছিল। এমন একটি নিরুদ্বেগ সুখের জীবনেরই আমার দরকার ছিল, যেন আমি আমার চরিত্রে অস্থিরতার বদলে একটা ধৈর্যকে আয়ত্ত করতে পারি। এর পূর্বে এরকম জীবন আর কখনও আমি লাভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিনি। এই পর্যায়টিকে আমি আমার জীবনের একটি মূল্যবান পর্যায় বলেই গণ্য করি। এতদিন আমার শিক্ষায় এবং অভিজ্ঞতায় যে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছিল, সে অস্থিরতার স্থানে যেন একটা স্থিরতার সূচনা ঘটতে লাগল। তার ফলে পরবর্তীকালে আমার জীবনে ঝড়-ঝঞ্ঝা যাই ঘটুক না কেন আমার এই স্থিরতা থেকে আমি আর কখনও বিচ্যুত হইনি।....

এবার একটু রঙের কথা বলি। জ্যামিতিক চিত্রের রঙগুলো যেন আমার মনের মধ্যে একটা অঙ্কনের আকর্ষণ সৃষ্টি করে তুলল। এবার আমি কতগুলো রঙ সংগ্রহ করলাম। আর সেই রঙ দিয়ে প্রাকৃতিক নানা রকমের দৃশ্য অঙ্কন করার চেষ্টা করলাম। ফুল আর প্রকৃতির দৃশ্য। আসলে ছবি আঁকার আমার কোনও দক্ষতা ছিল না। আমি যত না আঁকতাম, রঙই যেন আমাকে তার বেশি আঁকত। রঙ আমাকে পেয়ে বসল। সারাটা মাস আমি রঙের মধ্যে বসে থাকতাম। এই কাজে আমি যত মগ্ন হতে লাগলাম, তত যেন এই পাগলামি আমাকে রঙের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে লাগল। এটা আমার স্বভাবে পরিণত হয়ে পড়ল। যাতে যত আকৃষ্ট হই, তার থেকে যেন তত আমি 'বিকৃষ্ট' হয়ে পড়ি। কোনও একটা কিছু শুরু করলাম তো তাতে এত ডুবে গেলাম, সেটাই যেন আমাকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে লাগল। বয়স যে আমার এমন চরিত্রকে তেমন পাল্টাতে পেরেছে, তা নয়। আজ এই কথা যখন লিখছি তখনও আমার যেন মনে হচ্ছে কী অর্থহীনভাবেই না জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছি। অপরের ব্যাপারে নিশ্চয়ই এমন হয় না। তারা যত বড় হয় তত তাদের কৈশোরকে পার হয়ে তারা এগুতে থাকে, আর আমি যেন সেই কৈশোরেই আটকে থাকছি।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল। ব্যাপারটার প্রতি আমার নিজের আকর্ষণও সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের সে গৃহে আনেত বলে একটি কাজের লোক ছিল। আমি রোজ দেখতাম সে তার মাথায় এক বোঝা লতাপাতা নিয়ে আসত। আর তাতে সে বেশ মজা পেত। আমাদের মামা তথা মাদাম ওয়ারেনস-এরও এই লতাপাতার প্রতি এক আকর্ষণ ছিল। এদিয়ে নানা প্রকার ঔষধি তৈরি করা যায়। তাই বলে মাদাম যে এই লতাপাতা দিয়ে কোনও ঔষধাদি বানাতেন তা আমার মনে হয় না। কিন্তু যে লোকটি এইসব বনলতার বোঝা মাথায় করে আনত, তার দিকে চাইতে আমি তার চোখে একটা আনন্দের ভাব দেখতে পেতাম। আমি ওর সঙ্গে একবার বাইরে গেলেই এই লতাপাতায় আমি মোহাবিষ্ট না হয়ে পারতাম না। আর তাই যদি আমি করতাম, আর আমি যদি ব্যাপারটায় লেগে থাকতাম তাহলে এতদিনে আমি একটা বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদে পরিণত হয়ে যেতাম। কারণ এই লতাগুল্মের প্রতি আকর্ষণের মতো আকর্ষণ আমি প্রকৃতির আর কিছুতে যেন বোধ করিনি। আর তখন থেকে আমি যে জীবন যাপন করছি তাকে বলতে পারি উদ্ভিদের জীবনতত্ত্ব অন্বেষণেরই এক জীবন। অথচ উদ্ভিদ তত্ত্বের আমি কিছুই জানতাম না। বরং এগুলোর সঙ্গে আমার যত পরিচয় ঘটেছে তত যেন ওদের জন্য আমার বিতৃষ্ণার বৃদ্ধি ঘটেছে। মামারও বিশেষ কোনও গুল্মের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল তেমন নয়। তারও আকর্ষণ ছিল সাধারণ লতাপাতার প্রতি। তা দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি কোনও ওষুধপত্র তৈরি করতেন তেমনও নয়। এইভাবে নানা লতাপাতা দেখতে দেখতে : উদ্ভিদ, রসায়ন, বায়বীয় তত্ত্ব নানা দিকেই আমার চোখ গেল বটে; কিন্তু এর কোনও কিছুতেই আমি বিজ্ঞ হয়ে উঠলাম না। সব মিলিয়ে 'ওষুধ' বলে একটা ব্যাপার যেন আমার পরিচিত একটা ব্যাপার হয়ে উঠল।

কিন্তু কালক্রমে দেখলাম একটা একেবারে ভিন্ন জগতে কেমন করে যেন আমি ঢুকে গেলাম। আমি সঙ্গীতের কথা বলছি। কেমন করে যেন সঙ্গীতের জগতে আমি ঢুকে গেলাম। মনে হচ্ছে এ ব্যাপারটা আমার একটা জন্মগত ব্যাপার ছিল। সেই শিশুকাল থেকে আমি যেন সঙ্গীতের এক শিষ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম। আর এই একটা মাত্র বিষয় যা আমার মনে কোনও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করেনি। অথচ একে আয়ত্ত করতে আমার কত না কষ্ট করতে হয়েছে। আর সঙ্গীতের শিক্ষায় আমি অগ্রসরও হতে পেরেছি, খুব ধীরে। একথা ঠিক সঙ্গীতের চর্চা বলা চলে সারাজীবনই আমি করেছি। তথাপি কোনও একটি গানের শুরুতে আমি আদৌ ভয় ব্যতীত কোনও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারিনি। এই পর্যায়ে ব্যাপারটাতে আমি যে টিকে ছিলাম,

AMARBOI.COM
কড়াইয়ের সব পাউডার তিনি আমার মুখে লেপে দিলেন

তার বড় কারণ মাদাম নিজেও গান গাইতেন। আর আমি তার সাথে গান গাইতাম। অন্যান্য ব্যাপারে আমাদের মতামতে যে কোনও মিল ছিল এমন নয়। কিন্তু এই সঙ্গীত ছিল আমাদের দু'জনার মধ্যে যথার্থই একটি ঐক্যসূত্র। আমাদের উভয়ের মধ্যকার এই সূত্রটির ব্যবহারে আমার কোনও কার্পণ্য ছিল না। আমার এ ব্যাপারে মামার কোনও আপত্তি ছিল না। এমন অনেক সময় হয়েছে যে, একটা চুলার পাশে আমরা দু'জনে বসে আছি। আমি বললাম, মামা এসো না, আমরা দু'জনে ব্যাপারটা তৈরি করি। হ্যাঁ, তা আমরা পারি বটে। তবে খারাপ যদি কিছু হয় তবে দোষ দেব তোর আর তার সবটাই আমি তোকে খাইয়ে ছাড়ব! এমন আলাপের মাঝখানে আমি তাকে পিয়ানোর কাছে নিয়ে এলাম। আর দু'জনেই আমাদের আসল ব্যাপারটা ভুলে গেলাম। যা বানাবার আশায় চেষ্টা করছিলাম তা ইতোমধ্যে পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। মামা তাতে রাগ করলেন না। কড়াইয়ের সব পাউডার তিনি আমার মুখে লেপে দিলেন। সবটাতেই আমরা দু'জনেই খুব মজা পেয়েছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[রুশোর কৃতিত্ব বাড়ছিল। এখন থেকে রুশোর সঙ্গীতের মাসিক আসর বসতে শুরু করল। এবং এর আগে যে কাজে নিযুক্ত ছিল, তা বাদ দিয়ে সে সঙ্গীতেই মগ্ন হয়ে গেল। সে দস্তুরমতো সঙ্গীতের শিক্ষক হয়ে উঠল। এবং এর মাধ্যমে সে অভিজাত মহলেও ঢোকার একটা সুযোগ পেল। অবশ্য রুশোর দৃষ্টি ছিল তার ছাত্রীকুলের সঙ্গীতে দক্ষতার দিকে, তার অধিক দৃষ্টি ছিল তাদের দৈহিক সৌন্দর্যের দিকে।]

আমার ছাত্রীকুলের মধ্যে কিছু ছিল আর্থিক অবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এদের একটি ছিল, যার কারণে পরোক্ষভাবে হলেও আমার চরিত্রে কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হতে শুরু করল। এ কাহিনীটি আমার বলা দরকার। কারণ, আমি কোনও কিছু না লুকাতে বদ্ধপরিকর। মেয়েটি ছিল একটি দোকানীর মেয়ে। নাম ছিল মাদামসেল লার্ড। তার দেহটি ছিল একটি গ্রীক মূর্তির একটি সুসম্পূর্ণ প্রতিকৃতি। আমি বলব আমার জীবনে আমি যত মেয়ে দেখেছি তার মধ্যে এটি ছিল সুন্দরতম। এর জীবন বা আত্মার কথা আমি বলছিনে। দেহ এবং আত্মাবাদে যদি নিছক কোনও সৌন্দর্য থাকতে পারে, তবে সে ছিল তেমনি একটি নিছক সৌন্দর্য। তার চরিত্রের একটা নিস্পৃহতা, একটি উত্তাপহীনতা ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য। তাকে সুখি করা কিংবা উত্যক্ত করা— এ দুটোই ছিল আমার ক্ষমতার বাইরে। আর আমার মনে হয় এমন কোনও লোক যদি থাকত যে তার ওপর কোনও আক্রমণের উদ্যোগ নিত, তবে তাতেও ওর কোনও বিরাগ ঘটত না। সে ওকে বাধা দিত না। বাধা দিত না আগ্রহের অভাব থেকে নয়। এ ব্যাপারে ওর নিছক নির্বিকারহীনতা থেকেই ও কোনও বাধার উদ্রেক করত না। ওর ওপর ওর মায়ের একটা সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কোনও ঝুঁকির মধ্যে সে যেতে চাইত না। তার ফলে ওর মা ওর কাছ থেকে ক্ষণিকের জন্যও দূরে থাকত না। ওর মা ওকে সঙ্গীত শেখাবার জন্য এক যুবককে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তও করেছিল। নানাভাবে ওর মেয়েটিকেও সঙ্গীতে রপ্ত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। ব্যাপারটার অপরদিকটা দাঁড়াল এমন যে সঙ্গীতের শিক্ষক একদিকে যেমন ছাত্রীটিকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করত, মেয়েটির মার প্রতি তার প্রণয়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতো। তার মা তখন মেয়েটার শিক্ষকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত। অবশ্য মাও তাতে কোনও সফলতা লাভ করতে পারেনি। মেয়ের মার উদ্দামতা কম ছিল না। অথচ এই উদ্দমতাটি মেয়ের মধ্যে থাকলে তার অধিকতর লাভ হতো। মেয়েটার প্রাণ ছিল, সৌন্দর্য ছিল। অবশ্য ওর অঙ্গ সৌষ্ঠবটি তেমন ভাল ছিল না। মুখমণ্ডলে বসন্তেরও কিছু দাগ ছিল। চোখ দু'টি ক্ষুদ্রাকারে হলেও তাতে আগুনের ছটা ছিল। ওর চোখের রঙ ছিল লাল এবং প্রায় সময়ই চোখ দু'টি যেন ফোলা ছিল।

আমি রোজ সকালে ওকে সঙ্গীতের পাঠ দিতে যেতাম। গিয়ে দেখতাম আমার কফি এবং ক্রিম তৈরি করা আছে। মা-টি আমার ওষ্ঠ চুম্বনে দ্বিধা করত না। এমন সমাদরটিকে আমি মায়ের বদলে মেয়ের ওষ্ঠেই লেপন করতে চাইতাম। অন্তত এর বদলে এই নিস্পৃহ মেয়েটার প্রতিক্রিয়া নিয়ে তা দেখবার ইচ্ছায়। ব্যাপারটা এমন সরলভাবে ঘটত যে লার্ড উপস্থিত থাকলেও এমন চুম্বন এবং সমাদরের কোনও ব্যতিক্রম ঘটত না। তাই বলব, ভদ্রলোকটি বেশ ভদ্রই ছিল। মেয়ের উত্তম পিতাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে ছিল। মা যে পিতাকে কোনও দিক দিয়ে বঞ্চিত করত, এমন কথা বলা যায় না। আসলে মেয়েটির বাবাকে কোনও প্রকারে বঞ্চিত করার প্রয়োজন তার মার হতো না। ...

আমার প্রতি মাদাম লার্ডের প্রীতির নজর এত অধিক ছিল যে তার প্রতি আমার নজর দেয়ার কোনও উপায় ছিল না। আমার প্রতি তার এমন নজর আমাকে অবশ্যই মোহিত করত। এসব কথা আমি মামার কাছে বলতাম। এর মধ্যে গোপনীয়তার কিছু ছিল বলে আমি মনে করতাম না। এর মধ্যে রহস্যের যদি কিছু থাকতও তবু তাকে আমি তা না বলে পারতাম না। কারণ আমার কাছ থেকে আমার কিছু গোপন থাকবে, এমন আমি ভাবতেই পারতাম না। ঈশ্বরের কাছে আমার যা কিছু সব যেমন প্রকাশিত ছিল, মামার কাছেও তাই। কিন্তু ব্যাপারটাকে আমি যতটা নিষ্পাপ মনে করতাম, তিনি তেমনটা মনে করতেন না। আমি যাকে বন্ধুত্ব বলে মনে করতাম, তিনি তাতে প্রেম নিবেদন বলে গণ্য করতেন। মাদাম লার্ড আমাকে একটা মূর্খ বলে পরিত্যাগ করছেন না দেখে, মামা আমাকে তার কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে বিন্দুমাত্র কসুর করতেন না। কারণ তিনি মনে করতেন একটা খারাপ মেয়েলোকের খপ্পর থেকে একটু সুকুমার প্রিয়কে তার রক্ষা করার চেষ্টা করা অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরও হচ্ছিল বলেই মাদাম মনে করতেন। অবশ্য সেই ষড়যন্ত্র থেকে আমি উদ্ধার পেয়েছিলাম। তবু মাদাম মনে করতেন ভাগ্যে তিনি টের পেয়েছিলেন আর চেষ্টা করেছিলেন তাই সুপাত্র আমাকে তিনি সেই ডাইনীর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমার একটি ছাত্রের মায়ের নাম ছিল কাউন্টেস দা মেনথন। এ ভদ্রমহিলার বুদ্ধির কমতি ছিল না। ঈর্ষার ক্ষেত্রে তার কমতি ছিল না। এমন খবর রটেছিল যে সে তাগ্রেমন্টের গৃহে নিদারুণ সব বিবাদের সৃষ্টি করেছিল, যার একটির পরিণাম মারাত্মকই ঘটেছিল। মাদাম অবশ্য এই মেয়েলোকটির চরিত্রকে ভাল করেই জানতেন। মাদাম দা মেনথন মামার বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ করেছিল। মামা তার সব কু-ইচ্ছাকেই ধরে ফেলেছিল। তার কু-ইচ্ছার একটাও সফল হতে পারেনি। একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে একটা হাসির ঘটনার কথা বলি। তখন তারা গ্রামে ছিল। সাথে তাদের বেশ কয়েকজন প্রতিবেশী ছিল। এদের মধ্যে একজন ছিল। প্রণয় প্রার্থী। মাদাম দা মেনথন একদিন এই ভদ্রলোকদের একজনকে বলল : মাদাম দা ওয়ারেনস আসলে একটা ভণ্ড। তার কোনও রুচিবোধ নেই। পোশাক পরিধান করা কাকে বলে, তা সে জানেই না। তার বক্ষমণ্ডলকে সে চাষারে মেয়েলোকের মতো আবৃত করে রাখে। এ ব্যাপারে এই কাউন্টেস দা মেনথন তেমন সুবিধা করতে পারল না। কারণ লোকটি জবাবে বলল, 'এমন বক্ষই তো আমার পছন্দ'। আসলে ঘৃণার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে ঘৃণাই ঘৃণিতের জন্য বিশ্বাসের সঞ্চার করে। মাদাম দা মেনথন এই সত্যটার সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করল। এবং একদিন মামা যখন এই মেয়েলোকটার সঙ্গে তাস খেলছিল, তখন মেয়েলোকটা পেছনে সরে গিয়ে মামার তাসের রঙ চুরি করে দেখে নিল। এবং মামার চেয়ারটাকে এমন একটা ধাক্কা দিল যে মামা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। কিন্তু ওই শয়তানের চেষ্টা সফল হওয়ার বদলে ব্যর্থ হয়ে গেল। যে ভদ্রলোকের ওপর মেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা নজর রাখছিল, সে কিন্তু ব্যাপারটা ধরে ফেলল। ফল হলো উল্টো।
আসলে মাদাম দা মেনথনের প্রতি আমার যে কোনও সুদৃষ্টি ছিল, এমন নয়। তবু আমার ওপর ওর একটা নজর ছিল। সে অবশ্য আমার চেহারার জন্য নয়। কারণ, চেহারা বোঝার বুদ্ধি ওটার ছিল না। আসলে ব্যাপারটা ছিল আমার বুদ্ধির খেলা। এতে হয়তো মেয়েলোকটি কিছু মজেছিল। বুদ্ধির প্রতি মেয়েলোকটির একটি আকর্ষণ ছিল, এটা আমার বলতে হয়। রঙ্গ বা ব্যাঙ্গের প্রতি ওর একটা আকর্ষণ ছিল। তাছাড়া যদি কেউ ওকে উত্ত্যক্ত করত তবে তাকে নিয়ে গান বাঁধতে ও দস্তুরমতো ওস্তাদ ছিল। ও যদি আমার সঙ্গীতের দক্ষতার দিকটাকে বুঝতে পারত তাহলে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভিন্নতরও হতে পারত। এবং ও হয়তো আমাকে ওর বাকি জীবনের শৃঙ্খলে বন্দি করে ফেলতে যথার্থই সক্ষম হতো।
কিন্তু আসলে এমন কিছু ঘটেনি। মাদাম দা মেনথন আমাকে কয়েকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমাকে দিয়ে কথা বলাবারও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। তাতে কেবল আমার মূর্খতাই প্রকাশ পেয়েছে। ব্যাপারটাতে আমি নিজেই সচেতন ছিলাম। এতে আমার দুঃখবোধও ছিল। ব্যাপারটাতে আমার বন্ধু ভেনচারের প্রতি যথার্থই কৃতজ্ঞ ছিলাম। সে আমাকে যথার্থই ব্যাপারটার অপ্রিয়তা থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে। আমি তার কন্যার সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম, সে দায়িত্ব আমি পরিত্যাগ করিনি। এর অধিক কোনও দায়িত্ব আমার ছিল না। আমার জীবন শান্তিতেই কাটছিল...
সে যাই হোক। আমার মনোভাবটি ছিল, আমি যে ধ্বংসের পথে যাচ্ছিলাম, সে পথ থেকে আমাকে উদ্ধার করতেই হবে। আর সেজন্য সে উপায় গ্রহণ করল তা একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে আদৌ এমন অবস্থায় স্বাভাবিক ছিল না। আমি দেখলাম ব্যাপারটাকে সে যথার্থই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। এবং তার আচরণ এবং তার প্রকাশ অন্য সময়ের চেয়ে যেন অধিকতর নীতিপূর্ণ ছিল। তার আচরণে আগে যে হালকা মেজাজ ছিল, এখন সে জায়গায় গাম্ভীর্যই অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠল। এমনটি আগে ছিল না। এবার তার আচরণে হয়তো কাঠিন্য তত ছিল না। কিন্তু আমার কাছে এমন পরিচয়ও পূর্বে ছিল না। আমি নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করেও এর কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না। সে নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে একটা জিজ্ঞাসার অপেক্ষায় ছিল। আমি জিজ্ঞাসাও করলাম। দেখলাম পরের দিন কাছের ছোট বাগানটিতে সে আমাকে ভ্রমণের আহবান জানাল। পরের দিন আমি তার কাছে হাজিরও হলাম। আমি দেখলাম কেউ যেন আমাদের কোনও রকমে বিব্রত করতে না পারে সে ব্যবস্থাও সে গ্রহণ করেছিল। এবং অন্য কোনও স্ত্রীলোক এমন অবস্থায় যে ভাব দেখাত না, আমার প্রতি সে সেই ভাবটিই দেখাল। সেজন্য সে নানা কৌশল নিল। আমাকে আকর্ষণের নানা উপায় উদ্ভাবনও করল। তার ব্যবহারে যে ভদ্রতা ছিল না তা নয়। এবং তার এ ভদ্রতায় আমি কিছুটা মোহিতও হয়েছিলাম। কিন্তু তার আচরণ ভদ্র হলেও, অন্য কোনও সময়ে তার প্রতি যে মনোযোগ আমি দিতাম, এবার সে মনোযোগ দিতে আমি মোটেই আগ্রহবোধ করলাম না। প্রেমের যে প্রস্তুতি পর্ব সে গ্রহণ করেছিল আমি তাতে আদৌ প্রীত হলাম না। তার কথার সময়ে আমার চোখে উত্তেজনার বদলে তন্দ্রার ভাবই প্রধান হয়ে দেখা দিল। সে আমার প্রতি যা কিছু করছিল তার দিকে দৃষ্টি দেবার বদলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার আসল কী উদ্দেশ্য সেদিকেই আমি নজর রাখছিলাম। তার আচরণের প্রতি আমি ক্রমেই আকর্ষণহীন হয়ে পড়লাম। সে কী বাক্য ব্যবহার করছিল তার প্রতিও আমার আগ্রহ বা আকর্ষণ রইল না।

সঙ্গীত শিক্ষকদের অনেকেই তার শিষ্যদের মধ্যে বিকৃত রুচি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে থাকে। ব্যাপারটার বিষয়ে আমার 'এমিলিতে' আমি আলোচনা করেছি। একজন যুবক কী করে? সে যদি আকর্ষণীয় কিছু পায় তবে সে তাকেই দৃষ্টির অগ্রবিন্দুতে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। এখন, শিষ্যকে যদি এই বিন্দুটিতে আটকে রাখতে চায়, তবে শিক্ষকের উচিত হবে না কেবল সেই বিন্দুটিকেই কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা। কিন্তু মামা এই দিকটিকে তত খেয়াল রাখেননি। আমি নিজে কোনও বিন্দু চাইনি। আমার দৃষ্টি ছিল যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ। যাই-ই ভাল লাগত তাকেই আমি ভালবাসতাম। আমার ভালবাসার তুন তাতেই আমি গেঁথে ফেলার চেষ্টা করতাম।

আমার মনে হচ্ছে, যে আটটা দিনের আমি বর্ণনা দিচ্ছি সে আটটা দিন আমার কাছে বোধ হয়েছিল অষ্ট শতাব্দী বলে। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যেন এই সময়টা যথার্থই আটটা শতাব্দী ব্যাপীই বিস্তারিত হয়।

সে সময়টার বর্ণনাদান আমার ক্ষমতার অতীত মনে হচ্ছে। দু'এক সময়ে মনে হয়েছে যেন এই স্বপ্নের শেষ আমার জীবনে আদৌ না আসে। তখনকার আমার সুস্বাস্থ্য, তার প্রদাহ, আমার রক্তের উত্তাপ আমাকে উন্মাতাল করে তুলত। আমার সেই সময়কার যৌন উগ্রতার কথা চিন্তা করলে, পুরুষোচিত আচরণের কথা ভাবলে বুঝতে পারিনে কেমন করে কোনও দুর্ঘটনা ব্যতিরেকে সেই সময়টা আমি পেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম। এখন আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না, কেমন করে একটা মেয়ের প্রতি আমার যৌন আকর্ষণকে ঘটনাহীন বাদে আমি অতিক্রম করতে পেরেছিলাম। অথচ একথা ঠিক যে, কোনও মেয়েমানুষকে আমি এতদিন স্পর্শ করিনি। অথচ মেয়েটার প্রতি আমার আগ্রহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ছাড়া হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি। মেয়েটাকে না দেখতে পেলে আমার ভাল লাগত না। ওর চিন্তা বাদে যেন আমি থাকতেই পারতাম না। আমার হৃদয় কেবল যে ওর বিনয়-নম্রতাতেই পূর্ণ ছিল তা নয়। ওর প্রতি আমার মন যৌন আকর্ষণেও পূর্ণ ছিল। তার শরীরের গঠন : মোটকথা যে কোনও আচরণে ওর প্রতি সবার আকর্ষণ বৃদ্ধিই পাচ্ছিল।

পাঠক এমন মনে করবেন না যে, মেয়েটার বয়স আমার চাইতে দশ কিংবা বার বছর বেশি ছিল বলে তাকে আমার চেয়ে বৃদ্ধ বলে মনে হতো। ওকে দেখার পর পাঁচ-ছ'বছর কেটে যাবার পরও তার প্রতি আমার আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমেনি, যেন তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি : আমার চোখে তো নয়ই। আমার চোখে ও সবসময়ই সুন্দর বলে বোধ হতো। সে সময়টাতে আর সবাই-ই তাকে সুন্দর বলে মনে করত। ওর শরীরটা কেবল একটু শক্ত হয়ে উঠছিল। অপর সবদিকে ওর কোনও পরিবর্তন ঘটেনি : সেই একই রঙ, সেই একই বক্ষমণ্ডল, গঠনের একই প্রকৃতি, সেই সুন্দর চুল, এমনকি কণ্ঠস্বরেরও কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। তারুণ্যের সেই রৌপ্যবৎ কণ্ঠস্বর। ওর সেই কণ্ঠস্বর আমাকে এমনি মোহিত করেছিল যে আজও একটি তরুণীর কণ্ঠে ওর কণ্ঠের আভাস না পেয়ে আমি পারিনে। আমার ভয় হচ্ছিল ওর প্রতি আমার আকর্ষণ শেষপর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে এবং আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। এমন হতো যে আরও অধিক বয়সে, কোনও একটু আদর-আহলাদের স্পর্শতেই আমি বিবশ হয়ে পড়তাম। আমার রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পেত এবং আমার শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠত আর তাই আমি আজও বুঝতে পারছিনে তারুণ্যের সেই প্রভাতে, দেহগত আকর্ষণ আমার এমন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। বলতে হয় একদিকে যেমন আকর্ষণ তেমনি অপরদিকে একটা ভয়ও যেন আমাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। মাঝে মাঝে মনে হতো যে তৃপ্তির জন্য আমার অস্থিরতা তা থেকে মুক্তির কি আর কোনও পথ নেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে আমি যেমন কামোদ্দীপ্ত ছিলাম, আমার দেহের রক্ত যেমন টগবগ করে ফুটত, আমার সেই বয়সের স্বাস্থ্য, মেয়েদের প্রতি আমার কামনার তীব্রতা, তথাপি কোনও দৈহিক মিলন না ঘটা : এমন করে ভাবা প্রায় অসম্ভব হলেও বাস্তবে ব্যাপারটা তো তাই ঘটেছিল। এর তো কোনও অন্যথা হয়নি। কেবল তাই নয়। তথাপি তার প্রতি আমার আকর্ষণ হ্রাস পায়নি। বরং প্রতিদিনই তার প্রতি আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ওকে না দেখলে আমার ভাল লাগত না। এক মুহূর্তও আমার চিন্তার বাইরে থাকত না। তাই বুঝতে পারিনে সেই বয়সে প্রথম ভোগের তৃপ্তির জন্য আমার কামনার তীব্রতা এত কম কেমন করে ঘটেছিল। সেই চরম মুহূর্তটির চিন্তায় আমার যতনা আনন্দের সৃষ্টি হতো তার চাইতে অধিক ভীতির উদ্রেক কেন হতো? ত্বকচ্ছেদের যে কল্পনা আমাকে উদ্বেলিত করে তোলা স্বাভাবিক ছিল, তার কল্পনা আমার মনের মধ্যে কেন একটা ঘৃণার ভাবের সৃষ্টি করত? একথা আমি বিশ্বাস করি ব্যাপারটার চিন্তায় যদি আমার মধ্যে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি না হতো, যদি একটা শালীনতার ভাব আমার কল্পনাতে আসত তাহলে ব্যাপারটাকে আমি আনন্দের সঙ্গেই উপভোগ করতে পারতাম। কিন্তু ওর প্রতি আমার আকর্ষণে কেমন যেন একটা পবিত্রতার ভাব জড়িয়ে ছিল যার ফলে সেই ভাবের কোনও প্রকার লঙ্ঘনের কথা আমি কল্পনা করতে পারতাম না।

আমি বুঝতে পারছি আমার পাঠক ইতোমধ্যেই আমার ওপর বিষম বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে এবং তারা মনে করছে আমার এমন পরস্পর বিরোধী ভাবের মূলে রয়েছে অপর কোনও লোকের সঙ্গে মেয়েটার দৈহিক সম্পর্কের ঘটনা। আর তার ফলেই মেয়েটা একদিকে যেমন আমার মনে আকর্ষণের সৃষ্টি করেছে, তেমনি অপরদিকে মেয়েটা আমার মনে একটা বিষম বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেছিল। পাঠক এমন মনে করলে ভুল করবেন। অন্যের প্রতি ওর আকর্ষণের এই বিভাগ আমার জন্য অবশ্যই বেদনাদায়ক হয়েছিল, তথাপি একথা আমি বলব না যে ওর এমন আচরণ ওর প্রতি আমার আকর্ষণকে কোনওক্রমে হ্রাস করে দিয়েছিল। আমি সত্যের দিব্যি দিয়ে বলতে পারি, বরং ওর প্রতি আমার কামনা যখন সব চাইতে কম ছিল, ওর প্রতি আমার আকর্ষণ তখনই সবচাইতে বেশি ছিল। আমি জানি ওর প্রতি আমার আকর্ষণ যখন সবচাইতে কম হতো, আমি ওর মাধুর্যের জন্য আমার আকর্ষণ সবচাইতে বেশি হতো। এটা আমি দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি, দৈহিক কোনও আকর্ষণ-বিকর্ষণের সঙ্গে ওর সম্পর্কে আমার এমন ভাবের কোনও কার্য-কারণ যুক্ত ছিল। আমি বিশ্বাস করি ওর সঙ্গে আমার এমন সম্পর্কের পরিণামে যে বিপদ আমার ঘটতে পারত, তার আতঙ্কই আমাকে ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলত। এবং তাতেই আমি রক্ষা পেয়েছি এবং সে কারণেই এই মেয়েটার অন্য মেয়ের আচরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে পৃথক করে তুলেছিল। ব্যাপারটা পরবর্তী সময়ে পরিষ্কার হবে। সমস্ত ব্যাপারটায় ওর প্রতি আমার যেমন একটা করুণার সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি আমার প্রতিও আমার একটা করুণার উদ্রেক হয়েছিল। আমার ইচ্ছা হতো আমি তাকে বলি না, মামা, ওটার আমার প্রয়োজন নেই। ওটা বাদেই আমার তৃপ্তি আমি সাধন করতে সক্ষম হবো। কিন্তু তেমন বলার সাহসও আমার হয়নি। কারণ এটা কোনও বলার ব্যাপার নয়। তাছাড়া একে আমি ঠিকও মনে করিনি। আসলে আমি জানতাম একটি মাত্র মহিলাই আমাকে অপর মহিলা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। এবং একমাত্র সেই-ই মাত্র অপর সব প্রলোভন থেকে আমাকে বাঁচাতে পারত। আমি তাই যেমন তাকে লাভ করতে না চাওয়াতে আনন্দ লাভ করেছি, তেমনি সে অপর মেয়েলোকের আকর্ষণ থেকে আমাকে রক্ষা করে আমার মনে অধিকতর আনন্দের সৃষ্টি করেছে। আর তাই এই পর্যায়ে যে কোনও দুর্ভাগ্য যখন তার থেকে আমার বিচ্ছিন্নতার কারণ হতো, তাতে আমার আনন্দ বৈ বেদনার কোনও সৃষ্টি হতো না। আমাদের উভয়ের এমন দীর্ঘ অন্তরঙ্গতা তার কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে, তার প্রতি আমার অন্তরঙ্গতাকে বৃদ্ধি করে দিত। এটা যেমন সত্য, তেমনি এ ঘটনা আমাদের উভয়ের সম্পর্কে একটা ভিন্ন মাত্রাও এনে দিত। যে মাত্রার সোহাগ এবং অন্তরঙ্গতা পূর্বেকার অন্তরঙ্গতার চাইতে অধিক বৈ অল্প হতো না। এতে দেহজ আকর্ষণ আমার হ্রাসই পেত। আমি এতদিন মামা বলে সম্বোধন করেছি, তার একটি পুত্রবৎ নৈকট্য ভোগ করেছি। ফলে আমি নিজেকে তার সন্তান বলেই গণ্য করেছি। আমার বিশ্বাস এ কারণেই তার প্রতি পুত্রের ক্ষমতা বৈ আর কোনও সম্পর্কের কথা ভাবতে পারিনি। ফলে তাকে দৈহিকভাবে পাওয়ার কোনও আগ্রহ আমার মধ্যে জন্মেনি। অথচ সে আমার এত প্রিয় ছিল। আমি বরং তার প্রতি আমার পূর্বের অনুভূতির কথা ভাবলে দেখি বর্তমানের চাইতে সেই ছোটকালেই তার প্রতি আমার দৈহিক আগ্রহ অধিক ছিল। এ্যানেসিতে তো আমি তার জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু চ্যাম্বেরিতে সে ভাবটা আমার ছিল না। তবে আমি তাকে তখনও গভীরভাবে ভালবাসতাম। কিন্তু সে ভালবাসারও ভাবটি ছিল আমি তার আগ্রহেই তাকে ভালবাসছি আমার নিজের আগ্রহে নয়। বলা চলে আমি তার কাছে শান্তি পেতাম, প্রেম নয়। সে আমার কাছে ভগ্নী বলে বোধ হতো, প্রেমিকা নয়, মায়ের চেয়ে অধিক বলে আমি তাকে ভাবতাম, বন্ধুর অধিক, এমনকি ঘরের কর্ত্রী। কিন্তু তাই বলে আমার প্রেমিকা নয়। মোটকথা তাকে আমি যথার্থই ভালবাসতাম, কিন্তু তাকে ভোগ করার জন্য নয়। আমার ভালবাসার আধিক্যে ভোগের কোনও ভাব ছিল না। সেই পর্যায়ের কথা ভাবতে গেলে এমনি আমার মনে হয়। আমার মনে এই ধারণাগুলোই স্পষ্ট হয়ে আছে।

তারপর যে দিনকে প্রত্যাশার চাইতে ভয় করেছি অধিক, সেই দিনের আগমন ঘটল। আমি যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সবকিছুই আমি তৈরি রেখেছিলাম। আর এবার যেন যথার্থই আমি প্রত্যাশার পূরণ পেলাম। এই প্রথম আমি জীবনে একজন মেয়ের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ দেখলাম। তেমন একজন মহিলাকে পেলাম যাকে আমি প্রাণভরে ভালবাসি। কিন্তু আমি এ ঘটনায় সুখী হলাম? না, তেমন আমি বলতে পারিনে। হ্যাঁ, আমি আনন্দ পেলাম বটে, তবু যেন আজও একটা বিষাদভাব আমার আনন্দকে যেন বিষাক্ত করে তুলল। আমার মনে হলো আমার মায়ের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌনমিলনে মিলিত হয়েছি। এমনি পাপবোধ আমাকে পেয়ে বসল। দু'তিনবার আমি তাকে আমার বুকে পিষ্ট করলাম। তার বুকে আমার মুখ ঘঁষে আমার চোখের জলে তার বুক ভাসিয়ে দিলাম। অথচ তার দিক থেকে যেমন কোনও বিষাদ বোধ করল না, তেমনি কোনও উত্তেজনাও নয়। সে আমাকে বুকে নিয়ে প্রশান্ত এবং মমতাময় এবং শান্ত হয়ে রইল। ফলে তার শরীরে কোনও উত্তেজনা বোধ যেমন এল না, কোনও কামের সান্ত্বনার কোনও আগ্রহ যেমন তার আচরণে প্রকাশ পেল না, তেমনি তার ব্যবহারে কোনও তৃপ্তি বোধেরও প্রকাশ ঘটল না। আবার আমার প্রতি তার কোনও ঘৃণাবোধেরও সৃষ্টি হলো না।

আমি আবার বলছি। আমার কোনও অপরাধ ছিল না। যা কিছু ঘটেছে সবই তারই কারণে ঘটেছে। তার কামনার কোনও প্রকাশে নয়। তিনি বংশগতভাবে একজন অভিজাত রমণী ছিলেন। তার হৃদয় নির্মল ছিল। তিনি ভদ্রতা কাকে বলে তা জানতেন। তার ইচ্ছায় কোনও স্থূলতা ছিল না। তার ইচ্ছা ছিল। তার চরিত্রের মধ্যেই একটা ভদ্রতার প্রকাশ ছিল। মনে হতো তিনি যেন তার হৃদয়ের চাইতে তার যুক্তির দ্বারা অধিক পরিচালিত হতেন। নীতিতে তার যে ভুল হতো না, তা নয়। কিন্তু তার অন্তরের মূল অনুভূতিতে তার সংশোধন ঘটে যেত। অবশ্য তার নিজের দর্শন সম্পর্কে তার একটা গর্ববোধ ছিল। ফলে তার অন্তরের প্রতি আর দর্শনের গৌরব এ দু'য়ের সবসময় মিলন ঘটত না।

এম দা ট্রাভেল, যিনি তার প্রথম প্রেমিক ছিল, সে তাকে দর্শন পড়াত। আর দর্শনের যে নীতিতে সে তাকে শিক্ষিত করে তুলেছিল, সেগুলো তার প্রয়োজন ছিল। কারণ এগুলো দিয়েই সে যাদের চাইত তাদের সে প্রলুব্ধ করতে পারত।

এম দা ট্রাভেল ছিল তার প্রথম প্রেমিক। এই প্রেমিকই তাকে দর্শন শিক্ষা দিত। আর তার সে দর্শন থেকে সেগুলোই তাকে শিক্ষা দিত যা তার কাজে লাগত। কিন্তু সে যখন দেখল মেয়েটা তার স্বামীভক্ত এবং তার স্বামী যা বলে তাই সে পালন করে এবং তার সঙ্গে কোনও ফস্টিনস্টিতে সে সাড়া দিতে উৎসুক নয় তখন সে তাকে নানা কুতর্কে জড়িয়ে বশ করার চেষ্টা করল এবং এর দ্বারা সে তাকে বুঝতে পারল যে, তার স্বামীর প্রতি যে আনুগত্য দেখাচ্ছে এগুলো অর্থহীন। এগুলো যা সে করছে তা কেবল বাচ্চাদের মানায়, তাকে নয়। দৈহিক সঙ্গম তেমন কোনও খারাপ জিনিস নয়। এবং দাম্পত্য অন্তরঙ্গতার কোনও মূল্য নেই। সব মেয়েলোক একই রকম। সে কেবল তাই করে তার স্বামী তাকে যা করতে বলে, এর অধিক কিছু নয়। আর তাই তার সঙ্গেও যদি তেমন কিছু করে তাতে তার দাম্পত্য আনুগত্যের কোনও ক্ষতি হবে না। মোটকথা সে মেয়েটাকে এমনি করে বশ করে ফেলল। মেয়েটার সঙ্গে তার এমন আচরণে সে কোনও অপরাধ বা পাপ বোধ করল না। তার স্বামীর দিক থেকে বলা যায়, তার স্ত্রীর এমন আচরণে সে ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলেছে, এর অধিক কিছু আর করতে পারেনি। পরবর্তী যে পাদ্রী তার শিক্ষক হয়েছিল সেও ওই একই রূপ আচরণ করেছে। ফলে মেয়েটার মধ্যে যে নিস্পৃহতা আদিতে ছিল এবং যা তাকে এরকম বদমাশের হাত থেকে রক্ষা করতে পারত, সেই নিস্পৃতাই তাকে বদমাশটার জালের মধ্যে আরও টেনে নিল। মেয়েটা আদৌ এটা বুঝতে পারেনি যে, যে আচরণে সে নিজে নিস্পৃহ অপর কেউ তার দ্বারা কেমন করে উত্তেজিত হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটার এই ভিত্তিহীন নীতিগুলোকে সে আদৌ ব্যবহার না করে ছাড়েনি। তবে এর অনেকগুলোকে সে অপব্যবহারই করেছে এবং তাতে অপরের যা লাভ হয়েছে তার চেয়ে তার নিজের ক্ষতি হয়েছে বেশি। তার একটা বিশ্বাস ছিল কোনও মেয়েলোক ধরা দিলে কোনও পুরুষ তাকে না ধরে পারে না। তার প্রেমিকদের জন্য তার ভালবাসাকে সে বন্ধুত্ব বলে মনে করত। তবু সে ভালবাসার কমনীয়তার গভীরতা এত ছিল যে সেগুলোকে যথাসাধ্য অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তাদের সে ব্যবহার করতে চাইত। আমার কাছে যা আশ্চর্য মনে হতো সে হচ্ছে এই যে, মেয়েটার নমনীয়তা যথার্থই বিস্ময়কর ছিল। ফলে যে কেউ ওর অন্তরঙ্গতায় আসত। সে ওকে ভাল না বেসে পারত না। আর একটা ব্যাপারেও লক্ষযোগ্য ছিল যে, কারোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হলে, মেয়েটা তাকে বাদে অপর কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিত না। অথচ যারা ওর ঘনিষ্ঠতার কামনা করত তারা হেলা-ফেলার লোক ছিল না। কিন্তু এমন কেউ ওর প্রতিষ্ঠাতা লাভে সক্ষম হতো না। কিন্তু ও নিজে ছিল অনিরুদ্ধ। একবার কারোর প্রতি নজর পড়লে তাকে সে দখল না করে ছাড়ত না। এমন যদি হতো যে এমন কারোর ওপর নজর পড়েছে, যে ওর যোগ্য নয়, তার কারণ ওর কোনও অবাঞ্ছিত কামনা নয়, বরং তার মূলে থাকত একই অনন্য ধৈর্য, সহনশীলতা এবং মমতাময় অনুভূতি। আসলে ও নিজের অনুভূতির উপযুক্ত মূল্য ও নিজেই জানত না।

আমি বলব কারোর ব্যাপারে ও যদি প্রাপ্তির মধ্যে থেকেও থাকে, তবে সেগুলো বাদ দিয়ে তার অপর আচরণগুলোর অনন্যতার জন্য ওকে ধন্যবাদ দেয়া ছাড়া আমার উপায় থাকত না। ওর দুর্বলতা যাই থাক্, তার কোনওটাতে ওর দেহজ কোনও কামনার প্রকাশ ঘটতে দেখা যেত না। এমনি ছিল ওর মনের মমতা। একই লোক যদি ওকে মানসিকভাবে আঘাত করত, সেই লোকই আবার ওকে পুরস্কৃত না করেও পারত না। ওর কোনও ভ্রান্তিকেও আমার মনে হতো প্রশংসার ব্যাপার। ওর ভুলের কারণে অবাঞ্ছিত যে কিছু করত না তা নয়, কিন্তু তার এরূপ কোনও কাজকে আমি ইচ্ছাকৃত বলে মনে করতে পারতাম না। মিথ্যে বলার ওর কোনও অভ্যাস ছিল না। ওর কোনও দ্বিচারণের স্বভাব ছিল না। ওর মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা আমি দেখিনি। আমি আর কীভাবে ওর পক্ষে সুপারিশ করতে পারি। আমি বরং বলব ওর প্রতি সত্রেটিসেরও যদি দৃষ্টি পড়ত, তবে তার এই মাদাম দ্য ওয়ারেনসকে ভাল না বেসে উপায় থাকত না। সে তাকে সম্মানের সঙ্গেই ভালবাসত।...

আমি জানিনে, ক্লদ আনেত আমাদের এমন অন্তরঙ্গতার ব্যাপার জানতেন কী-না। আমার মনে হয় তিনি জানতেন। কারণ তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ ছিলেন। আবার সুবিবেচকও ছিলেন। তিনি কখনও এমন কিছু বলতেন না, যা তিনি বলার কথা ভাবেননি। আবার এও ঠিক যে তিনি যা ভাবতেন তা সব বলতেন না। আমাদের ব্যাপারটা তিনি জানতেন তার বিন্দুমাত্র আভাস আমাকে না দিয়ে তার আচরণে তিনি বুঝিয়ে দিতেন যে, তিনি সব জানেন। তার এমন আচরণের পেছনে কোনও হীনতা ছিল না। এর কারণ নিশ্চয়ই এই ছিল যে, তিনি তার প্রিয়তমার আচরণকে স্বীকার করার পরে তার বিরোধিতা করার কথা ভাবতে পারতেন না। যদিও তিনি তার স্ত্রীর চেয়ে অধিক বয়সের ছিলেন না, তবু মনে হতো তিনি আমাদের দু'জনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারই দু'টি শিশু বলে গণ্য করতেন। দু'টি শিশুকে প্রশ্রয় দিতে তার যেন বাঁধত না। আর তাকে শ্রদ্ধা করতেও আমাদের কোনও দ্বিধা হতো না। তার প্রশ্রয় পাওয়ার জন্যও আমাদের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমি নিজের দিক থেকে বলতে পারি তার স্বামীর প্রতি তার অবিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়ার পূর্বে আমিও বুঝতে পারিনি, সে তার স্বামীকে কত গভীরভাবে ভালবাসে। মাদাম জানত, সে আমার জীবনে নি:শ্বাস-প্রশ্বাসসম, তথাপি সে তার স্বামীকে কত গভীরভাবে ভালবাসে তা আমাকে দেখাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না। তার এমন আচরণের ইচ্ছাও ছিল যেন আমি তার স্বামীকে তার মতোই গভীরভাবে ভালবাসি। এবং তাই সে আমার প্রতি সখ্যের তত মূল্য দিত না, যত সে তার স্বামীর প্রতি তার ভালবাসাকে গণ্য করত। আর তাই আমার ক্ষেত্রে তার সখ্য আর তার স্বামীর ক্ষেত্রে ছিল তার ভালবাসা। এ কথাটা আমি বুঝতাম। কারণ আমি তাকে সখ্যই মাত্র দিতে পারতাম, ভালবাসা নয়। আমি স্মরণ করছি কতবার মাদাম আমাকে আলিঙ্গন করেছে, তার চোখের জলে আমার বুককে ভাসিয়ে আবার একই সঙ্গে আমাকে বুঝিয়েছে, আমি এবং তার স্বামী দু'জনকেই তার জীবনে বাঁচার জন্য সমানভাবেই আবশ্যক। আমার এ কাহিনীকে আমার পাঠকবৃন্দ ঈর্ষাহীনভাবে পাঠ করতে পারবে না। তার এরূপ অস্বাভাবিক মনোভাবে কোনও কৃত্রিমতা ছিল না। এটা তার অন্তরের অমলীন বিশ্বাসই ছিল।

এটাই মাদামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। আমি যথার্থই মনে করি এমন সম্পর্ক অসাধারণই হয়। এবং এমন সম্পর্কের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দুর্লভ। আমাদের দু'জনের এমনি ছিল, প্রেম, প্রীতি ভালবাসা। আমাদের দু'জনের প্রীতির এই ছিল বিশ্ব, এর বাইরে কিছু নয়। সমস্ত জগৎকে বাদ দিয়ে আমাদের তিনের এই মিলনের অচ্ছেদ্যতা এমনি দৃঢ় ছিল যে, আমাদের ভোজনের টেবিলে আমাদের কোনও একজন যদি থাকত অনুপস্থিত, কিংবা অপর কেউ যদি এসে উপস্থিত হতো তবে আমাদের এমন সঙ্গোপন একেবারে ছত্রছন্ন হয়ে যেত। আমরা তিনজনে আমাদের আচরণে এমন অবাধ হতাম তার কারণ ছিল আমাদের পরস্পরের প্রতি এক গভীর বিশ্বাস। আর তাছাড়া আমাদের সহবাসের এমন জীবনে যে কখনও কোনও ক্লান্তি আসত না, তার কারণ আমাদের মনে কখনও কোনও শূন্যতা ঘটত না। একটা কিংবা অন্য একটা কাজে আমরা তিনজনই ব্যস্ত থাকতাম। মামা সব সময়ে কোনও না কোনও বিষয়ের পরিকল্পনা করতেন এবং সবসময়ই কর্মব্যস্ত থাকতেন। ফলে আমরা দু'জনের কেউই কর্মহীন থাকতে পারতাম না। তাছাড়া সব সময়ই আমাদের কোনও না কোনও কাজ থাকত। ফলে কোনও সময়ই আমাদের সময়ের শূন্যতা ঘটত না। আমি তো মনে করি কর্মহীনতা হচ্ছে আমাদের সমাজের এবং একাকিত্বের অন্যতম কারণ। এছাড়া অন্যকিছু মনের মধ্যে এমন শূন্যতার সৃষ্টি করে না। গান, গল্প, ঝগড়াঝাটি : কোনওকিছুই কর্মহীনতার মতো মানসিক শূন্যতা সৃষ্টি করে না। যাদের কোনও কাজ থাকে না তারাই শব্দহীনভাবে একটা ঘরে যেন আবদ্ধ থাকে আর সে কারণেই মানুষ অর্থহীন চিৎকার, গালাগালি আর বকবকুনিতে লিপ্ত হয়। মানুষ যখন সর্বক্ষণ কর্মে ব্যস্ত থাকে তখন একজন মানুষ অপর একজনের সঙ্গে কাজের প্রয়োজনে কাজের কথাই বলে। কর্মহীনরা সর্বক্ষণ শব্দ তৈরির রোগে ভোগে : কিচিরমিচির শব্দ করে। অর্থহীন শব্দের উচ্চারণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বরং আরও বলব, কর্মহীনরা সবচাইতে ক্লান্তিতে ভোগে। মানুষের পারস্পরিক সঙ্গ কর্মের মধ্যেই মাত্র সুখের হয়ে উঠতে পারে। আসলে মানুষের কেবল যে সর্বদা কর্মরত থাকা আবশ্যক তাই নয়, তার এমন কর্মের প্রয়োজন যে কর্মের জন্য তার চিন্তার প্রয়োজন। মেয়েরা সেলাই কর্মে নাকি দক্ষ! আমি তো মনে করি এমন কর্মের মতো অর্থহীন কর্ম আর কিছু হতে পারে না। একজন সেলাইরত মেয়েকে তুমি কখনও সহজে তোমার দিকে আকৃষ্ট করে তুলতে পারবে না। হাত গুটিয়ে বসে থাকা আর সেলাইতে ব্রত থাকা একই ব্যাপার। সেলাই শিল্পের কথা আমি বলছিনে। সেলাই শিল্পের মানুষকে নি:শব্দতার ব্যাপার নিয়েও কর্মের চিন্তা করতে হয়...

আমি যখন মতিয়েরে ছিলাম, আমি তখন প্রতিবেশী কারোর বাড়িতে যেতাম তাদের ফিতা বানিয়ে দিতে।

আমাকে যদি আবার পেছনের জগতে ফিরে যেতে হয় তবে আমি অবশ্য আমার জামার পকেটে একটা বাটি আর বল পুরে রাখব যেন আমার শব্দ করার প্রয়োজন হলে ও দুটোকে টুংটাং করে আমি বাজাতে পারি। আমার মতো সব মানুষেরই হাতে সবসময়ে একটি বাটি আর কাঠি থাকত, তবে তাদের মন এমন বিদ্বেষপূর্ণ হতে পারত না। সবাই এই নীতিটি অনুসরণ করলে যথার্থই মানুষের মধ্যে সখ্য অধিকতর আনন্দময় হয়ে উঠত। মোটকথা, আমার এমন কথায় যে কেউ হাসতে পারে। তবু আমি বলব, মানুষের জগতে এখন যে নীতিহীনতা চলছে, তার সংশোধনের একটিই মাত্র পথ রয়েছে : বাটি আর কাঠির একটি বল।

[ক্রুদ আনেত মারা গেল এবং রুশো তার জিনিসপত্র ভরতি আলমারিটা পেয়ে খুব খুশি হলো। এই অবস্থায় মাদাম দ্য ওয়ারেন্স তার আর্থিক সমস্যা সমাধানে অধিকতরভাবে অক্ষম হয়ে পড়লেন। রুশো নিজের জীবিকার জন্য বাদ্যযন্ত্র হারমনি বানানো শিখতে শুরু করল। তার জন্য সে বেসানকন গেল। কিন্তু রাষ্ট্রের সীমানায় পুলিশ তার জিনিসপত্রের বাক্স বাজেয়াপ্ত করল এবং সে চেম্বারীতে ফিরে এল। এই পর্যায়ে রুশো তার কাহিনীতে দু'জন ব্যক্তির বর্ণনা দিচ্ছে : গকেনকোর্ট এবং দা কনজি।]

আমার ভেতরে ইতোমধ্যে সাহিত্য এবং দর্শনের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তা বেশ মাথাচাড়া দিতে শুরু করল। কেবল দরকার হলো এদের একটু উৎসাহ দান, তাদের পূর্ণ বিকাশের জন্য। এবং তার অভাবও ঘটল না। এক মশিয়ে দা কনজির দেখলাম এদিকে মানে সঙ্গীতে বেশ একটু দক্ষতা আছে। এটিকে আমি কাজে লাগাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার শেখার সময়টা সঙ্গীতের গৎ শোনানো ব্যতীত বাকি সবকিছুতেই ব্যয় হতে লাগল। আমরা এক সঙ্গেই প্রাতরাশ করতাম। আমরা দু'জনে মিলে কথা বলতাম নানা বিষয়ে। নতুন পত্র-পত্রিকা বই পাঠ করতে শুরু করলাম। কিন্তু সঙ্গীতের ধারে কাছেও যেতাম না। এই সময়ে দেখলাম প্রুশিয়ার যুবরাজের নিকট লিখিত ভলটেয়ারের পত্রাবলি বেশ আলোচিত হচ্ছে। আমরা দু'জনে মাঝে মাঝে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতে শুরু করলাম। এ দু'ব্যক্তিই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। যুবরাজ তখন মাত্র সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। এদের একজন শিগগিরই তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার নিশ্চিত ধারণা প্রকাশ করতে লাগলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরজন তথা ভলটেয়ারের ভাগ্যে আজকের মতোই যেমন প্রশংসা তেমনি দুর্নাম জুটতে দেরি হলো না। আমরা দু'জনেই এই বেচারির দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখবোধ করতে লাগলাম। অবশ্য আমরা এটাও বুঝলাম যে এটার মধ্যেও কিছু আছে। কারণ যাদের মধ্যে কিছু থাকে তাদেরই বিরুদ্ধে দুর্নাম রটে। যুবরাজের ভাগ্যে তার কিশোরকালে তেমন সুখ জোটেনি। আর ভলটেয়ারের সারা জীবনে সুখ বলে কিছু ছিল না। কিন্তু আমরা দু'জনেই এই দু'জনের সব বিষয়েই উৎসাহিত বোধ করতে লাগলাম। ভলটেয়ারের কোনও রচনাই আমাদের নজর এড়াল না। ভলটেয়ারের এই পাঠে আমিও কিছু লিখতে উদ্বুদ্ধ বোধ করতে লাগলাম। এর লেখার ক্ষমতার যে বৈচিত্র্য তা আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল। এর কিছুকাল পরে তার দার্শনিক পত্রাবলি প্রকাশিত হলো। এটা যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা তা আমি বলিনে। তবু তার এই রচনা সেদিন আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আমি তা পাঠ করতে শুরু করলাম। এবং সে সময় থেকে ভলটেয়ারের কাছ থেকে আমি আর দূরে যেতে পারলাম না।

কিন্তু ভলটেয়ারে পুরো নিবদ্ধ হওয়ার সময় তখনও আমার আসেনি। তবু তাতে চোখ বোলানোর ক্ষমতা আমার জন্মেছিল। এই দক্ষতার কিছুটা আমি মাদাম ওয়ারেনস-এর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার সময়ে জন্মেছিল। অবশ্য তখনও ভলটেয়ারকে পুরো অনুধাবনের ক্ষমতা আসেনি। তার জমিদারিতে শত শত মানুষের জমায়েত ঘটত। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের আশাতেই আসত। তারা মাদামকে নানাভাবে প্ররোচণার চেষ্টা করত। মাদাম ওয়ারেনস-এর এমন দুর্দশা দেখে আমি কষ্ট পেতাম। এই সময়ে মাদাম আমাকে তার ব্যক্তিগত সহকারিতে নিযুক্ত করেছিলেন। আমার এই দায়িত্বের ভিত্তিতে আমি মাদামের সব বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে শুরু করলাম। আমি দেখলাম মাদামের বিষয়-সম্পত্তির অবস্থা দিনে দিনে অধিকতর খারাপ হয়ে পড়ছে। সংকট ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাকে কঠোর হওয়ার জন্য শতবার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি বকলাম, তার হাত ধরে অনুরোধ করতে লাগলাম, কিন্তু কিছুতেই ফল হলো না। আমি তার পায়ে পড়লাম। বললাম, মামা, খরচপাতি কমান। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে বললাম, আমরা ভয়ানক সঙ্কটে পড়েছি। আমি বললাম, আমি আপনার পাশে থাকব। যে কষ্ট আমার করা দরকার সেই কষ্ট আমি করব। বললাম : আমাদের খরচ বাড়ালে আমরা নিষ্কৃতি পাব না। আমার এমন আচরণে তার পার্শ্বচররা আমার উপর বিরূপ হয়ে উঠল। তার এই বৃদ্ধ বয়সে তার এমনভাবে সম্পদের ব্যয় করা উচিত নয়। আমার আন্তরিকতায় যেন মুগ্ধ হলেন এবং আমার কথামতো আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে তার কিছু দুর্বৃত্তের আগমন ঘটল অমনি তিনি তার সব প্রতিশ্রুতি যেন ভুলে গেলেন। দুর্ঘটনার হাজার প্রমাণ আমি দেখাতে লাগলাম। তবু কোনও কাজ হলো না। এই অবস্থায় আমার চোখ বন্ধ করে থাকা ছাড়া আর কী উপায় থাকতে পারে। যে গৃহকে আমি রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছিলাম, সে গৃহ পরিত্যাগ করা ছাড়া আমার আর কী উপায় ছিল? আমি মামার আবাস পরিত্যাগ করে নিয়ন, জেনেভা ছেড়ে লিয়নসে গেলাম যেন মাদামের ক্রমবর্ধমান দুরবস্থাকে আমার দেখতে না হয়। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি অপ্রয়োজনীয় যে কোনও সংখ্যক কর্মচারী ছাঁটাই করতে আমি রাজি হতাম। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ তো কেবল আমার ব্যক্তিগত কৃচ্ছ্রতার ব্যাপার ছিল না। আমি যতই কৃচ্ছ্রতার আশ্রয় নিলাম, দেখলাম তার সবই ওইসব নচ্ছারদের হাতে গিয়ে জমা হচ্ছে। তার এমন উদারতাকে আঘাত দিয়ে কথাও বললাম।... অবশেষে আসন্ন হত্যাকাণ্ডে নিহত হওয়ার কুকুর প্রায় আমি আমার দ্রব্যাদির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র টুকরাগুলোকে নিয়ে মামার সেই গৃহ পরিত্যাগ করলাম।

এই অবস্থাতে আমার প্রায় দু'বছর কিংবা তিন বছর কাটল। আমি এ কাজ থেকে ও কাজে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাত লাগালাম। এখান থেকে ওখানে গেলাম। সাহিত্যের পাঠ শুরু করলাম। তার আলোচনাতেও যোগ দিলাম। অর্থ বুঝি আর না বুঝি তার শব্দ নিয়ে কারিগরি করা শুরু করলাম। জেনেভার পথে একবার আমি বার কয়েক আমার পুরাতন সুহৃদ মশিয়ে সাইমনের কাছেও গেলাম। তিনি নানা ধরনের সাহিত্য জগতে খবর দিয়ে আমার সাহিত্যের আগ্রহকে উদ্দীপিত করে তুললেন। চ্যামবেরিতে আমি প্রায়ই জ্যাকোবিন পন্থী একজন জ্যাকোবিন পদার্থবিদের কাছেও যেতাম। অত্যন্ত ভদ্র মেজাজের একজন ভিক্ষু ছিলেন তিনি। আজ তার নাম ভুলে গেছি। তিনি আমাকে নিয়ে নানা প্রকার পরীক্ষার চেষ্টা করতেন। তাতে আমারও আমোদ লাগত। তার নির্দেশে আমি একরকম রাসায়নিক কালি বানাতে সক্ষম হলাম। এক প্রকার চুন, জল আর অরপিনেন্ট মিশিয়ে একটা তরল পদার্থ বানালাম। একটা বোতলে ভরে মুখ বন্ধ করে ওটাকে ঝাকুনি দিতে বোতলটা বাষ্পের চাপে ফেটে গেল। আমি দ্রুত আটকানো বোতলটার মুখ খুলতে গেলাম। কিন্তু তার মুখ খোলার আগেই বোতলটা দরাম করে একটা বোমার শব্দে ফেটে গেল। আমার চোখে মুখে সেই বোতলের চুন আর অরপিনেন্ট এত পরিমাণ লেগেছিল যে, আমি প্রায় মারা যাচ্ছিলাম। এর ফলে আমি প্রায় ছয় সপ্তাহ কিছু দেখতেই পাইনি। সেখানেই আমার বিজ্ঞানের কিছুমাত্র না জেনে বিজ্ঞান নিয়ে আমার খেলার শেষ।

বিজ্ঞানের পরীক্ষাটা আমার স্বাস্থ্যের নিদারুণ ক্ষতি করেছিল। আমার শরীর ইতিপূর্বেই বেশ খারাপ যাচ্ছিল। অথচ আমার দৈহিক কাঠামো তো ভালই ছিল। আমি কোনও কিছুই বেসামাল চর্চাও করিনি। তথাপি গায়ে-পায়ে আমি বেশ শুকিয়ে যেতে লাগলাম। আমার শরীরের গঠন বেশ শক্তই ছিল। আমার বুকের পাটাও বড় ছিল। তা সত্ত্বেও আমার শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। একটা দমবন্ধ ভাব এল, বুকের ধরফরানি বাড়ল এবং রক্তবমি হলো। মাঝে মাঝে জ্বর হতে লাগল। এই জ্বরের উপসর্গ থেকে আমি আজ পর্যন্ত মুক্ত হতে পারিনি। এই সময়টা নিয়ে ভাবতে আমার খারাপ লাগে। আমার সেই সুকুমার বয়সে শরীরে আমার কেমন করে এই অবস্থা হলো, তা আমি ভাবতে পারিনে। আমি কোনও খারাপ কাজ করিনি। শরীরের ভেতরে কোনও আঘাতও লাগেনি, স্বাস্থ্য নষ্ট করার কোনও কাজও আমি করিনি। তথাপি এই সময়টাতে আমার দুর্ভোগই ঘটেছিল।

অনেক সময় এমন বলা হয় যে, তলোয়ারের খাপটাও তলোয়ারের ভেতরটাকে নষ্ট করে দিতে পারে। আমার ইতিহাসও তাই বলছে। আমি এক আবেগসর্বস্ব মানুষ। এই আবেগ নিয়েই আমি জীবনধারণ করেছি। আর এই সব আবেগই আমাকে শেষ করেছে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, যে আবেগের কথা বলছি, কী সে আবেগ— তাহলে বলব না, কোনও মহৎ বা বৃহৎ আবেগ নয়। তবু আমার মনে হতো এ যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেলেন উদ্ধারের এক আবেগ কিংবা বিশ্বের সিংহাসন হারাবার আশঙ্কার এক আবেগ।

মেয়ে ব্যাপার বলে একটা ব্যাপার তো ছিলই। একটিকে পেলে আমার ইন্দ্রিয়াদি শান্তই থাকত। কিন্তু তাতে আমার শান্তি আসত না। ইন্দ্রিয়ভোগের মধ্যেও ভালবাসার আকর্ষণ আমাকে কুড়ে কুড়ে খেত। আমার তো কোমলমতি এক মা ছিল, একজন প্রিয় বন্ধু ছিল, তারপরও আমার একটি প্রণয়ীর প্রয়োজন ছিল, আমার ভালবাসার পাত্রী। কেউ এমন না থাকলেও আমি তার কথা চিন্তা করতাম। আমি মনে করতাম সে আমার হাতের কাছে, হৃদয়ের কাছে আছে আর আমি তাকে হাজার রকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেন দেখছি। হোক এ আত্মভ্রম, তবু এ থেকে আমার নিষ্কৃতি ছিল না। আমার কাছে যদি মামা থাকত, তবে আমি তাকে মনে করতাম সে আমার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ আছে। আমি যেন তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছি। এটা ঘটনা না হলেও এই চিন্তাকে আমি ঘটনা বলে মনে করতাম এবং তাতেই আমার সকল উত্তেজনার প্রশমন ঘটত। স্নেহে-মমতায় আমার কান্না পেত, কিন্তু তাতে আমার এমন প্রশান্তি ঘটত না। আমি জানি না অপর কারোর মনে এমন ঘটে কী না। আমি কখনও যদি এমন প্রেমের সাক্ষাৎ পেতাম তাহলে তেমন ভালবাসার তীব্রতাকে আমার এই কৃশ দেহ বহন করতে পারত কী না তা আমি বলতে পারিনে। সেই ভালবাসার তীব্রতায় বাঁচার চাইতে তৎক্ষণাৎ মরে যেতেই আমি ভালবাসতাম।

এভাবে আমি মাদাম ওয়ারেনস, মানে মামার যন্ত্রণায় আমি মরে যাচ্ছিলাম। আমার সামনে কী লক্ষ্য তাও আমি জানতাম না। আর সেজন্যই এই অবস্থা আমাকে যেন শেষ করে ফেলছিল। আমার অস্থিরতার শেষ ছিল না। মামার ঘর-সংসারের অবস্থা দেখে আমি হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। এমন অবস্থায় তার আচরণ তার জন্য আরও আত্মঘাতী হয়ে পড়ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম কিছুদিনের মধ্যেই মামা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। আমার নির্দয় এমন কল্পনা সবসময়ই সত্য হয়ে দাঁড়াত। মামার ক্ষেত্রে এর পরিণতির যে আর কোনও ব্যতিক্রম হবে না তা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার নিজের দুর্গতি আর অনটনেরও শেষ ছিল না। এর ফলে যে মামাকে আমি জীবন দিয়ে ভালবেসেছি তার কাছ থেকে যে আমার বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে তার নিশ্চয়তাকেও আমি বুঝতে পারছিলাম। আমার জীবন দিয়ে যাকে ভালবেসেছিলাম তাকে বাদ দিয়ে যে আমি বাঁচব না তাও আমি বুঝতে পারছিলাম। তাকে বাদ দিয়ে আমার জীবনে আনন্দের সন্ধান কোথায় কী করে পাব? এভাবে আমার আত্মার অস্থিরতার শেষ ছিল না। একদিকে আমার জীবনের কামনা, অপরদিকে এক অসীম শূন্যতা আর ভীতি আমাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করে ফেলছিল।

সঙ্গীত ছিল আমার জীবনের আর এক আকর্ষণ। সে অবশ্য এত তীব্র ছিল না। তবু সে সঙ্গীতে যেভাবে ডুবে গেলাম তাও আমার অস্তিত্বকে কম ক্ষত-বিক্ষত করল না।... কত সঙ্গীত যে আমি রাতের পর রাত রচনা করতে লাগলাম আবার তার নকল করতেও আমার শ্রম কম ব্যয় হলো না।... ক্লিভল্যান্ডকে আমি গোগ্রাসে গিলেছি। আমার নিজের রচনাকে বাদ দিয়ে এইভাবে ভিন্নতর জিনিসের পেছনে আমি নিজেকে ক্ষয় করেছি।

চাম্বেরিতে এম বাগারেত নামে একটি লোক পেয়েছিলাম। এ লোক রাশিয়ার সম্রাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিটারের দরবারে নিযুক্ত হয়েছিল। এ ব্যাটা যেমন একটা বদমাশ ছিল, তেমনি একটা মূর্খও ছিল। জীবনে এরূপ লোক আমি খুব কমই দেখেছি।

এই লোকটা কোনও একটা মামলার ব্যাপারে চাম্বেরিতে এসেছিল। আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই ঘটল। মাদামের ওপর তার দৃষ্টি পড়ল। আকর্ষণীয় কোনওকিছু মামাকে প্রদানের বিনিময়ে তার যা কিছু ক্রাউন অবশিষ্ট ছিল তাও একটার পর একটা সরিয়ে তাকে নি:শেষ করে ফেলল। আমি লোকটাকে যে পছন্দ করতাম না, তা সে বুঝত। আমার সারল্যের সুযোগ নিয়ে লোকটা আমাকে পটাবার জন্য কোনও গর্হিত কাজ থেকেই নিবৃত থাকল না। একবার সে আমাকে দাবা খেলা শেখাবার প্রস্তাব দিল। ও নিজে যে দাবা তেমন জানত তা নয়। আমার নিজের খুব ইচ্ছা না থাকলেও আমিও দু'একবার চেষ্টা করলাম। আমি দাবার চাল কিছু শিখেছিলাম। কিন্তু তেমন দক্ষতার সঙ্গে নয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমি বেশ দক্ষ হয়ে উঠলাম। এবং প্রথম খেলার পরের খেলাতে আমি তাকে আমার নৌকার চালে মাত করে দিলাম। এতেই আমি পাগল হয়ে গেলাম। তখন থেকে আমি দাবায় মত্ত হয়ে উঠলাম। আমি দাবার একটা বোর্ড কিনে ফেললাম এবং দাবা খেলার একখানি বইও! আমি নিজের ঘর বন্ধ করে নিজেই নিজের সঙ্গে চাল, পাল্টা চালের খেলা খেলতে লাগলাম। এরপর বিরামহীনভাবে আমার এই দাবার পাগলামি চলতে লাগল। এই অবিশ্বাস্য কাণ্ডের পরে একেবারে শীর্ণকায় হয়ে আমি একদিন একটা ক্যাফেতে গেলাম। এটাও ছিল দাবা খেলার ক্যাফে। আমি আবার শুরু করলাম : সেই বারগারেতের সঙ্গেই। কিন্তু লোকটা একটার পর একটা খেলায় আমাকে মাত করতে লাগল। আমিও ক্ষেপে গিয়ে এমন পাগলামি করতে লাগলাম যে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। সমস্ত চাল আমার মাথার মধ্যে একটার সঙ্গে একটা মিশে গিয়ে আমাকে দিশেহারা করে ফেলল। তবু আমি ছাড়লাম না। এর ফল দাঁড়াল এই যে আমার শরীর আগের চাইতেও কাহিল হয়ে পড়ল। তারপর আমি যতই দাবার চর্চা করলাম না কেন দাবা খেলায় আমি আর বিন্দুমাত্র উন্নতি করতে সক্ষম হলাম না। আমার চেষ্টাতেও কিছু হলো না। এমনি ছিল আমার দাবার মূর্খতার একগুঁয়েমি। শেষপর্যন্ত দাবার ঘর থেকে যখন আমি বেরিয়ে এলাম তখন আমি একটা কঙ্কাল বৈ আর কিছু ছিলাম না। আমি যদি এভাবে আরও চালাতাম তাহলে আমি যে একেবারে শেষ হয়ে যেতাম তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। আমার সেই কিশোর বয়সে এমন পাগলামিতে আমার শেষ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।

আমার স্বাস্থ্যের এমন অধোগতি আমার মন-মেজাজকেও খারাপ করে তুলল। আমার কল্পনার তেজ এবং আগ্রহের হ্রাস ঘটতে লাগল। আর শরীরের দুর্বলতার কারণে আমার আচরণে যেন উচ্ছ্বাসেরও অভাব ঘটল, এখন কেবল ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে লাগলাম। আগে ঘুরে বেড়াবার যে আগ্রহ ছিল তাও যেন উবে গেল। ঘরে বসে বসে মানসিক ক্লান্তির চাইতেও মানসিক বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগলাম। আবেগের স্থানে যেন মৃগী রোগের শিকারে পরিণত হতে লাগলাম। যেটা ছিল জড়তা, তা একটা অবসাদে পর্যবসিত হতে লাগল। মনে হতো লাগল জীবনটা ভোগ করার আশাই যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমার মমতাময়ী মাদামকে ফেলে যাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে আমার বুক ভরে উঠল। যে দুরবস্থায় সে পতিত হচ্ছিল, তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন অসহায় ফেলে যাওয়াতে দুঃখ আর বিষাদ ছাড়া আর কোনও অনুভূতি ছিল বলে আমার মনে হলো না। এমন মানসিক অবস্থায় আমি রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আর এমন অবস্থায় মাদাম আমাকে পূর্বের চাইতে অধিক আন্তরিকতার সঙ্গে আমার শুশ্রূষা করতে লাগলেন, যেন আমি তার কাছে একটি দুর্বল শিশুতে পরিণত হয়ে গেলাম। কোনও মা-ই তার শিশুকে এর অধিক মমতা দিয়ে শুশ্রূষা করতে পারত বলে আমি মনে করতে পারলাম না। এতে অবশ্য তারও একটু ভাল হলো। মাদাম আগে নানা পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকতেন। এখন আর তেমন নানা কল্পনায় উদব্যস্ত রইলেন না। এতে তাকে ঘিরে ছিল যে দুর্বৃত্তবৃন্দ তারাও ভেগে পড়তে লাগল। এমন সময়ে মৃত্যু এলে আমি তাকে স্বাগত জানাতাম। আমার তখন মৃত্যুকে সুন্দর মনে হতো। জীবনের ভাল বেশি ভোগ যদি আমি নাও করে থাকি : জীবনের মন্দের ভাগ্যও আমার তেমন ঘটেনি। মানুষের অন্যায় আর অসততাকে পরিত্যাগ করে যেতে আমার তখন কোনও কষ্ট হতো না। মানুষের কৃত অন্যায় আর অমানুষিকতাই মানুষের মৃত্যুকে অধিকভাবে বিষাক্ত করে তোলে। আমার মৃত্যুকে তখন মনে হতো খারাপের চাইতে ভাল। এমন ভাল মৃত্যুকে তখন আমি মৃত্যু বলেই মনে করতাম। হায়! তখন যদি আমি আমার এমন মমতাময়ীর কোলে যথার্থই মরে যেতে পারতাম। তার অনিবার্য দুরবস্থা এবং দুর্ভাগ্যের জন্য যদি আমি বিষণ্ণতায় আপ্লুত না হতাম, তাহলে তখন আমি তার বুকে ঘুমিয়ে পড়ার মতোই আমি শান্তিতে নিদ্রায় ঢলে পড়তে পারতাম। কিন্তু তার দুরবস্থার আশঙ্কা তার জন্য আমার মনের বিষণ্ণতাকে দৃঢ়তার জন্য একটা মায়া এবং মমতায় আমাকে ভরে তুলত। আমি একদিন বললাম, মা মণি, আমি তোমার হাতের পুতুল। আমার সমগ্র অস্তিত্ব তোমার অস্তিত্বে নিহিত। মা মণি, আমার অস্তিত্বকে তুমি আনন্দিত করে তোল। আমার অবস্থা আরও খারাপ হলে, দু'এক রাত আমি নিজেকে কোনও রকমে টেনে টেনে মাদামের কক্ষে ঢুকেছিলাম, তার কী করা উচিত সে কথা বলতে। আমি ভেবেছিলাম, তার ভালর জন্য তাকে আমার একথা বলা দরকার। কিন্তু আমার আচরণে আমার মুখের কথার চাইতে তার প্রতি আমার সোহাগ আর ভালবাসার প্রকাশ ঘটল অধিক। তার শয্যায় আমি উঠে বসেছিলাম। কিন্তু তার জন্য আমার চোখে জল ছাড়া আর কিছু তো ছিল না। আমারও মনে হলো আমার চোখের জলই হচ্ছে তাকে আমার দেয়। তার হাত দু'টিকে আমার হাতের মধ্যে তুলে নিলাম। আমার মনে হলো তার হাত দু'টি ধরতেই আমি যেন আমার অস্তিত্বে শক্তি পেলাম। আমাদের দু'জনের কথায় কথায় আমাদের রাত কেটে গেল। পরে আমি যখন তাকে শুইয়ে রেখে তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন আমি যেন তার কক্ষে প্রবেশের সময়ের চাইতে অধিক শক্তি বোধ করতে লাগলাম। তিনি আমার সব দাবি মেনে নিলেন। আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি আমার কথা শুনবেন। তার এমন কথায় আমার মন শান্ত হলো। আনন্দে যেন ভরে গেল। তার গায়ে হাত রেখে আমি যখন তার কাছ থেকে চলে এসে ঘুমাতে গেলাম তখন আমার অন্তর যথার্থই শান্তিতে পূর্ণ ছিল। আমার নিজের অস্তিত্বকে সেই শান্তির হাতেই যেন আমি অর্পণ করে দিলাম।

জীবনকে ঘৃণা করার কারণের আমার অন্ত ছিল না। যে ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যদিয়ে আমাকে এগুতে হয়েছে, আর যার আঘাতে আমার অস্তিত্ব প্রায় ভেঙে পড়ছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন আমার জীবনকে আমার কাছে একটা ভার বৈ আর কিছু মনে হচ্ছিল না তখন ঈশ্বরের কাছে আমার মনের এই কামনা ছিল, যে মৃত্যুতে আমার অস্তিত্বের শেষ হবে, সে মৃত্যু যেন সেদিনের মৃত্যুর চাইতে অধিকতর নির্মম না হয়।

কিন্তু মাতৃসম আমার সেই মামার বিরামহীন যত্ন এবং তার অবিশ্বাস্য পরিশ্রমে তিনি আমাকে সেদিন রক্ষা করেছিলেন। এবং একথা একান্ত সত্য যে তিনি ব্যতীত অপর কেউ এ কাজ করতে পারতেন না। চিকিৎসকের ওষুধাদিতে আমার সামান্য বিশ্বাস। আমি বিশ্বাস করি আমার বিশ্বস্ত বন্ধুর ভালবাসাকে। যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের সুখ নিহিত তার শক্তি অপর যে কোনও কিছুর চাইতে বেশি। জীবনে আনন্দবোধ বলে যদি কিছু থাকে তবে তা আমাদের এই দু'জনের পরস্পরকে পুনরায় লাভ করার আনন্দ বৈ আর কিছু নয়। আমাদের পারস্পরিক নিবিড়তার অধিকতর বৃদ্ধির কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু আমাদের এই পুনর্মিলনের গভীরতা যেরূপ এবার প্রাপ্ত হলো তার কোনও ব্যাখ্যা দান আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার মহৎ সারল্যই তার একমাত্র ব্যাখ্যা। এবার আমার অস্তিত্ব একান্তই তার হয়ে দাঁড়াল। আমি এবার একান্ত তার একটি সন্তানে পরিণত হলাম। তিনি যদি যথার্থই আমার জননী হতেন তাহলে তার সঙ্গে আমার এই জীবনের সম্পর্ক তার চাইতেও অধিক হয়ে দাঁড়াল।

এ জীবনের সূচনাতে আমরা দু'জনে অবিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়ালাম। আমরা একে অপরের অংশ, এমনও আমরা ভাবতে পারতাম না আমাদের দু'জনের অস্তিত্ব একটা অভিন্ন অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়াল। আমাদের অনুভূতি এমন ছিল যেন আমরা একে অপরের জন্য যে কেবল অনিবার্য হয়ে দাঁড়ালাম তাই নয় — আমরা একটা অভিন্ন সত্তায় যেন পরিণত হয়ে গেলাম। আমরা কোনও কিছুকে আমাদের অস্তিত্ব থেকে ভিন্ন বলে আর ভাবতে পারলাম না। আমাদের দু'জনের সুখ এবং আনন্দ অভিন্ন হয়ে উঠল। একের কামনাই অপরের কামনা, একের আনন্দই অপরের আনন্দ হয়ে দাঁড়াল। আমাদের উভয়ের কামনা উভয়েরই পরস্পরকে প্রাপ্তির কামনা হয়ে দাঁড়াল। এমন সম্পর্কের কোনও তুলনা বা প্রকাশ আর কিছুতেই যেন সম্ভব নয়। আমি নিজেও দু'জন মানুষের মধ্যে এমন সম্পর্কের অস্তিত্বকে যেন কল্পনা করতে পারছিলাম না। যে ভালবাসার কথা আমি বলছি সে ভালবাসা কোনও ইন্দ্রিয়গত ভালবাসা নয়। ইন্দ্রিয়গত ভালবাসার চাইতেও এ অধিকতর ভালবাসা। এর অস্তিত্ব কোনও ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ের জন্য যৌন কামনা, কোনও এক বয়সের প্রতি অপরের আকর্ষণ বা ভালবাসা নয়। এর সব কিছু নিয়েই এবং এর সবকিছুকে অতিক্রম করেই যেন আমাদের এই ভালবাসা ছিল। দুই অস্তিত্বকে একটি মাত্র অস্তিত্ব হতে যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুতেই যেন আমরা পরিণত হয়ে গেলাম। এবং দু'জনেই একেবারে অস্তিত্বহীন হওয়া বাদে আমাদের কেউ কারোর অস্তিত্বকে কল্পনা করতে পারতাম না।

আমার এখন মনের প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে আমাদের এই সুখকর সঙ্কট না আসে জন্য, না আমার জন্য, সুখে পরিণত হলো না। কেমন করে হলো। কেমন করে এমন হয়? তার কিংবা আমার দু'জনেরই কারোর জন্যই এই সম্পর্ক পরিণামে সুখের আকর হয়ে উঠলো না। কিন্তু কাকে এ জন্য দায়ী করব। আমার তো কোনও অপরাধ ছিল না। আমার তো কোনও ত্রুটি ছিল না। আমার সান্ত্বনা এই যে, একথা আমার মিথ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়। তবে কী দোষ তার। তাও আমি বলতে পারিনে। তারও তো কোনও ইচ্ছাকৃত অপরাধ ছিল। এটা আমার ভবিতব্যেরই ব্যাপার। পরিবর্তন বা পরিশোধনের অতীত আমার যে স্বভাব; সে আবার তার অস্তিত্বকে অপরিহার্য করে তুলল। সে আবার আমাকে কব্জা করে ফেলল। তবে ঘটনাটা যে হঠাৎ ঘটেছিল, এমন নয়। ভাগ্য ভাল : হঠাৎ নয়। দুটো ঘটনার মধ্যে যেন কিছু কালের একটা বিরতি ছিল। এর একটা প্রয়োজন ছিল। বড় রকমের প্রয়োজন। এটা আমার দোষে ঘটেছে, এমন নয়। আমি আমার নিজের কোনও বিচ্যুতি এমন পরিণতির জন্য খুঁজে পাচ্ছিনে।

[রুশোর বিবৃতি এরূপ যে, সে মাদামকে নাকি বলেছিল : মামা, এসো আমরা দু'জনে এক দেশে কোথাও ঘর বাঁধি।]

আমার কথায় 'মামা' রাজি হতেন। এমন মমতাময়ী তিনি আমার প্রতি ছিলেন। তাই যদি বাস্তবে ঘটত তাহলে আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত দু'জনে এক অভিন্ন অস্তিত্বে অপার আনন্দে জীবনকে ভোগ করতে পারতাম যতক্ষণ না মৃত্যু এসে আমাদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলত। মৃত্যু পর্যন্ত তাহলে আমাদের জীবনে এক অপার সুখ নেমে আসত। কিন্তু সে ভাগ্য আমাদের হলো না। মামার ভাগ্যে মর্মান্তিক দুঃখ-দুর্দশা নেমে এল। নানা অভাব অনটন তার জীবনে ঘটতে লাগল। একদিন যার প্রাচুর্যের অভাব ছিল না পরিণামে এর কিছুই তাঁর ভাগ্যে জুটল না। বিনা দু:খে সব তাকে ছাড়তে হলো। আমার দুর্ভাগ্যের অভাব ঘটল না। শেষপর্যন্ত একদিন আমি মামাকে পরিত্যাগের নোটিশ দেয়ার মতোই কথা বললাম। তাকে যারা ঘিরে ছিল তারা সবাই সে কথা শুনল। আর তারা যেন সততা আর সত্যের খাতিরে জগৎকে আমাদের মধ্যকার সম্পর্কের ঘটনা জানিয়ে দিল। এজন্য তাদের যে কোনও চক্র তৈরি করতে হলো বা নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র, তেমন কিছু নয়। কারণ আমাদের দু'জনের মধ্যে গোপনীয়তার তো কিছু ছিল না।

একটা দুর্ভাগ্যজনক আশঙ্কা তাকে পিছু টানল। যে বাড়িতে সে ছিল তা তখন আর বাসযোগ্য কিছু ছিল না। কিন্তু সে বাড়ি ছেড়ে দেবার নোটিশ দিলে বাড়ির মালিক ক্ষুব্ধ হতে পারে, এই আশঙ্কায় মামা পিছিয়ে গেলেন।

মামা বললেন, বাছা, তোমার প্রস্তাবটি মনোহর। তোমার প্রস্তাবটির আকর্ষণকে আমি বুঝি। আমার আকর্ষণও কম নয়। কিন্তু ধর আমরা এই আবাস ছেড়ে বনবাসে চলে গেলাম। তাতে এ বন্দিত্ব থেকে আমি মুক্তি পাব, একথা সত্য। কিন্তু এই দুর্গ থেকে যদি আমি মুক্তি পাই, আমার জৈবিক জীবনের কী অবস্থা ঘটবে। কোথায় পাব আমাদের দু'জনের আহারাদি : জীবনের জন্য যার প্রয়োজন রয়েছে। বনের মধ্যে তা না পেয়ে আমাদের তো আবার এই শহরেই ফিরে আসতে হবে। তাই এমন আশঙ্কাকে সামনে নিয়ে আমাদের দু'জনেরই এক সঙ্গে এ আবাস পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বার্ষিক যে ভাড়া আমাকে দিতে হয়, আমি বরং বাড়ির মালিককে তা অগ্রিম দিয়ে দিই। যদি ফিরে আসি তখন সে আমাকে এই গৃহে থাকতে দেবে। চল, আমরা দু'জনে দূরে কোথাও চলে যাই : সেখানে আমরা শান্তিতে থাকতে পারব। শহরের বাইরে। তবু যেন প্রয়োজন হলে একটু ফিরেও আসতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা দু'জনে তাই করেছিলাম। চারদিকে একটু তাকিয়ে শহর থেকে দূরে লা' চারমেটিসে এসে বাস করতে আরম্ভ করলাম। এটা চাম্বেরির কাছেই একটা জমিদারির মতো ছিল। এর মালিক ছিল মশিয়ে দা বোনজি। চাম্বেরি থেকে তেমন দূরে নয়। কিন্তু এত শান্ত এবং নিরিবিলি, মনে হতো যেন বনের অনেক গভীরে। জায়গাটির দু'পাশে দু'টি উঁচু পাহাড় ছিল : দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে ক্ষুদ্র একটি উপত্যকা ছিল। উত্তর দক্ষিণে দ্বীপ। উপত্যকাটির মধ্য দিয়ে একটি জলপ্রপাত ও গাছ-গাছালি আর নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যেত। এই উপত্যকারই ওপর দিকে, মাঝপথে, কয়েকটি ছড়ানো ছিটানো ঘরও ছিল। সব মিলিয়ে যে একটু নিরিবিলি জীবনকে পছন্দ করে তার জন্য অবশ্যই আদর্শ। ঘর কয়টিকে দেখে আমরা এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ঘরটিকে নিজেদের জন্য বেছে নিলাম। এই ঘরটির মালিক ছিল ওখানকার সেনাবাহিনীর এক অফিসার।

তার নাম ছিল নয়রেত।

ঘরটি দস্তুরমতো বাসযোগ্য ছিল। সামনে একটি আঙুর বাগান ছিল। তার ওপরে একটি ঝুল বারান্দার মতো ছিল। নিচের দিকেও একটি বাগান ছিল। নানা ফলের বৃক্ষপূর্ণ। একটি ফোয়ারাও ছিল। পাহাড়ের আর একটু ওপরে পশুচারণের ভূমিও ছিল।

মোটকথা আমরা যার কল্পনা করেছিলাম, তার সবই ছিল। সময়ের দিনক্ষণ যা এখন স্মরণ করতে পারি, তাতে সময়টা ছিল ১৭৩৮ সালের গ্রীষ্মকাল। প্রথম রাতে আমরা যখন ঘরটিতে শুতে গেলাম, তখন আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। আমি আমার মামাকে আদরে সোহাগে আলিঙ্গন করে আমার হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করে বললাম : আহ! কি সুন্দর মামা, তাই না? যথার্থই আমার বিমল হৃদয়ের শেষ ছিল না। মামা : এই হচ্ছে আমাদের আনন্দ, সুখ আর পবিত্রতার প্রিয় স্থান। এটি যদি আমার কল্পনার স্বর্গ না হয়, তাহলে আর কোথাও আমরা তাকে অন্বেষণ করে বের করতে পারব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ পুস্তক

[১৭৩৮]

এ পর্যন্ত যা বলেছি, তার পরে আর একটু বলি। যা আমি এ পর্যন্ত জীবনে পেয়েছি তার চেয়ে আর অধিক পাওয়ার কী ছিল। মাদাম ওয়ারেন্স-এর সম্পত্তিরও আমার প্রয়োজন ছিল না। যা পেয়েছি তার আনন্দেরই কোনও তুলনা নেই। একথা আমি আগেও বহুবার বলেছি এবং অনুভব করেছি যে, স্বামী-স্ত্রী : বা প্রেমিক-প্রেমিকা : এদের পারস্পরিক প্রাপ্তি অনুভূতি অভিন্ন নয়। ব্যক্তি হিসেবে এক ব্যক্তির নয়। অভিন্ন ব্যক্তির নয়। বিভিন্ন সত্তার।

এই পর্যায়ে আমার জীবনের স্বল্পস্থায়ী সুখের একটি পর্ব শুরু হলো : একথা আমি বলতে পারি। আমি বলতে পারি, হ্যাঁ, আমি জীবন ধারণ করেছি : এই পর্বটিতেই ঘটেছে আমার জীবনের যেমন মূল্যবান ঘটনা, তেমনি দুঃখজনক ঘটনা। জীবন যেন আমাকে বলল : যাও এবার ছোট। দেখি তুমি কতদূর যেতে পার। এগিয়ে তবে ধীরে, আস্তে। অস্থিরতার কী আছে। আমার স্মৃতি এই পর্যায়টি সত্যই যেন মধুময়। এ পর্বটির কথা যেমন আমি দ্রুত বলে শেষ করতে চাইনে, তেমনি ধীরলয়ে বলেও অশেষ করে তুলতে চাইনে। ব্যাপারটা আসলে তাই। বিষয়টা যদি কেবল কতগুলো ঘটনার হতো। কেবল কর্মকাণ্ড বা শব্দময় কাহিনী হতো তাহলে আমার বলতে কোনও অসুবিধা হতো না এবং তাকে আমার পাঠকদের কাছে অর্থময়ও করে তুলতে আমি সক্ষম হতাম। কিন্তু ব্যাপারটা যখন না ঘটনা, না শব্দের মাধ্যমে বলা কোনও কাহিনী, যার অস্তিত্ব আমার চিন্তার মধ্যেও ছিল না, ছিল কেবল আমার অনুভূতির মধ্যে, আমার আনন্দের মধ্যে, তাকে আমি কীভাবে প্রকাশ করি।

হ্যাঁ, সূর্য উদয়ের সঙ্গে আমি উঠেছি। সেও আমার এক আনন্দ ছিল। আমি বাগানে বেড়াতে গেছি : সেটাও আমার একটা আনন্দ ছিল। আমি মামাকে দেখতে গেছি। মামাকে দেখতে পেয়েছি, তাও এক অসীম আনন্দের বিষয়। আমি তাকে একটু দেখে চলে এলাম। সেটাও আমার একটা আনন্দ। বনের মধ্যে দিয়ে আমি দৌড়েছি, পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি, আমি বই পড়েছি, তাতেও আনন্দ পেয়েছি। বাগানে কাজ করেছি, তাতেও আনন্দ পেয়েছি। গাছ থেকে আমি ফল পেরেছি ঘরের কাজে সাহায্য করেছি, তাতেও আনন্দ পেয়েছি। আমি যা কিছু করেছি বা না করেছি, সবই ছিল আমার আনন্দের উৎস। সবই ছিল আমার আনন্দ। সে আনন্দের কোনও বর্ণনা নাই। তাকে আমি কোনও সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করতে পারিনে। সে আনন্দের কোনও বাইরে অস্তিত্ব ছিল না। তার সবটাই ছিল আমার অন্তরের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তাই সেই পর্বটিতে আমার এমন কোনও মুহূর্ত ছিল না যখন আমি আনন্দময় ছিলাম না। যখন আমার অস্তিত্বটা আনন্দ ব্যতীত আর কিছু ছিল : না আর কিছু ছিল না। আনন্দের অস্তিত্ব। অস্তিত্বের আনন্দ। আনন্দহীন মুহূর্ত বলে তখন আমার কিছুই ছিল না।

সেই আনন্দময় সময়ে আমি যা কিছু করেছি, যা কিছু বলেছি : তার কোনও কিছুই আমার স্মৃতি থেকে তলিয়ে যায়নি। এর আগে এবং পরে যা কিছু ঘটেছে সবই আমার মনে উদিত হয়। সব যে তেমন স্পষ্ট তা নয়। তবু সমগ্র সময়টাকেই আমি স্মরণ করি। স্মরণ করার চাইতেও মনে হয় যেন আমি সেই স্মৃতির মধ্যেই বাস করছি। সেই স্মৃতিতেই আমার অস্তিত্ব, আমার কৈশোরে আমি ভবিষ্যতের পানে তাকিয়েছি। কিন্তু এখন আমি তাকাই কেবল আমার অতীতের দিকে। অতীতের এই স্মৃতি অতীতে আমি যা কিছু হারিয়েছি তার সব ঘাটতি যেন পূরণ করে দিচ্ছে। এখন আর আমি ভবিষ্যতের দিকে তাকাইনে। ভবিষ্যৎ আমাকে কী দেবে। তাৎক্ষণিকভাবে সে আমাকে কী দেয়। কিন্তু অতীতের দিকে তাকালে আমি সব দেখি, সব পাই। সব কিছুকেই আমি অন্তর দিয়ে স্পর্শ করতে পারি। বর্তমানে আমার দুর্ভাগ্য যাই-ই হোক না কেন, যে সময়ের কথা আমি বলছি, সে সময়ের দিকে তাকালে আমার আর সুখের অন্ত থাকে না।

এখানে আমি আমার স্মৃতির একটা ঘটনার কথা বলি। তা থেকে আমার মনের তখনকার অবস্থার কথা বেশ একটু স্পষ্টতার সঙ্গে বুঝতে পারা যাবে। প্রথম দিন যখন আমরা লা চারমেটাতে ঘুমাতে যাই সেদিন মামা একটা পালকিতে ছিলেন। মামার পালকি সামনে, আমি পেছনে। রাস্তাটা উঁচুর দিকে ছিল। মামার দেহের ভারে পালকির বাহকদের কষ্ট হবে এই ভেবে তিনি পালকি থেকে নেমে পড়লেন। তখনও আমরা অর্ধ পথে। মামা বললেন, বাকি পথ আমরা হেঁটে যাবো। মামা যখন হাঁটছিলেন তখন তিনি একটা ফুলের রঙের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখো কী সুন্দর এর রঙ। আমি এমন রঙ আগে দেখিনি। আমি লম্বা ছিলাম না। তাই মাটি থেকে তা দেখতেও পাইনি। আমি ঘটনাটা ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর কত দিন মাস পেরিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। প্রায় ত্রিশ বছর পরে একটা ফুলের রঙ দেখে আমি চমকে উঠলাম। আমি চীৎকার করে

মামার দেহের ভারে পালকির বাহকদের কষ্ট হবে এই ভেবে তিনি পালকি থেকে নেমে পড়লেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললাম : এই যে প্রিউস্কিল। আমার সঙ্গী দুপেরুও দেখল। কিন্তু আমার এমন উচ্ছ্বসিত আনন্দের কারণ তিনি তখন উপলব্ধি করতে পারেননি। আজ এই কাহিনী পাঠ করলে তিনি আমার উচ্ছ্বাসের কারণ বুঝতে পারবেন।

কিন্তু এ জায়গার আবহাওয়ায় আমার স্বাস্থ্যের অবস্থার কোনও উন্নতি ঘটল না। আমি যেমন নিস্তেজ ছিলাম, যেন তার চেয়েও বেশি নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলাম। দুধও আমার সহ্য হলো না। ফলে দুগ্ধপান করাও আমি ছেড়ে দিলাম। সে কালে যে কোনও শারীরিক উপসর্গ নিরাময়ের জন্য জল চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। আমি সেই চিকিৎসাই জোরে সোরে শুরু করলাম আর তাতে আমার রোগের এমন শেষই হতে লাগল যেন আমার জীবনেরই শেষ হয়ে গেল। রোজ সকালে ফোয়ারার কাছে যাওয়ার সময়ে আমি বিরাটাকারের একটা জলের বাটি নিয়ে যেতাম। এবং হাঁটতে হাঁটতেই বাটির পরে বাটির জল পান করে ফেলতাম। আগে খাবারের সময়ে মদ্য পান করতাম। এই মদ্য পান আমি একেবারে ছেড়ে দিলাম। বরং মদের চেয়ে পাহাড়ি এই জল খাওয়া অধিক কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। ফলে দু'মাসের মধ্যে আমার পাকস্থলীকে আমি প্রায় শেষ করে ফেললাম, আর এর আগে আমার পাকস্থলীর অবস্থা বেশ ভাল ছিল। কিন্তু এখন আর কোনও খাবারই আমি হজম করতে পারলাম না। এবার আমি নিরাময়ের সব আশাই ছেড়ে দিলাম। এই সময়ে আমার শরীরে একটা ঘটনা ঘটল যার ফল যেমন অদ্ভুত ছিল, তেমনি আমার মৃত্যু পর্যন্ত যে তাকে আমার বহন করতে হবে তা বুঝতেও আমার অসুবিধা হলো না।

এক সকালে ছোট একটা টেবিলকে তার চার পায়ের ওপর দাঁড় করাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আমার শরীরে আমি একটা অসম্ভব ব্যথা বোধ করলাম। আমি এটাকে শুধু এই বলে বুঝাতে পারি, আমার মনে হলো যেন আমার দেহের রক্তে যেন একটা বড় ঝড় বয়ে গেল এবং মুহূর্তে আমার সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন তার তাণ্ডবে অস্থির হয়ে পড়ল। আমার রক্তের শিরাগুলো এমনভাবে কাঁপতে শুরু করল যে, আমি সেই কম্পন কেবল যে বোধ করতে লাগলাম, তাই নয়। সে কম্পনের শব্দ যেন আমি নিজের কানে শুনতেও পেলাম। বিশেষ করে আমার ঘাড়ের ধমনীর এ অবস্থা হলো। এর সাথে আবার আমার কানের মধ্যেও তিন চার রকমের শব্দ হতে লাগল : একটা চাপা, অপর একটা ভারী। আর একটা হয়ত জলস্রোতের শব্দের মতো। ধমনীর ওঠা-পড়ার শব্দ সেগুলোকে হাত দিয়ে না ধরেও আমি শুনতে পেলাম। আমার নাড়ীর স্পন্দনের মতো, আমার শরীরে হাত না দিয়েই যেন শুনতে পেলাম। এটাকে যদি আমি আমার শরীরের ভেতরের শব্দ বলি তাহলে সে শব্দের ওজন এমন হলো যে তার জন্য আমার অপর কোনও কোমল শব্দ শোনা যেন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এক সময়ে সূক্ষ্ম শব্দ শোনার যে ক্ষমতা আমার ছিল, সে ক্ষমতা আমার আর রইল না। ফলে আমি একেবারে বধির না হলেও আমি কানে কম শুনতে লাগলাম। আজ পর্যন্ত আমার শোনার ক্ষমতার সেই হ্রাসপ্রাপ্তি দূর হয়নি। এখনো তা আমার একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে : কানে খাটো। এতে আমার মনে যে বিস্ময় এবং ভীতির সৃষ্টি হলো তা কেবল আমি আন্দাজ করতে পারি। আমার মনে হলো আমি যেন মরে যাচ্ছি। আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার অবস্থায় চিন্তিত হয়ে কাছের লোকজন ডাক্তার ডাকল। আমি ডাক্তারকে আমার অবস্থা বলার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলাম। আমার গলাতে কাঁপুনি দেখা দিল। আমার মনে হলো এ আমার মরণ রোগ দেখা দিয়েছে। এবার আমার নির্ঘাত মৃত্যু ঘটবে। আমার মনে হলো ডাক্তারও তাই ভাবছে। সে তার ডাক্তারি ব্যাখ্যায় তাই ভাবছে। সে তার ডাক্তারি ব্যাখ্যায় কার্পণ্য করল না। তার কথার কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না। সে তার শাস্ত্রমত এবার আমার ওপর 'এ্যাকিমা' প্রয়োগ শুরু করল। তার দেয়া এই দাওয়াই আমার জন্য এত যন্ত্রণাদায়ক আর জঘন্য এবং নিষ্ফল হলো যে আমি এতে অল্প সময়ের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এমনিভাবে কয়েক সপ্তাহ পার হলো : আমার রোগের কোনও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটল না। আমি তাই শুয়ে থাকার বদলে উঠে বসলাম এবং দিনাদিনের স্বাভাবিক কাজ কর্ম করতে শুরু করলাম। আমার ধমনীর অস্বাভাবিক ওঠানামার কোনও উপশম হলো না। মাথার মধ্যেও একটা বাজনার মতো শব্দ হতে লাগল। আমার ধমনীর এমন কম্পনের আজ পর্যন্ত অন্তত গত ত্রিশ বছরে কোনও উপশম ঘটেনি। এক মিনিটের জন্যও নয়।

এর আগে আমার নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত ছিল না। কিন্তু এখন ঘুম কাকে বলে তা আর আমি জানলাম না। এই সমস্ত উপসর্গের সঙ্গে এবার যুক্ত হলো পুরো নিদ্রাহীনতা। আজ পর্যন্ত আমি জানিনে ঘুম কাকে বলে। এবার আমি বুঝলাম, আমার জীবনের আর বেশি বাকি নেই। এই চিন্তা থেকে কোনও উপসর্গেরই কোনও নিরাময়ের চেষ্টা করলাম না। আমার বাঁচার আর সময় নেই, এই বোধ থেকে আমি স্থির করলাম, তাহলে আর কোনও চিকিৎসার কথা ভেবে লাভ কী? বরং জীবনের যে সময়টুকু বাকি আছে সেটুকু যতটুকু ভালভাবে পারি ততটুকু ভাল থাকার চেষ্টা কেন করিনে? এই পর্যায়ে আমার গায়ের ব্যথা যেন কিছুটা হ্রাস পেল এবং আমি সাধারণ কাজ কর্ম করতে সক্ষম হতে লাগলাম। একমাত্র মাথার মধ্যকার শব্দটার শেষ হলো না। তবে শব্দটাতে তেমন কোনও বেদনা বোধ হলো না। ব্যথা বোধ হলো না। কেবল নিদ্রাহীনতার কোনও উপশম হলো না। রাতে আর ঘুম হতো না। তার সাথে শ্বাসকষ্টও আবার স্থায়ীভাবে চলতে লাগল। পুরো 'অ্যাজমা' নয়। এটা শুরু হতো যখন একটু দৌড়াবার চেষ্টা করতাম কিংবা কোনও পরিশ্রমের কাজ করতে চাইতাম।

এটা দুর্ঘটনাই বটে। এর ফলে আমার মৃত্যু ঘটতে পারত। কিন্তু তা হলো না। বরং এর ফলে আমার ভেতরের সব কাম, উত্তেজনা একেবারে নিভে যেতে লাগল। এ জন্য এরপর থেকে রোজ আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই তাঁর এমন কৃপার জন্য। এই পর্যায়ে আমার মনে হলো যেন আমি সত্যিই মরে গেছি। আবার জন্ম না নেয়া পর্যন্ত আর আমার জীবন হবে না। এবার আমি একটা হিসাব করতে লাগলাম, যা গেছে তা গেছে। যিনি গেছে তার যেমন হিসাব দরকার, তেমনি সামনে উত্তম কাজ আমাকে কী কী করতে হবে তাও আমি স্থির করতে লাগলাম। আমাকে এখন সেই সব কাজই করতে হবে যে সব কাজ আমার এর পূর্বে করা প্রয়োজন ছিল অথচ আমি তার কোনওটা করিনি। ধর্মের ব্যাপারে, কিংবা বলা চলে ধর্ম নিয়ে আমি গুরুত্বর কোনও চিন্তা না করে কেবল বাচালতা করেছি। এর একটি ভাল ফল এই হলো যে অনেকের ক্ষেত্রে যেমন ধর্ম বিশ্বাস থেকে প্রয়োজনে অবিশ্বাসে প্রত্যাবর্তন করতে অসুবিধা ঘটে আমার তেমন কিছু ঘটল না। কিন্তু আবার এমন আছে যারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসে প্রত্যাবর্তনে যেমন আনন্দ লাভ করে তেমনি একটা সান্ত্বনাও। আমার মামার কাছে আমার এই এক কৃতজ্ঞতা যে, যে কাজ পৃথিবীর কোনও ধর্মবিশ্বাসী বা ধর্মীয় গুরু আমার জন্য করতে পারতেন না, মামা আমার জন্য তাই করলেন। সব কিছু বিচারের তার একটি ধারা ছিল। সব কিছুকেই যেন তিনি একটা নিয়ম বা শেকলে বাঁধতে পারতেন। ধর্মকেও তিনি এ চোখেই দেখতেন। অবশ্য তার এমন বিশ্লেষণে কোনও কিছুই বাদ পড়ত না। তার চিন্তায় সব কিছুরই জায়গা হতো। এর মধ্যে এমন কিছু থাকত যার মধ্যে যুক্তিতর্কের অভাব হতো না। তাৎপর্যের অভাব ঘটত না। আবার এমন অনেক বিষয়ও থাকত যারা ছিল মূর্খতার অশেষ। তার মুখে যেমন ছিল তার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্যই তেমনি আবার এর অনেক কিছুর মূলে ছিল তার শিক্ষা প্রাপ্তির ব্যাপার, নানা কুসংস্কারের শিক্ষা।

সাধারণভাবে বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসের পাত্র বা পাত্রীকে নিজের প্রতিকৃতিতেই কল্পনা করে। যে উত্তম সে তার ঈশ্বরকে উত্তম আকারেই চিন্তা করে। যে অসৎ, যার চরিত্র অসৎ সে তার ঈশ্বরকে তেমন গুণেই গুণান্বিত মনে করে। যারা গোঁড়া একগুঁয়ে তারা তাদের ঈশ্বরকে তেমনি গোঁড়া আর খিটখিটে বৈ আর কিছু ভাবতে পারে না। তাদের চোখে কেবল নরকই ভেসে ওঠে, কারণ তারা সমস্ত পৃথিবীটাকেই ঘৃণ্য বলে গণ্য করে। অপরদিকে যে মানুষ শান্ত, ধীর স্থির, প্রেমময় তার পক্ষে ঈশ্বরকে অপর কিছু ভাবা আদৌ সম্ভব হয় না। টেলিমেকাসের মধ্যে উত্তম ফেনিলন কেমন করে খারাপ কিছু ভাবতে পারে তা আমি বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। অথচ ফেনিলনের প্রকাশে মনে হয় যেন সে এমন প্রকৃতিকে যে যথার্থই বিশ্বাস করে। আমার মনে হয় সে নিশ্চয়ই এ ক্ষেত্রে কোনও এক সময় মিথ্যার পরিচয় দিয়েছে। কারণ যে কোনও ধর্মযাজক হয় তাকে একবার না একবার মিথ্যা বলতেই হয়। অন্য সময়ে সে হতে পারে সত্যবাদী। কিন্তু ঐ এক সময় নিশ্চয়ই সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু মামা আমার কাছে কখনো মিথ্যা বলেননি। নিজে পরিপূর্ণ মিথ্যামুক্ত হয়ে তিনি কখনো তার ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী এবং হিংসাত্মক বলে কল্পনা করতে পারতেন না।

একজন গোঁড়া ধার্মিক যেখানে ন্যায় কিংবা দণ্ডই মাত্র দর্শন করেন, তিনি সেখানে দয়া এবং ক্ষমতার বাইরে আর কিছু কখনো দেখতে পেতেন না। অনেক সময় তিনি এমনও বলতেন যে ঈশ্বর যদি আমাদের প্রতি কেবল দয়াবানই হতেন তাহলে ঈশ্বর আমাদের প্রতি ন্যায়বান হতে পারতেন না। আর ঈশ্বর যেহেতু আমাদের কেবল উত্তমের চাইতে অধিক কিছুর জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে কারণে ঈশ্বরের প্রতিও আমাদের তার প্রদত্ত দানের চাইতে অধিকতর কিছু প্রদান করতে হবে। এর কারণ অবশ্য এই ছিল যে, মামা নরকে বিশ্বাস না করলেও 'পারগেটরি' বা পাপশোধনাগারে বিশ্বাস করতেন। তার এমন বিশ্বাসের কারণ এই যে, যাদের আত্মা দুষ্ট তাদের সেই আত্মার কী উপায় হবে তা তিনি বুঝতে পারতেন না। কারণ তিনি এমন আত্মাকে না পারতেন অভিশপ্ত বলতে, না পারতেন তারা উত্তম না হওয়া পর্যন্ত উত্তম বলতে । মামা মনে করতেন যারা দুষ্ট চরিত্রের তারা যেমন একালের জন্য একটা দুষ্টগ্রহ বিশেষ, তেমনি সেকালের জন্যও তারা দুষ্টগ্রহ।

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল তার। তার ব্যাখ্যাতে আদি পাপের যেমন কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থান ছিল না। তেমনি পাপ থেকে পরিত্রাণেরও কোনও উপায় ছিল না। ফলে তার ব্যাখ্যায় খ্রিস্টধর্মের ব্যাখ্যার মূল ভিত্তিটাই ধূলিসাত হয়ে যেত। তাতে ক্যাথলিকবাদকে আর আদৌ রক্ষা করা যেত না। তথাপি আমি বলব মামা একজন যথার্থ ক্যাথলিকই ছিলেন। অন্তত তিনি নিজেকে ক্যাথলিক বলে মনে করতেন। তার এমন অনুভূতিতে কোনও কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি মনে করতেন ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা তাদের ব্যাখ্যা নিতান্তই আক্ষরিক এবং নিষ্করুণ। ধর্মগ্রন্থে চির পাপ সম্পর্কে যা বিবৃত হয়েছে তা মানুষকে সতর্ক করার জন্যই লিখিত হয়েছে। একটা প্রতীক অর্থে তাকে অনুধাবন করতে হবে। যিশু খ্রিস্টের মৃত্যুকে তিনি ঈশ্বরের করুণার প্রকাশ বলে মনে করতেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য মানুষ যেন ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখে, মানুষ যেন মানুষকে তথা পরস্পরকে ভালবাসতে শেখে। সংক্ষেপে আমি বলব, তিনি যে ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রতি তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং তার ধর্মকে তিনি সামগ্রিকভাবেই গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তার বিভিন্ন ধারা বা উক্তির বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্রে সমস্যার উদ্ভব হতো। তখন তার ব্যাখ্যা আর খ্রিস্টান ধর্ম অভিন্ন থাকত না। অবশ্য তিনি কখনো খ্রিস্টান ধর্মের ক্ষমতাকে অমান্য করেননি। এমন বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে তার চারিত্রিক সারল্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতো। তার এমন সরলতা ধর্মের সব কাঠিন্যকে অতিক্রম করে যেত। কিন্তু তিনি তার স্বীকৃতি গ্রহণকারী গুরুর কাছ থেকে কোনও কিছুই গোপন করতেন না। তিনি সরলভাবেই তাকে বলতেন : আমি একজন উত্তম ক্যাথলিক এবং আমি একজন উত্তম ক্যাথলিক হিসেবেই আমার জীবনকে যাপন করতে চাই। আমি আমাদের পবিত্র গীর্জার সকল সিদ্ধান্তকেই সর্বান্তকরণে মান্য করব। কিন্তু তথাপি আমি নিজেকে আমার বিশ্বাসের দাসী বলে গণ্য করিনে। আমি আমার নিজের ইচ্ছার অনুগত, অপর কিছুর নই। আমি সব কিছুকেই বিশ্বাস করি। আপনি আমার কাছ থেকে অধিক কি আশা করতে পারেন?

আমি মনে করি খ্রিস্টান ধর্মীয় নৈতিকতা বলে যদি কিছু না থাকত, তাহলেও মামার নৈতিকতা খ্রিস্টান নৈতিকতার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন হতো। মামা ধর্মে নির্ধারিত সব কিছুই পালন করতেন। কিন্তু নির্ধারিত না থাকলেও তার পালনের মধ্যে সে সবই আসত। গুরুত্বহীন ব্যাপারে তিনি আনুগত্য প্রকাশে ভালই বাসতেন। এমনকি উপবাসের দিনে যদি তাকে মাংস খেতে হতো, তাহলে তিনি আড়ালে উপবাসই করতেন। ঈশ্বরের আনন্দের জন্যই তিনি তা করতেন, কোনও যুক্তির ভিত্তিতে নয়। কিন্তু তার সকল নৈতিকতার ভিত্তি ছিল মশিয়ে দা তাভেল-এর নীতির অনুসারী। তিনি সে নীতির মধ্যে কোনও বৈপরীত্য দেখতে পেতেন না। তিনি রোজ বিশজন পুরুষের শয্যাগামিনী হতে পারতেন, তাতে তার বিবেকের কোনও দংশনের ব্যাপার ঘটত না। কামনার অতিরিক্ত তেমন কর্মে তার অপর ব্যাপার থাকত না। আমি জানি বহু ধার্মিক মানুষই এমন করে। তাদের সঙ্গে তার এই ছিল পার্থক্য যে তাদের ছিল কেবল কামনা। কিন্তু তার মধ্যে ছিল একটা যুক্তির ভাব। গভীর আবেগময় কথার মধ্যেও তিনি অনায়াসে, তার কণ্ঠস্বরের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে আলোচ্য বিষয়ে পরিবর্তন ঘটাতে পারতেন। তাতে তার মনে কোনও বৈপরীত্য বোধের উদয় হতো না। প্রয়োজন হলে তিনি তেমন ক্রিয়ার মধ্যে আলাপ বন্ধ করেও দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারতেন এবং পরমুহূর্তে পুনরায় তার কর্মে সমান গুরুত্বের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করতে পারতেন। তার নিজের বিশ্বাসের ভিত্তি এত দৃঢ় ছিল যে, সমগ্র ব্যাপারটাকেই তিনি অপর যে কোনও ব্যক্তির মতোই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিতে পারতেন, তিনি তার ব্যাখ্যায় পরিবর্তন ঘটাতে পারতেন, এমনকি আগের ব্যাখ্যাকে নাকচ করে দিতে পারতেন। এ জন্য অপর কিছুর উল্লেখের প্রয়োজন পড়ত না বা তিনি তাঁর ইশ্বরের নিকট কোনও অপরাধ করেছেন, এমন বোধও আসত না। এ ব্যাপারে আমি যে তার সঙ্গে একমত পোষণ করতাম, এমন নয়। আমি স্বীকার করি তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার সাহসও আমার ছিল না। অন্যের ব্যাপারে একটা যুক্তি যে আমি দেখাতে না পারতাম তা নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে নয়। কিন্তু মামার নীতির যে দৃঢ়তা ছিল তাতে তার কোনও ব্যত্যয় ঘটত না। আমি বিশ্বাস করতাম, তিনি প্রতারিত হওয়ার মতো কোনও মহিলা ছিলেন না। তাই তার ক্ষেত্রে আমার নিজের জন্য কোনও ব্যতিক্রম কথা ভাবতে পারতাম না। আমি কথাটা বললাম কেবল তার আচরণের ব্যতিক্রমগুলোকে বুঝাবার জন্য। আমি বলেছি, আমি মামা সম্পর্কে কোনও মিথ্যাচারে লিপ্ত হব না। আমার সে কথার অন্যথা করব না। এবার আমি আবার আমার নিজের ব্যাপারে ফিরে আসব।

মৃত্যু সম্পর্কে ভয় কিংবা মৃত্যুর পরবর্তী কোনও আতঙ্ক বিষয়ে কোনও দুশ্চিন্তার কারণ আমি মামার চরিত্রে দেখিনি। এ আমার দৃঢ়বিশ্বাস। ফলে তার প্রতি আগের চাইতেও অধিকতর ভাবে আমি আকৃষ্ট বোধ করতে লাগলাম। আমি আনন্দের সঙ্গে আমার সমগ্র জীবনকে তার পদতলে অর্পণ করতে পারতাম। বরঞ্চ বলা চলে আমি যখন বোধ করতে লাগলাম, মৃত্যুর আর আমার অধিক বিলম্ব নাই, তখন তার প্রতি আমার আকর্ষণ যেন পূর্বের চাইতে গভীরতর ভাবে বোধ করতে লাগলাম। এই বোধ থেকে তার প্রতি আমার ইন্দ্রিয়গত আকর্ষণও যেন বৃদ্ধি পেল। আমার জীবনের যে ক'টা দিন বাকি আছে সে কটা দিন আমি মামার নৈকট্যে আনন্দের সঙ্গে অতিবাহিত করার একটা আবেগ আমি বোধ করতে লাগলাম। একটা ব্যাপারে আমি আনন্দ পেতে লাগলাম। মামা যে বিষয়ে আনন্দ পেতে পারেন, কোনও বহির্ভ্রমণ বা এমন কিছু আমার ইচ্ছা হলো তার জন্য সে ব্যবহার সম্ভব করে তোলা। তার নিজের বাগানটাকে সুন্দর করে তুললে তিনি যদি আনন্দ বোধ করেন তবে আমি তারই চেষ্টা করতে লাগলাম। তার হাঁস, মুরগি, ফুলের বাগান– যাই-ই তিনি ভালবাসতেন, আমিও তাকে ভালবাসতে লাগলাম। এবং এ জন্য যা কিছু পরিশ্রম করতে হতো সে পরিশ্রম করতে আমার তখনকার রোগক্লিষ্ট শরীর কোনও ক্লেশ বোধ করত না। দুগ্ধপান কিংবা তপর কোনও ওষুধের চেয়ে মামার ভাললাগার জন্য এমন পরিশ্রমেই আমি আরাম বোধ করতাম। আমি বোধ করতাম যেন আমার স্বাস্থ্যের তাতে উন্নতি ঘটছে।

আঙ্গুর তোলার কাজটা সেবার আমাদের দু'জনকেই বেশ আনন্দ দিয়েছিল। যে সব প্রতিবেশী দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত ছিলাম তাদের জন্য আমাদের প্রীতি এবং ভালবাসাও বৃদ্ধি পেতে লাগল। গ্রামের প্রতিও আমাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল। কিন্তু শীত আসন্ন দেখে আমাদের মন:কষ্ট হলো। আমার ক্ষেত্রেই এটা বেশি হলো। কারণ আর একটা বসন্ত আমি দেখতে পাব, এমন আমি ভাবতে পারতাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে হতো লাচারমিটেসে এই আমার শেষ। এর কোনও ঘাস কিংবা বৃক্ষকে চুম্বন না করে আমি স্থান ত্যাগ করতে পারতাম না। অনেক আগেই শহরের সঙ্গে কিংবা শহরের মেয়েদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়েছিল। ফলে মামা এবং মশিয়ে সলোমন বাদে আর কারও সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকল না। এই মঁশিয়ে সলোমনই এই সময়ে মামা এবং আমার চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইনি যেমন ভদ্র, তেমন বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি একজন বড় রকমের দেকার্তবেত্তা ছিলেন, পৃথিবী সম্পর্কে তার আলোচনা বেশ স্বচ্ছ ছিল। বস্তুত অন্য কোনও ঔষধের চাইতে তার আলোচনা দ্বারাই আমি অধিক উপকৃত বোধ করতাম। সাধারণ আলোচনাকে আমি কখনো পছন্দ করতাম না। অপরদিকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাতে আমি আকৃষ্ট এবং উপকৃত বোধ করতাম। আমি মঁশিয়ে সলোমনের বিশেষ ভক্ত হয়ে দাঁড়ালাম। তার সান্নিধ্যে আমি যেন সেই জ্ঞানের সম্পর্ক পেতাম যে জ্ঞানের জন্য আমার আত্মার আর্তি যেন জাগ্রত হচ্ছিল। মর্তের বন্ধন থেকে মুক্তি যেন জাগ্রত হচ্ছিল। মর্তের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে আমি সেই ঊর্ধ্ব জ্ঞানকে লাভ করতে পারব, এমনটাই আমার মনে হতো। আমি ক্রমান্বয়ে তার আলোচ্য বিষয়গুলোর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলাম। তার আলোচনা যেন আমি অধিকতর উত্তমরূপে অনুধাবন করতে পারি তার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অনুসন্ধান করতে লাগলাম। যা কিছুই আমাকে বিজ্ঞান এবং বোধের দিকে নিয়ে যেত তাই-ই আমি ভালবাসতে লাগলাম। এরকম একটি বই পেয়ে গেলাম। বইটি ছিল ধর্মযাজক কাদার লামীর রচিত : 'কনভারসেশন অন দি সাইন্সেস' বা বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা। এই গ্রন্থের আলোচনাগুলো বিজ্ঞানে আমার অনুপ্রবেশকে সহজ করে তুলল। এই গ্রন্থ আমি বারংবার পড়তে লাগলাম। বলা চলে এই বই আমি শতবার পড়েছি। এর ফলে আমি গ্রন্থপাঠে ক্রমান্বয়ে অধিকতর আকৃষ্ট বোধ করতে লাগলাম। যখন আমি ভাবতাম, আজকের দিনটাই আমার জীবনের শেষ দিন, সেদিনের পাঠে আমি এত নিবিষ্ট বোধ করতাম যেন আমার জীবনের কোনও শেষ ঘটবে না। অপরে বলত এতে আমার ক্ষতি হচ্ছে। আমি ভাবতাম এতে আমার উপকার হচ্ছে। কেবল যে আমার আত্মার উন্নতি ঘটত এমন পাঠে, তাই নয়। মনে হতো যেন আমার শরীরেরও উন্নতি ঘটছে। আসলে পাঠের প্রতি আমার আগ্রহ এত বৃদ্ধি পেতে লাগল, পাঠে আমি এত আনন্দ পেতে লাগলাম যে এর ফলে আমি আবার শারীরিক রোগের সম্পর্কে চিন্তা বা উদ্বেগ বোধ করতেই ভুলে গেলাম। তা সত্ত্বেও এটা সত্য যে রোগের কোনও উপশম ঘটত না। তবু শরীরে ব্যথার তীব্রতাটা যেন হ্রাস পেতে লাগল এবং সেটা গা সওয়া হয়ে দাঁড়াল। অনিদ্রাতে কোনও কষ্ট বোধ করতাম না, চিন্তায় আমি নিবিষ্ট থাকতাম। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম : এটাই তো আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি। এই রকম উন্নতি তথা আমার অস্তিত্বের হ্রাস প্রাপ্তিতে আমি একদিন শেষ হয়ে যাব। এটি খারাপ কী, সেই মৃত্যুতেই আমার মুক্তি ঘটবে।

আমার এই সব চিন্তার উপকারের একটা দিক এই ছিল যে, এর ফলে জীবনের সব উদ্বেগ যেন ভুলে যেতে লাগলাম এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার ওপর যে সব বিস্বাদজনক এবং ক্লান্তিকর উপশম প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হচ্ছিল তা থেকে যেন আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তি পেলাম। আমার চিকিৎসক সলোমন এতদিনে স্থির বুঝেছিলেন যে তার ওষুধে আমার জীবন রক্ষা পাবে না। তাই তিনি তার মারাত্মক ওষুধ প্রদানের বদলে আমার জন্য মামার উদ্বেগকে প্রশমিত করার জন্য সেই সব সাধারণ ওষুধেরই ব্যবস্থাপত্র দিতে লাগলেন যাতে একদিকে রোগীর মনে বাঁচার আশা যেমন জন্মে তেমনি এতে চিকিৎসকের সুনামের কোনও হানি না ঘটে।

এবার আমি বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগলাম। আবার আমি মদ্যপান শুরু করলাম এবং আমার চলাচলে এমন ভাব দেখালাম যেন আদতে আমার কোনও অসুখই নেই। তবে এটা বলতে হবে আমি কোনও কিছুতেই বাড়াবাড়ি করতাম না। সব কিছুতেই একটা পরিমাপ বজায় রাখতাম। কিন্তু কোনও কিছুকে আমি পরিত্যাগ করলাম না।

এমনকি আমি এবার বাড়ির বাইরে যেতেও শুরু করলাম। আমার পরিচিত আড্ডায় আমার পুনরায় আবির্ভাব ঘটতে শুরু করল। বিশেষ করে এই সময়ে মঁশিয়ে দা কনজি'র সঙ্গ আমার মনকে বিশেষ করে চাঙ্গা করে তুলত। ব্যাপারটা যথার্থই এমন হচ্ছিল। মৃত্যুর আসন্নতা আমার মনে সর্বরকম গ্রন্থপাঠের আগ্রহকে বৃদ্ধি করে দিতে লাগল। ভাবটা দাঁড়াল এমন যে, আছি তো মাত্র আর কটা দিন, একটা দিন জীবনটাকে ভোগ না করে ছাড়ছিনে। হাঁ মালমশলা কিছু তো পরকালের জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে। ফলে মৃত্যুর আশা বা আশঙ্কা আমাকে দমিত না করে জ্ঞান সংগ্রহের আগ্রহকে আরো উদ্দীপ্ত করে তুলল। এ ছিল যথার্থই পরকালের জন্য জ্ঞান সংগ্রহের মনোভাব। আমার কেবল মনে হচ্ছিল, পরকালের জন্য কিছু সাথে করে নিয়ে না গেলে সেখানে আমি বাঁচবো কী খেয়ে!

মঁশিয়ে বুচার্ডের একটা বই-এর দোকান ছিল। সে বই-এর দোকানে বিখ্যাত সব ব্যক্তিদের যাতায়াত ঘটত। সেবার যখন বসন্ত আসন্ন হয়ে এল তখন মঁশিয়ে বুচার্ডের দোকান থেকে বেশ কয়েকটা বই আমি সংগ্রহ করলাম। কারণ আমি জানতাম এই বসন্ত আমার জীবনে আর প্রত্যাবর্তন করবে না। আগামী বছরের বসন্তের সাক্ষাৎ আমি পাব, তেমন আমি আদৌ চিন্তা করে পারিনি। তবু ভাবলাম, আর একটা বসন্ত আমার জীবনে যদি বা আসে তাহলে সে বসন্তে আজকের গ্রন্থগুলো আমাকে আর কিছু না দিক তাদের সৎ সঙ্গ তো দিবে। সেটিই বা আমার জন্য কম কিসে।

আমার সেদিনের ভাগ্যের আর তুলনা হয় না। তখন আমার জীবনের কোনও আনন্দকেই আর পরিহার করলাম না। আহা! একটি ফুলগাছে ফুলের কলি এসেছে! এমন ঘটনা কি আর কখনো ঘটেছে? সেই ঘটনার আমি সাক্ষাৎ পেলাম? এমন ভাগ্য আর ক'জনার হয়!

হ্যাঁ, নতুন বসন্তেরও আমি সাক্ষাৎ পেলাম। আর এই বসন্তের সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাতের ঘটনা যেন স্বর্গে আমার পুনর্জন্মেরই একটা ব্যাপার বলে বোধ হলো। বরফ গলা শুরু হতেই আমরা আমাদের গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম এবং লা চারমিটিসকে লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলাম যেন নাইটিঙ্গেল-এর প্রথম স্বরধ্বনিটি আমার শ্রবণের বাইরে থেকে না যায়।

সেই মুহূর্তটি থেকে আমার মন থেকে মৃত্যু চিন্তা অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমি মরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছি বলে যে চিন্তা আমার আগে ছিল, সে চিন্তা আর রইল না। আর আমার নিজেরও ভাবতে অদ্ভুত লাগছে যে তারপর থেকে আর আমার সাংঘাতিক কোনও অসুখ আদৌ হয়নি। হ্যাঁ, আমার দেহে মাঝে মাঝে বেদনার সৃষ্টি হয়েছে। তবু আর আমি শয্যাশায়ী হয়ে পড়িনি। আমার বন্ধুদের আমি বহুবার বলেছি যখন শরীর আমার দুর্বল হয়ে পড়েছে, আমি তখন তাদের বলেছি, যখন তোমরা দেখবে যে আমি মারা যাচ্ছি, মৃত্যু আমার আসন্ন তখন তোমরা আমাকে একটি ওক গাছের ছায়ায় নিয়ে শুইয়ে দিও। তখন দেখবে যথার্থই আমি মরিনি, আমি আবার সুস্থ হয়ে উঠেছি। তোমরা ঠিক জেনো : আমি আবার তখন সুস্থ হয়ে উঠেছি।

আমি তখনো দুর্বল। তবু আমার গ্রাম্য জীবনের কাজকর্ম আবার আমি শুরু করলাম, আমার শক্তিতে যতটা কুলায়। কিন্তু বাগানটাকে পুরো ঠিক করতে পারছিনে দেখে আমি মর্মাহত হয়ে পড়লাম। কয়েক কোদাল মাটি ফেলতেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। শ্বাস-প্রশ্বাসে আমার কষ্ট হতে লাগল। আমার শরীর দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। হাঁটু গেড়ে বসতে গিয়েই দেখলাম আমার হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। মাথায় আমার এত রক্তক্ষরণ হতে লাগল যে আমি আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। এই ঘটনার ফলে শক্ত পরিশ্রমের কাজ আমি বাদ দিলাম। আমি কেবল আমাদের পায়রার ঘরটার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকলাম। এবং এ কাজে আমার কোনও ক্লান্তি এল না। পায়রার ঘরের পরিচর্যার কাজকে আমি ভালবাসতে লাগলাম। ব্যাপারটা আমার জন্য এমন সুখকর হয়ে উঠল যে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়রাগুলোর যত্নে মগ্ন হয়ে থাকতাম। এমন কাজে আমার কোনও একঘেয়েমী আসতো না। কিন্তু পায়রাগুলির চরিত্র এমন যে, ওরা যেমন লাজুক, তেমনি ওদের পোষ মানানো বড় কঠিন। তবু ওদের সঙ্গে আমার একটা সখ্য গড়ে উঠল। আমার পেছন পেছন ওরা হাঁটতো আর যখন যেটাকে ধরতে চাইতাম, তখন সে আমার হাতের মধ্যে ধরা দিত। ওদের কাছ থেকে যখন বেরিয়ে আসতাম তখন ওদের কেবল একটা নয়, বেশ কয়েকটা আমার কাঁধের ওপর এসে বসত। এমনকি আমার মাথার ওপরও। কিন্তু তবুও এদের শক্তির শেষ না থাকলেও আমি বেশিক্ষণ ওদের সহ্য করতে পারতাম না। এক সময়ে ওদের তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হতাম।

আসলে পশুপাখি নিয়ে খেলতে আমার খুব ভাল লাগত। ওগুলোকে পোষ মানাতে, বিশেষ করে পায়রাগুলোকে পোষ মানাতে আমার ভয়ানক ভাল লাগত। ওদের উড়িয়ে দিতে, আমার সঙ্গে ওদের সম্পর্কের মধ্যে যেন কোনও ভয় না ঢোকে সেদিকে আমি সতর্ক থাকতাম। তাই ওরা আমাকে যথার্থই ভালবাসত। আমার সঙ্গ লাভে ওদের কোনও ভয় ছিল না।

এর আগে আমি বলেছি যে এই সময়ে আমি বেশকিছু বই সংগ্রহ করেছিলাম। আর এগুলোকে আমি ফেলে রাখতাম না। এগুলোকে আমি আমার ক্ষমতামত ব্যবহার করার চেষ্টা করতাম। তাদের বুঝার মতো ক্ষমতা তখনো হয়নি। আর তাই তাদের ব্যবহারে আমার গা যত ঘর্মাক্ত হতো, আমার মন তত বিজ্ঞ হতো না। জগৎ সম্পর্কে আমার যে বোধ তখন ছিল তাতে মনে হতো আমার সংগৃহীত অর্থ বুঝতে হলে এই সব গ্রন্থে যে আলোচনা আছে এবং যে সমস্ত গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে এদের রচনা করা হয়েছে, সেই সমস্ত গ্রন্থকে আমার আগে বুঝতে হবে। আসলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তখনো বুঝিনি যে, এই সকল বই-এর রচনাকাররাও জানেন না তারা কী লিখেছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার মূল অপর কোনও বই থেকে তার মর্মার্থ না বুঝে তার রচনার মধ্যে এ অংশ এবং ও অংশকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমার এমন অবুঝ বুঝের ফলে কোনও গ্রন্থের কোনও বাক্য পাঠ করতে গেলে মুহূর্তে মুহূর্তে আমাকে থামতে হতো এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব খুঁজতে সংখ্যাহীন অপর গ্রন্থসমূহকে উল্টে দেখার ইচ্ছা হতো। আর তাতেই আমার বুঝের চাইতে প্রাপ্তি বেশি হতো। অনেক সময়ে এমন হয়েছে যে, একটা বই-এর দশপৃষ্ঠাও শেষ না করতেই এক একটা লাইব্রেরিতে আমাকে ছুটতে হতো, মূলকে উদ্ধারের চেষ্টায়। তবুও আমি আমার এই পাগলামি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারতাম না। তার ফলে আমার জ্ঞান বৃদ্ধির চাইতে আমার সময়ই বেশি নষ্ট হতো। এর ফলে আমার মাথা ঘুরতে শুরু করত এবং তখন আমি আর কোনও কিছুই বুঝতে পারতাম না। ভাগ্য ভাল যে আমার এই পাগলামি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি এবং একেবারে জ্ঞানপাগল হওয়ার আগেই আমি আমার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছিলাম।

আসলে কারোর যদি জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা জাগে, তবে তাকে একথাটা বুঝতে হবে যে জ্ঞানের কোনও অংশই অপর কোনও অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জ্ঞানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে আন্ত:সম্পর্ক বিদ্যমান সে সম্পর্কই যে কোনও শাখাকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। অবশ্য একথা ঠিক যে মানুষের মনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ : সমগ্র জ্ঞানকে কারোর পক্ষেই এক চোটে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় এবং জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের কোনও একটির ওপরই নজর নিবদ্ধ করতে হয়, তবু এই আন্ত:সম্পর্কের বিষয়টিকে আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাছাড়া অপর শাখাসমূহের কোনও কিছু সম্পর্কে সাধারণ ধারণাও না থাকলে, তার কোনও অংশ সম্পর্কেই বিচ্ছিন্নভাবে কোনও জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। আমার এই ব্যর্থ প্রক্রিয়ায় আমি অন্তত: এটি বুঝলাম, যে পদ্ধতিতে আমি হাত দিয়েছিলাম সেটি যথার্থ নয়। সব কিছুকে এক চোটে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমাকে বুঝতে হলো আমার জ্ঞানলাভের এতদিনকার পদ্ধতিকে পরিবর্তন করতে হবে। এক চোটে সব লাভ করার ইচ্ছাটা খারাপ না। তবে সব যে এক চোটে লাভ করা যায় না, এ বোধটিও মূল্যবান।

এই বুঝ থেকে আমি বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার ওপর এবার আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। একটা বিশ্বকোষ ধরে তার মধ্যকার বিভিন্ন বিষয়কে নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলাম। এ ব্যাপারটাও এত সহজ নয়। ভাগ করাই যথেষ্ট নয়। এবার আমি কোনও একটি বিষয় নির্দিষ্ট করে তার যতখানি সম্ভব আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটি বিষয়ে অগ্রসর হতে হতে যতক্ষণ না অপর একটি বিষয়ের সীমানার কাছে পৌঁছলাম, ততক্ষণ তাকে আমি পরিত্যাগ করলাম না। এমনি করে একটি যখন আর একটিতে পরিণত হলো এবং সব মিলিয়ে একটি জ্ঞান সত্তা তৈরি হলো ততক্ষণ আমি এতে নিমগ্ন থাকার চেষ্টা করলাম। এই প্রক্রিয়াতে একটি লাভ আমার এই হলো যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেন একটি সমন্বিত বোধের একটা সাক্ষাৎ লাভ করলাম। এই জায়গাটাতে পৌঁছেই আমি বুঝতে পারলাম কী আমি চাচ্ছি, আর কেন তা পাচ্ছিনে। আমি বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারলাম কেবল পাঠ নয়, পাঠের বিষয়কে অন্তরেও ধারণ করতে হবে : যাকে বলে তার ধ্যানেও আমাকে নিমগ্ন হতে হবে। এই অন্তরে গ্রহণ তথা ধ্যানই আমাকে এবার পথ দেখাতে লাগল। আমি বুঝলাম এই রাস্তায় আমি মরি কিংবা বাঁচি এর কোনও বিকল্প নেই আর হাতেও সময় নেই। তাই সময় নষ্ট করার সময় আমার হাতে নেই। প্রায় ২৫ বৎসর আমি অতিক্রম করেছি। অথচ দেখছি জগতের আমি কিছুই জানিনে এবং মৃত্যু যে কোনও মুহূর্তে এসে আমার সমস্ত প্রয়াসকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। এই বোধ থেকে আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম : যা হয় হবে : সব কিছুই আমাকে জানতে হবে। কেবল আমার শক্তির সীমাকে জানার জন্য নয়। আমাকে জানতে হবে কোন্ জ্ঞান সর্বোত্তম জ্ঞান।

এই সিদ্ধান্তে আমার এমন একটি লাভ হলো যার কথা আমি আগে চিন্তা করিনি; এবার আর সময়ের ক্ষেপণ নয়, যে সময় আমার আছে তার সর্বাধিক ব্যবহার আমাকে করতে হবে। আমি তো আবার জন্মগ্রহণ করতে পারিনে যে, নতুন পদ্ধতিতে আমার জীবন আবার প্রথম থেকে শুরু করব। এবার আমার পদ্ধতিতেই আমাকে চলতে হবে : অপরের পদ্ধতিতে নয়। অপরের পদ্ধতিতে আমি আধা ঘণ্টাও নিবিষ্ট থাকতে পারিনে। কিন্তু আমার নিজের পদ্ধতিতে যেমন অধিকতর সময় নিবিষ্ট থাকতে পারি এবং তা থেকে একটা সার্থকতা বোধও আমার জন্মে। অন্য কোনও লেখকের বই পড়তে গেলে তার কয়েক পৃষ্ঠার পাঠেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাকে জোর করে পড়তে গেলে আমি যেন নিঃশেষ হয়ে যাই। আমার মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে। আমি নিজের চোখে যেন কিছু দেখতেই পাইনে। তার বদলে আমি যদি একই সঙ্গে একাধিক বইতে মন দেয়ার চেষ্টা করি তাতে বরঞ্চ আমার ক্লান্তি আসে না। এদের একজন যদি ক্লান্তি বোধ করে তবে সেখানে ছেড়ে পাশে আর একটা হাতে নিলে মনটা যেন তাজা হয়ে আসে। তখন আর বিরামের দরকার হয় না। আমার পাঠের একটা নিরবচ্ছিন্নতা যেন তৈরি হয়ে যায়। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি বই পাঠের একটা নতুন প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছি। আর এটি চালু করে দেখলাম আমার যেমন বই–এরও অভাব হয় না, তেমনি কোনও ক্লান্তিবোধও আমাকে অসহায় করে তোলে না। ফলে আমি সারাটা দিনই কাজে ব্যস্ত থাকি। অবশ্য বাগানের এবং ঘরের কাজ আমার ব্যস্ততার ক্ষেত্রেও একটা সাহায্যের ভূমিকা রাখে। তবু এর মধ্যেও আমি আমার পাঠের সময়ের ব্যাপারে কোনও অসুবিধা বোধ করিনে। কোনও না কোনওভাবে এই পড়ার সময় বের করে ফেলি। তার মানে এই কাজ এবং ও কাজ দুটোই যেন আমি করতে সক্ষম। তার কিন্তু এটা আমি খেয়াল করলাম না : একাজ ওকাজ দুটো একসঙ্গে করতে গেলে কোনও কাজই ভালভাবে সম্পন্ন করা যায় না।

এই যে খুটিনাটি বিষয় এত বিস্তারিতভাবে আমি বলছি, তাতে আমার আনন্দ হলেও, একথা আমি বুঝি যে, আমার এমন বর্ণনা আমার পাঠকদের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করবে। অবশ্য আমি নিজেকে থামানোর চেষ্টা যে না করছি, তা নয়। সে কথা না বললে আমার পাঠকরা আমাকে সঠিকভাবে ধরতে পারবেন না। এখানে আমার স্মরণে আসছে কতভাবে যে আমি আমার সময়কে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছি, আমার শ্রম যেন বিফলে না যায়। যে বই আমি পড়েছি তা থেকে যেন আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বোত্তম আনন্দকে লাভ করতে পারি। কিন্তু আমার এক বড় দুঃখ এই যে, যখন আমার অসুখ হয়েছিল তখন আমার জীবন ছিল বটে, কিন্তু আমার সময় নষ্ট হয়েছে। সে সময়ে আমি অসুখ ছাড়া কিছুই লাভ করতে পারিনি। এই অসুখের সময়টাতে যেমন আমি আমার অসহ্য বোধ হয়েছে। এভাবে প্রায় দু'তিন মাস আমি কাটিয়েছি আমার মনের ভাবটা বুঝার জন্য। কিন্তু তাতে দুঃখ পাইনি। এমন অলস কর্মহীন জীবনেরও তো একটা লাভ আছে। এমন জীবন কেমন জীবন তা আমি এমন জীবন ভোগ করা ছাড়া কেমন করে উপলব্ধি করতাম। কিন্তু এমন অবস্থায়ও কেবল যে জীবনকে আমি ভোগ করেছি, তাই নয়। আমি সমাজের মাধুর্যেরও আমি সাক্ষাৎ পেয়েছি। এটা ছিল আমার জন্য একটা বিরাট জ্ঞান লাভের ব্যাপার। এমন পর্যায়ের পরে আমার মনে হয়েছে, যেন আমি একটা নতুন সমাজের সাক্ষাৎ লাভ করেছি। একটা নতুন সমাজ আগে আমার কাছে এমন বোধ হয়নি, যেমন এখন বোধ হচ্ছে।

এই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা বরং এখন বাদ দিই। এগুলো থেকে আমি অবশ্যই আনন্দ লাভ করেছি। কিন্তু সে আনন্দ যে কেমন আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করে বলা যায় না। বুঝানো যায় না। এমন আনন্দ কেবল অনুভব করার ব্যাপার, প্রকাশ করার ব্যাপার নয়। আর তাই এর অনুভূতি যত অধিক তীব্র তাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার তত কম হয় : তত প্রকাশ করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। কারণ এমন আনন্দ কোনও ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আনন্দ নয়। এটা হচ্ছে মানসিক ব্যাপার। মনের একটা অবস্থার ব্যাপার। আমি অনেক সময়ে চোখ বন্ধ এই অবস্থার দিকে তাকাই। আমার ইচ্ছা হয় আরো বেশি বেশি করে এবং বেশি করে যেন আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে আরো গভীরভাবে সেই মুহূর্তগুলোকে আমার বোধের মধ্যে আনতে পারি। যাই হোক যখন শেষ পর্যন্ত আমার নিজেকে নিয়ে নিজের এই খেলা শেষ করতে সক্ষম হলাম তখন আমি আমার দিনের সময় ব্যয় করার একটা নিয়ম আমি দাঁড় করাতে সেই নিয়মের কথা বলতে গেলে বলব, প্রত্যেক দিন সূর্য ওঠার আগেই আমি উঠতাম এবং পাশের একটা বাগানের মধ্য দিয়ে, বাগানের উপরের দিকের একটা রাস্তায় গিয়ে পৌঁছতাম। এই রাস্তাটা শেষ হতো পায়ের পথেই চেম্বারীতে। সেখানে পৌঁছে আমি আমার প্রার্থনা উচ্চারণ করতাম। আমার প্রার্থনায় কোনও শব্দ উচ্চারিত হতো না। আমার প্রার্থনায় আমার আত্মা উন্মুখ হয়ে উঠত এই বিশ্বচরাচরের স্রষ্টার প্রতি। একটা ঘরে আবদ্ধ হয়ে কখনো আমি প্রার্থনায় রত হতে ভালবাসতাম না। তেমন হলে চারদিকের দেয়াল আর মানুষের তৈরি নানা দ্রব্যসামগ্রী স্রষ্টা এবং আমার মধ্যে একটা ব্যবধানে যেন সৃষ্টি করত। আমি স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে আমার ভালবাসাকে প্রত্যক্ষ করতাম। তখন আমার আত্মা তার উদ্দেশ্যে উন্মুখ হয়ে উঠত। আমার বলতে দ্বিধা নাই, আমার এমন প্রার্থনায় কোনও কৃত্রিমতা থাকতো না। আমার প্রার্থনা ছিল পবিত্র এবং সে প্রার্থনা স্রষ্টার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হতে পারত না। যেমন আমার নিজের জন্য, তেমনি তাকে আমি ভালবাসতাম তার জন্য একটি শান্তিময় জীবন ব্যতীত আর কিছু আমি কামনা করতাম না। আমার এই প্রার্থনার মধ্যে কোনও অবাঞ্ছিত কিছু, কোনও দুঃখ বা অভাবের যাচনা থাকতো না। আমার কেবল প্রার্থনা হতো আমি এবং ভালবাসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাত্রী একটি মহৎ মৃত্যুতে নি:শেষিত হতে পারি এবং পরজন্মেও যেন আমরা এমন জীবন যাপন করতে পারি। এটাই ছিল আমার প্রার্থনা। এর বাইরে এই জগতের সব কিছুতে আমার বিস্ময়বোধ এবং আরাধনার অধিক আর কিছু থাকত না। কারণ আমার এমন একটা বোধ ছিল যে যিনি আমাকে দিবেন তিনি যা দিবেন তা আমার যোগ্যতার কারণেই আমাকে দান করবেন, আমার প্রার্থনার কারণে নয়। আমার এমন বোধ নিয়েই আমার চতুর্দিকের প্রকৃতির রাজ্যে ঘুরে বেড়াতাম। প্রতিটি আবর্তনে আমি যেন সূচনাতেই প্রত্যাবর্তন করতাম। কোনও দূরত্বকে অতিক্রম করা নয়। আর এমন পুনরাবর্তনে আমার কোনও ক্লান্তি আসত না। যদি দিন হতো তবে আমি মামার জানালার পানে তাকাতাম। যদি দেখতাম তার ঘরের জানালা উন্মুক্ত হয়েছে, তবে আমি সেই উন্মুক্ত জানালার উদ্দেশ্যে আমি ছুটে যেতাম। তখন আর আমার আনন্দের সীমা থাকত না। যদি দেখতাম তার জানালা তখন বন্ধ তবে আমি তার জানালার পার্শ্বে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষারত থাকতাম যতক্ষণ না মাথা তার চিন্তা থেকে জাগরিত হয়। অপেক্ষার এই সময়টাতে আমি আমার বিগত দিনের পাঠের পুনরাবৃত্তি করতাম কিংবা তার বাগানের পরিচর্যায় নিজেকে নিযুক্ত করতাম। তার দরজা যখন খুলে যেত আমি তখন ছুটে গিয়ে তার হাত দু'টিকে চুম্বন করতাম। হয়ত তিনি তখনো আধো নিদ্রায় নিদ্রিত থাকতেন। তবুও আমার চুম্বনের পবিত্রতা এবং তার নম্রতায় বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটতো না। তখন আমার অনুভূতিতে পবিত্রতা ব্যতীত প্রবৃত্তির কোনও আনন্দের বোধ আমার মধ্যে অনুভূত হতো না। মামার আর আমার প্রাত:রাশ সাদা কফিতেই সম্পন্ন হতো। সেই প্রাত:রাশের পরে আবার আমরা বিশ্রামে নিমগ্ন হতাম। আমরা দু'জনে নানা কথা আর গল্পে মেতে উঠতাম। আমাদের গল্পের যেন শেষ হতো না। খাওয়ার টেবিল ছেড়ে যেন উঠতেই পারতাম না। তখন থেকেই প্রাত:রাশের প্রতি আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রাত:রাশের নানা দেশীয় বৈচিত্র্য আছে। ইংল্যান্ড আর সুইজারল্যান্ডের প্রাত:রাশ যেন একটা পুরো আহার। খাওয়ার টেবিলে পরিবারের সকলে এসে সমবেত হয়। ফরাসিদের কায়দাটি হচ্ছে প্রত্যেকে একাকী তার নিজের ঘরে বসে আহার করবে। আবার অনেক সময় এমন হয় যে তারা প্রাত:রাশ বলে কিছু খায়ই না।

আমি মামার সঙ্গে এক ঘণ্টা কিংবা দু'ঘণ্টা নিবিড় গল্প করে আমার পড়ার ঘরে চলে যেতাম এবং সেখানে ডিনারের সময় না আসা পর্যন্ত আমি পাঠের রাজ্যেই মগ্ন থাকতাম। পাঠের ক্ষেত্রে আমি শুরু করলাম প্রথমে দর্শনের গ্রন্থ নিয়ে। প্রথমে ধরলাম পোর্ট রায়লের লজিক, তার পরে লকের নিবন্ধ, মালেব্রাঙ্কে, লাইবনিজ কিং ডেকার্ডের যুক্তিশাস্ত্র। এদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কিছুকালের মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম এই জগতের যুগপুরুষরা যেন একের বিরুদ্ধে অপরকে খণ্ড-বিখণ্ড করার খেলাতেই অধিক আগ্রহ বোধ করেন। ফলে আমি বুঝলাম দ্বন্দ্বে রত এই বীরবৃন্দের মধ্যে কোনও সমঝোতা সৃষ্টির আমার যে আকুলতা, তা ভিত্তিহীন। তার পেছনে পরিশ্রম ব্যয় করে আমার কোনও লাভ হবে না। তাতে কেবল আমার সময়েরই অপচয় ঘটবে। আমার এমন চেষ্টায় আমার মাথা ঘুরতে লাগল। যা আমি চাচ্ছি সে পথে আমার ইঞ্চি পরিমাণ অগ্রগতির সাধন ঘটল না। শেষ পর্যন্ত এমন উদ্যোগ আমি ছেড়ে দিলাম। এপথ পরিত্যাগ করাতে আমার লাভই ঘটল। আমার পাণ্ডিত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না। তবু যা আমি একটু কাজ করতে সক্ষম হয়েছি, তা কেবল পণ্ডিতজনদের মধ্যকার কলহ বন্ধ করার অপচেষ্টা পরিত্যাগের পরেই মাত্র। আমি জানি আমি কোনওদিন নিজেকে পণ্ডিত বলে দাবি করিনি।

আমি এই সমস্ত পণ্ডিতজনের গ্রন্থাদি পাঠ করে বুঝলাম : এদের কাউকে আমি তারা যা বলছেন, তার চাইতে সমৃদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হব না।

অবশ্য আমার এমন পদ্ধতিতে ত্রুটি যে ছিল না, তা নয়। তবু আমি নিজেকে বললাম : বাদ দাও ওসব কূটতর্ক। বরং এসো আমরা দুর্বোধ্য কূটতর্ক বাদ দিয়ে সরল চিন্তার কথা ভাবি। সরল চিন্তা যা বোধ্য। দুর্বোধ্য নয়। যে সরলকে আমি বুঝতে পারি তাদের শেষ করার পরেই মাত্র তাদের একটির সঙ্গে অপরটিকে তুলনা করে বিচার করতে আমি সক্ষম হব। এভাবে কয়েক বছর অতিক্রম করার পর আমি দেখলাম আমার এমন স্বশিক্ষার পদ্ধতিতে আমি বেশ লাভবান হয়ে উঠছি। এবার আমি পাঠের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়ার মূল্য অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম। এর পরবর্তী সময়ে যখন কোনও পুস্তক পাঠেরই আমার সুযোগ ঘটল না, তখন আমার নিজের সংগৃহীত জ্ঞানকে পরিমাপ করার চেষ্টা করলাম। আমার যুক্তির কষ্টিপাথরে আমি তাদের মূল্যায়নের চেষ্টা করলাম। এখন আমি আমার পঠিত পথিকৃৎদের ওজন করার চেষ্টা করলাম। আমি দেখলাম আমার অপচয়িত বয়সে এভাবে আমার এভাবে শুরু করার কারণে আমার বিশ্লেষণী ক্ষমতার তেমন কোনও ক্ষতি ঘটেনি। পরবর্তী সময়ে আমার চিন্তাকে যখন আমি প্রকাশ করলাম তখন কেউ আমাকে অপরের অন্ধ অনুকারী বলে সমালোচনা করেননি। পিথাগোরাস[১০] সম্পর্কে উচ্চারিত কথা স্মরণ করে আমি বলতে পারি পিথাগোরাসের মতো কোনও বৃহৎ ব্যক্তির মূর্তিকে সংরক্ষণের চেষ্টায় আমি নিজেকে অপচয়িত করিনি।

এই পর্যায়ে আমি প্রাথমিক জ্যামিতিতে মনোনিবেশ করি। অবশ্য এই প্রাথমিক স্তরকে আমি আর অতিক্রম করতে পারিনি। তবে আমি আমার পঠিত বিষয়াদিকে যেন বিস্মৃত না হই, সেজন্য যা আমি পাঠ করেছি তাকে বারংবার পাঠ করার অভ্যাসকে আমি কখনও পরিত্যাগ করিনি। আমি অবশ্য ইউক্লিডকে ছোট করতে পারিনি। আমার কাছে মনে হলো ইউক্লিডের চিন্তা যত না কোনও ধারণাকে স্থাপন করার ওপর তার অধিক চিন্তা হচ্ছে কোনও কিছু প্রমাণের শেকল সৃষ্টি করা। আমার কাছে ভাল লাগল যাজক ল্যামীর জ্যামিতি। এই যাজক ল্যামীকে তখন থেকে আমি ভালবাসতে লাগলাম এবং এখনও তাকে বারংবার পাঠ করতে আমার ভাল লাগে। আমি আর একটু অগ্রসর হতে যখন সক্ষম হলাম তখন আমি ধর্মযাজক রেমন্ডের হিসাববিজ্ঞানর প্রতি আকৃষ্ট হলাম এবং তার বিশ্লেষণ পদ্ধতিকেও আমার কাছে বোধগম্য মনে হলো। আসলে আমি তেমন ভালভাবে জ্যামিতির ওপর বীজ গণিতের প্রয়োগকে অনুধাবন করতে সক্ষম হইনি।...

এর পরে আমি শুরু করলাম ল্যাটিন।

ল্যাটিনে গিয়ে আমি দেখলাম : এ বড় কঠিন ব্যাপার। আমি ল্যাটিন পাঠ ছাড়লাম না বটে, তবু ল্যাটিনকে আমি তেমন কাবু কখনও করতে পারিনি, একথা আমাকে বলতে হবে। গোড়ার দিকে শুরু করেছিলাম, যাকে বলে 'পোর্ট রয়্যাল পদ্ধতি' তাই দিয়ে। কিন্তু তাতে তেমন কোনও ফল পেলাম না। মনে হলো যেন কোন বর্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার পাল্লায় আমি পড়েছি। ল্যাটিন কবিতার কোনও ছত্রই আমি স্মরণ রাখতে পারতাম না। আসলে আমার কিছু মুখস্থ করা বা স্মরণ রাখার কোন ক্ষমতাই ছিল না। আর যার কোনও স্মরণশক্তি নেই তার পক্ষে কোনও ভাষার কোন শব্দমাত্র পাঠ করার আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে না। আর গোড়াতে আমার স্মরণশক্তি বাড়াবাড়ির জন্যই যেন জোর করে ল্যাটিন পাঠ করতে লাগলাম। কিন্তু তাতে ফল কিছু হলো না। ফলে শেষপর্যন্ত ল্যাটিন পাঠ আমি ছেড়েই দিলাম। অবশ্য যতখানি পাঠ করেছি, তা যে একেবারে নিষ্ফল হয়েছে, এমনও নয়। অভিধানের ডিগ্রিতে দু'একজন সহজপাঠ্য লেখকের লেখা আমি পাঠ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এভাবে আরও কিছুদূর এগুলাম। আমি যে ল্যাটিন থেকে খাতায় কোনও কিছু অনুবাদ করেছি তা নয়। আমি মনে মনে অনুবাদ করতাম। এভাবে বেশ কিছু ল্যাটিন লেখকদের লেখা পাঠ করতে পেরেছি। কিন্তু তবুও ল্যাটিনে কথা বলা বা কিছু লেখার ক্ষমতা আমি আয়ত্ত করতে পারিনি। এর ফলে কোনও বৈঠকে আমাকে বেশ বিব্রত অবস্থায় পড়তে হয়েছে।...

দুপুরের আগে আমি বই পড়া শেষ করতাম। দুপুরের খাবার তৈরি না হলে আমি আমার প্রিয় পায়রার পরিবারে গিয়ে উপস্থিত হতাম। এছাড়া আমার আর একটি ছোট পরিবার ছিল : মৌমাছির পরিবার। বাগানের নিচের দিকে। আমি কোনওদিন তাদের না দেখে থাকতে পারতাম না। অনেক সময়ে মৌমাছিগুলোকে দেখার জন্য মামাও আমার সঙ্গে যেতেন। ওদের কাজ কারবার দেখতে আমার বেশ ভাল লাগত। ওরা যখন নানা ফুলের গাছ থেকে ওদের পাতায় মধু ভরে একেবারে ভারি পায়ে চাকে আসত তখন তা দেখে আমি খুব মজা পেতাম। গোড়ার দিকে মৌচাকে একেবারে কাছে গিয়ে আমি ওদের কাণ্ড দেখতে চাইতাম। আমার এমন কৌতূহলকে ওরা যে সবসময় পছন্দ করত তা নয়। গোড়াতে আমার হাতে, গায়ে হুল ফুটাতে ওরা কসুর করত না। কিন্তু ক্রমে ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় গভীর হতে হুল না ফুটিয়ে আমর হাতে, মুখে, গায়ে বসত। আসলে সকল প্রাণীই মানুষকে তাদের শত্রু মনে করে। ওদের এমন সন্দেহ যথার্থ। মানুষ আসলে প্রাণী মাত্রেরই শত্রু। তবে ওদেরও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আছে। যখন ওরা দেখে কোনও মানুষ ওদের জ্বালাতন করতে চায় না, জ্বালাতন করে না তখন ওরা মানুষের বন্ধু হয়ে ওঠে। যখন বুঝে মানুষ ওদের আঘাত করতে চায় না, তখন মানুষের প্রতি ওদেরও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তখন কোনও মানুষের পক্ষেও ওদের বন্ধুত্বকে স্বীকার না করে উপায়ও থাকে না। কেবল বর্বর বাদে অপর কেউ মৌমাছির প্রতি তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে না।

দুপুরের পরে আবার আমি আমার বই-এর জগতে ফিরে যেতাম। অবশ্য বিকেলের এই কাজকে বই পড়ার কাজ বলেও অভিহিত করা চলে না। এ সময়টাকে আমার মনে হতো আনন্দের সময়, উপভোগের সময়। কোনও কাজের সময় নয়। আহারের পরে আমার ঘরে কোনও কাজে আমার পক্ষে মন বসানো সম্ভব হতো না। সাধারণভাবে বললে গরমের মধ্যে আমার কোনও কাজ করতে ভাল লাগত না। গরমে আমি ভারি কষ্ট পেতাম। তবুও বই পড়াতে আমি ক্ষান্ত হতাম না। এমন পড়ায় যে কোনও শৃঙ্খলা বা নিয়ম ছিল, তা নয়। তবে স্মৃতি থেকে বলছি এমন পাঠের ক্ষেত্রে আমার ভাল লাগত ইতিহাস এবং ভূগোল পাঠ বেশি। আর যেহেতু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস আর ভূগোল পাঠে তেমন পরিশ্রমও লাগত না, তাই আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তি দিয়ে আমার পক্ষে এই সব গ্রন্থকে যত পাঠ করা সম্ভব, আমি তত তা পাঠ করার চেষ্টা করতাম।

[ধর্মীয় পুস্তকাদি পাঠ থেকে রুশোর মনে নরক আর স্বর্গ সম্পর্কে একটা ভীতির সঞ্চার হয়।]

ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠে ধর্ম সম্পর্কে আমার যে কোনও অবিশ্বাস জন্মেছিল, তা নয়। তবু আমি নিজেকে ধার্মিক বলে কখনও বিবেচনা করিনি। আমি মরলে পরে স্বর্গে যাব, না নরকে সেটা স্থির করার আমার একটি বিশেষ কৌতুকজনক কায়দা ছিল। আমি কোনও একটা গাছ নির্দিষ্ট করে ঢিল ছুঁড়তাম। আমার ছোঁড়া ঢিলটা গাছের গায়ে আমার নির্ধারিত স্থানে গেলে আমি স্বর্গে কিংবা নরকে যাব তা স্থির করতাম। এই কায়দায় আমি আমার ইচ্ছামতো স্বর্গ বা নরক গমন স্থির করতে পারতাম। ঢিল ছোঁড়ার আগে নিজের মনকে বলতাম, যদি ঠিক জায়গায় লাগে তবে নিশ্চয় আমার স্বর্গবাস ঘটবে। আর যদি না লাগ তবে নরকবাস। এসবের স্মৃতিচারণে এখন আমার হাসি পাচ্ছে। তবু এটাও ঠিক, এমন কারবারে আমার সময় কেটে যেত। সময় আমার মনের ওপর ভারি হয়ে চেপে বসতে পারত না।

[১৭৩৭-১৭৪১ : এই সময়ে কিছুদিনের জন্য রুশো জেনেভা গিয়েছিল, বিশেষ করে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে। সেখান থেকে সে তার 'মামা'র কাছে ফিরে আসে এবং জেনেভায় যা কিছু অর্থ সম্পদ সে লাভ করেছিল তার সবই মামার হাতে তুলে দেয়।]

কিন্তু এই সময়ের যেটা আসল স্মৃতি, তা হলো আমার শরীর ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। আমি যেন ক্রমশ শুকিয়ে যেতে লাগলাম। আমার শরীর দেখতে হয়ে উঠল একটা মরা মানুষের কঙ্কালের মতো। আমার শরীরের শিরাগুলোর কম্পন ভয়ানক হয়ে দাঁড়াল। আমার হৃদযন্ত্রের কম্পনও আরও ঘন ঘন হতে লাগল, আমি অধিকতরভাবে শ্বাসকষ্টে ভুগতে লাগলাম। আমার দুর্বলতা এত বৃদ্ধি পেল যে, আমার পক্ষে হাঁটা প্রায় অসম্ভব হয়ে আসত। আমি মাথা নিচু করতে পারতাম না। নিচু হওয়ার চেষ্টা করলে আমার মাথা ঘুরতে শুরু করত। কোনও সামান্য ওজনের বস্তুও আমি তুলতে পারতাম না। আমি একেবারে নিষ্কর্ম হয়ে পড়লাম। তাতে আমার মতো অস্থির মানুষের মনে যন্ত্রণার আর শেষ রইল না। আমার সন্দেহ হলো আমি হিস্টেরিয়া বা মৃগী রোগের শিকারে পরিণত হয়েছি। আমি ভাবতাম এই রোগ হয় সুখী মানুষের। আমার মতো দুঃখী মানুষের জীবনে শেষপর্যন্ত এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে শুরু করল। আমার চোখে ক্রন্দনের কোনও কারণ ছাড়াই হঠাৎ পানি জমতে শুরু করত। গাছের একটি পাতার পতনে কিংবা একটি পাখির ডাকে, বলা চলে একেবারে সুখের অবস্থাতেও আমার মনে আবেগের সঞ্চার হতো, একে আমি মৃগী রোগের লক্ষণ বলেই মনে করতাম। আসলে এই জগতে আমার মতো মানুষের সামান্যতম সুখেরও ভাগ্য হয় না। ফলে কখনও যদি সামান্যতম সুখ বা দু:খের কারণ ঘটে তাহলেই আমাদের মনে একটা অস্থিরতার ভাব জন্মে। সুখ আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু:খের আগমন যদি একই সঙ্গে না ঘটে, তাহলেও একটি আর একটিকে প্রভাবিত করে। ফলে আমার জীবনে যখন কোনও সুখ বা আনন্দের ঘটনা ঘটত তখনও তাতে ক্রন্দনের অবস্থার উদ্ভব অপর মানুষের কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য বলে বোধ হতো। পরবর্তী সময়ে দেখা গেল, আমার বয়স বৃদ্ধিতে, আমার যখন বয়স হলো প্রায় ষাট, তখনও আমার শরীরের সুখ-দুঃখ বোধের শক্তি যেন বৃদ্ধি পেতে লাগল। আজ যখন প্রায় ষাট বছর বয়সে সুখ-দু:খের এমন অবস্থার স্মৃতিচারণ করছি তখনও যেন আমার মনের মধ্যে একটা আবেগের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে আমি বুঝলাম আনন্দ আর সুখকে ভোগ করার শক্তির চাইতে আমার মধ্যে যেন দুঃখ এবং কষ্টকে ভোগ করার শক্তিটাই অধিক ছিল।

[এই সময়ে একজন খ্যাতিমান চিকিৎসককে তার শরীরের অবস্থা সম্পর্কে পরামর্শের জন্য যখন ডাকা হচ্ছিল, তখন পথিমধ্যে গাড়িতে তার দু'জন চমৎকার মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে।]

এ দু'জনের মধ্যে মাদাম দ্য লারেন্সের কথা মনে আছে। ইনি আমাকে দস্তুর মতো দখল করে ফেললেন। তখন থেকে আমার মধ্যে আর কোনও রোগের প্রকাশ ঘটল না। না জ্বর, না হিস্টোরিয়া, না পলিপট। ওর সঙ্গ যখন পেতাম তখন আমার মধ্যে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পাওয়া ব্যতীত কোনও রোগের উপসর্গই আমি দেখতে পেতাম না। তার সঙ্গ লাভ যথার্থই আমার হৃদযন্ত্রের স্পন্দনকে বৃদ্ধি করে দিত। তিনিও আমার এই রোগটিকে সারাবার কোন চেষ্টা করতেন না। আমিও তার সঙ্গে আমার হৃদস্পন্দনের বৃদ্ধিকে কামনা করতেই লাগলাম। অবশ্য আমার শারীরিক দুর্বলতার ব্যাপারটাই তাদের আলোচনার বিষয় ছিল। তারা বুঝলেন, আমি অবশ্যই অসুস্থ। আমি মন্টিমিলিয়ারের দিকে যাচ্ছিলাম। তাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতায় তারা একথা বুঝলেন যে আমি কোনও খারাপ লোক নই। আমি কোন প্রকার লাম্পট্যসম্পন্ন চরিত্র নই। আর আমি যে আমার লাম্পট্য সংশোধনের জন্য মন্টিমিলায় যাচ্ছিনে, তা তারা বিশ্বাস করলেন। আমি জানি কারও কোনও রোগ তাকে অন্য কারোর বিশেষ করে কোন মহিলার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে না। তবু একথা সত্য যে আমার রোগটাই যেন এই দু'জন ভদ্রমহিলার কাছে আমাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। সকাল হলেই আমি রাতে কেমন ছিলাম তা জানতে চেয়ে তারা লোক পাঠাতেন।

একবার এমন হলো যে, আমার স্বভাব অনুযায়ী কোনও চিন্তা না করে কথা বলার যে স্বভাব, সেই স্বভাব থেকে আমি বললাম : আমি জানিনে। আমার এমন জবাবে তারা মনে করলেন : আমি একটা পাগল। তারা দু'জনেই আমাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে লাগলেন। তাদের এমন আচরণে আমি কিছু মনে করলাম না। আমি একবার শুনলাম মাদাম দু কলাম্বিয়ার তার এক বন্ধুকে আমার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন : লোকটার ব্যবহার ভাল নয়। তবু লোকটা খারাপ নয়। লোকটার একটা আকর্ষণ আছে। তাদের এই কথা শুনে আমি খুশিই হলাম এবং তার ফলে আমার আচারণে সাহসও বেশ কিছু বৃদ্ধি পেল।

আমাদের ঘনিষ্ঠতা যখন আরও বৃদ্ধি পেল তখন আর আমার নিজের সম্পর্কে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে বাঁধল না। আমি কেন, কোত্থেকে এসেছি সবই আমি বললাম। আমার এমন আলাপে আমি যে কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়িনি, তাও নয়। কারণ আমি বুঝলাম আমি ধর্মান্তরিত হয়েছি একথা বললে এই কেতাদুরস্ত মহিলাদের মধ্যে আমার অবস্থা যে কাহিল হয়ে পড়বে, তা আমার বোঝা উচিত ছিল। আমি জানি না কেন আমি আমার আলাপে নিজেকে একজন ইংরেজ বলে পরিচয় দিয়েছিলাম। আমি এমনও বললাম যে, আমি একজন জ্যাকোবাইট বা জ্যাকোবাইটপন্থী[১১]। আমি বললাম, আমি একজন ডাডিং। একথা শুনে তারা আমাকে মিস্টার ডাডিং বলতে শুরু করল। সমবেতদের মধ্যে একজন ছিল বিভ্রান্ত রকমের এক মারকুইস দা তোরিগনান। সে আমাদের দলেই ছিল এবং আমার মতোই এক অক্ষম। আমি জানি না কোন্ চিন্তা থেকে মিস্টার ডাডিং-এর সঙ্গে আলাপে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। সে রাজা জেমস্ সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করল। রাজা জেমসকে বলা হতো মিথ্যাবাদী রাজা। অর্থাৎ রাজা হওয়ার তার কোনও দাবি ছিল না। সেন্ট জারমেইন সম্পর্কেও সে যেন কী বলল। আমি তার বিন্দু বিসর্গ বুঝলাম না। আমি আসলে তখনকার ইংল্যান্ডের রাজনীতি সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। কিছুই বুঝতাম না। ফলে আমি যেন একটা ফাঁদে আটকে গেলাম। ইংল্যান্ড সম্পর্কে যা আমি জানতাম সবটারই দৌড় ছিল ইংল্যান্ডের তখনকার সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত কিছু ঘটনা। কিন্তু তবু একথা বলতে হয় যে ইংল্যান্ড সম্পর্কে আমার এই যৎসামান্য জ্ঞানের আমি বেশ ভাল রকমই ব্যবহার করতে সক্ষম হলাম। আমার ভাগ্য ভাল এদের কেউ আমার ইংরেজি ভাষার জ্ঞান সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন উঠাল না। করলে আমার নাস্তানাবুদ হওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। কারণ ইংরেজি ভাষার একটা শব্দও আমার জানা ছিল না।

[এদের মধ্যে মাদাম দা' লারনেজ নামের এক মহিলা বারংবার রুশোর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল। রুশো তাকে তেমন পাত্তা দিল না। রুশোর মনে হচ্ছিল যেন সে রুশোকে নিয়ে কৌতুক করার চেষ্টা করছে।]

কিন্তু এই মাদাম দা' লারনেজ তবু হাল ছাড়ছিল না। সে বারংবার আমার দিকে ভাবময় ভঙ্গিতে কেবল তাকাচ্ছিল এবং এমন নরমভাবে আমাকে সম্বোধন করছিল যে, আমার চাইতে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তার কথাকে আদৌ গুরুত্ব দিত না। কিন্তু সে আমাকে আদৌ ছাড়ছিল না। ফলে সে যত অদম্য হয়ে উঠছিল, আমি যেন তত তার ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে লাগলাম। মহিলা বলল : আহা তুমি যা বলছ তার কিছুমাত্র যদি সত্য হতো তাহলে আমি নিজেকে একজন ভাগ্যবতী বলে গণ্য করতাম। আমার মনে হয় আমার সরলতাই তাকে মুগ্ধ করে তুলছিল এবং কোনক্রমেই সে তার এই কসরতে আর হার মানতে রাজি হচ্ছিল না।

আমরা ইতোমধ্যে মাদাম দা কলোবিয়ার রোমান্স এর বাসা পরিত্যাগ করে এসেছিলাম। আমরা আমাদের যাত্রা আস্তে ধীরে চালাতে লাগলাম। আমরা বলতে : মাদাম দা লারনেজ, মারকুইস দা' তরিগনান এবং আমি।
মারকুইস অবশ্য একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন, আবার তার খুঁতখুঁতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বভাবেরও বৃদ্ধি ঘটছিল, তবুও লোকটিকে আমার খারাপ লাগছিল না। তবে নিজে অন্য লোকের সঙ্গ তেমন পছন্দ করতেন না।

মাদাম দা নারনেজকে দেখলাম, আমার প্রতি তার আকর্ষণটি লুকিয়ে রাখার তেমন কোনও প্রয়োজন তিনি বোধ করলেন না। অবশ্য এ ব্যাপারটি সম্পর্কে আমার চাইতে তিনি আগেই অবহিত হয়েছিলেন। তাতে ভদ্রমহিলার আকর্ষণের চাইতে আমার প্রতি তার ঠাট্টার ভাবটি আমার মনের মধ্যে একটা সাহসের সঞ্চার করেছিল। আমার মনের মধ্যে যেন কী রকম একটা বিকারের সৃষ্টি হয়েছিল। আমার মনে হলো যেন ওরা আমাকে নিয়ে কী একটা খেলা খেলতে চাচ্ছে। আমার এমন অর্থহীন ধারণা আমার মাথাটাকে যেন একেবারে ঘুরিয়ে দিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না, মাদাম দা লারনেজ কেমন করে আমার এরূপ অদ্ভুত আচরণ সহ্য করছিলেন। তিনি তো আমাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে দিতে পারতেন। কারণ তিনি তো বুদ্ধিহীনা ছিলেন না। তিনি তো বুঝতে পারছিলেন যে তার প্রতি আমার আচরণে যত না প্রশ্রয় ছিল, তার অধিক ছিল প্রত্যাখ্যান।

শেষপর্যন্ত দেখলাম মাদাম দা লারনেজ তার সহ্যশক্তি দিয়ে আমাকে সে যথার্থই কবজা করে ফেলল। আমরা সময় মতোই ভালেন্স পৌঁছাতে পেরেছিলাম। মধ্যাহ্নভোজে আমাদের কোনও অসুবিধা হলো না এবং আমাদের বুদ্ধিমত্তার কারণে আমরা সাথ সাথে জায়গাটা পরিত্যাগ না করে সারাদিনটাই আমরা ওখানে কাটিয়ে দিলাম। আমরা শহরের বাইরে সেইন্ট জেইনসে তাঁবু খাটালাম। এই সরাইখানাটাকে আমি জীবনে বিস্মৃত হব না। মাদাম দা লারনেজ যে ঘরটায় ছিলেন, সে ঘরটাও আমার স্মৃতিতে অমর হয়ে রইল। মধ্যাহ্ন আহারের পরে মাদাম দা লারনেজ আমাকে নিয়ে একটু হাঁটতে বেরুলেন। তিনি জানতেন মারকুইস এমন হাঁটা তেমন পছন্দ করবেন না। আসলে এটা ছিল তার নিজের জন্য একটু সময়ের বিলাসকে জোগাড় করা। আর এই সময়টাকে আনন্দের সঙ্গেই ব্যবহার করলেন। কারণ তিনি জানতেন হয়তো সময় আমাদের আর বেশি ছিল না। আমরা শহরটা ঘুরে বেড়ালাম। দুর্গটা ঘিরে একটা পরিখা ছিল, সেটিও আমাদের ভাল লাগল। আমি মাদামকে আবার আমার দু:খের সব কাহিনী বলতে লাগলাম। আমার দু:খের কথায় মাদাম যথার্থই সমবেদনা প্রকাশ করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তিনি আমার হাত তার বুকে চেপে ধরলেন। তার এই ব্যবহারেই আমি আপ্লুত বোধ করতাম। কারণ আমি তার আচরণের গভীরে প্রবেশ করার কোনও বুদ্ধি রাখতাম না।

আসলে আমি নিজেই অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম। আমি আগেই বলেছি, তার দেহ সৌষ্ঠবের একটা আকর্ষণ ছিল। তার ভালবাসার প্রকাশ তাকে আমার কাছে অধিকতর সুন্দর করে তুলছিল। তার আচরণ তাকে তার তারুণ্যে নিয়ে যেতে লাগল। এবং তার প্রতি আকর্ষণ এত গভীরভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন যে সেই প্রকাশে আর যে কোনও পুরুষই আপ্লুত না হয়ে পারত না। ফলে আমার মধ্যে একটা বিব্রতবোধ যেন সৃষ্টি হচ্ছিল আর মাঝে মাঝেই তার প্রতি আমার একটা আগ্রহ যেন বৃদ্ধি পাচ্ছিল যা আমি না পারছিলাম দমন করতে, না তা নিয়ে আরও অগ্রসর হতে। একটা ব্যাপার দেখলাম মাদামের প্রতি আমার এই আকর্ষণ ও আচরণ মারকুইস বেশ কৌতূকের সঙ্গে উপভোগ করছিলেন। এর অধিক আমাকে প্রতি নিবৃত্ত করছিল এই আকর্ষণ পাছে না আমার এমন আচরণে শেষপর্যন্ত আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার এক হাসির খোরাকে পরিণত হয়ে যাই। আমি যেন একটা ভাসন্ত ভেলায় পরিণত হয়ে যাচ্ছিলাম।

আসলে আমার এমন আচরণকে যেন বোধ করতে পারছিলাম না। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার এই আচরণের পরিণাম খুব ভাল হবে না। তবুও আমার ভাগ্য ভাল যে, মাদাম আমার প্রতি কোন দুর্ব্যবহারের বদলে আমার প্রতি যেন দয়াপরবশ হয়ে উঠছিলেন। সুখের বিষয় আমি দেখলাম আচম্বিতে মাদাম লারনেজ তার হাত

আচম্বিতে মাদাম লারনেজ তার হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন এবং সাথে সাথে তিনি তার মুখকে আমার মুখের ওপর চেপে ধরলেন

দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন এবং সাথে সাথে তিনি তার মুখকে আমার মুখের ওপর চেপে ধরলেন। এবার তার নিজের আলাপে আর কোনও সঙ্কোচ রইল না। ফলে আমারও সাহসের কোনও অভাব ঘটল না। এই মুহূর্তটা ছিল চরম মুহূর্ত। আমিও যেন তার বন্ধনে গলে যেতে লাগলাম। আমি যথার্থই পুরুষ হয়ে উঠলাম। আম চুম্বন, আমার মুখ ও জিহ্বা কোনওটাই আর বাধ মানল না। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমি তাকে আঘাত করতে কসুর করলাম না। এমন সাহস আমি কেমন করে পেলাম, আমার স্মৃতির সেটিই এখন একমাত্র প্রশ্ন। এবার আমার বিজয় যে পূর্ণ হলো আর তার আঘাতে মাদাম যদি কিছুটা আহত হয়ে থাকেন তাতে যে তিনি একটুও রাগান্বিত হচ্ছিলেন না, তা বুঝতেও আমার কোন অসুবিধা হচ্ছিল না।

আমি যদি একশ' বছরও বাঁচি তবু আমি এমন মনমোহনকারী মহিলার কথা বিস্মৃত হতে পারব না। তার স্মৃতিতেই আমার আনন্দ। আমি মনমোহিনী কথাটি বললাম। এর একটা কারণ আছে। একথা ঠিক মহিলাটি যে খুব সুন্দরী ছিল, এমন নয়। সুন্দরীও নয়। আবার যেমন বয়স্ক নয়, তেমনি দেখতে অসুন্দর নয়। তা সত্ত্বেও তার মুখের ভাবটিতে এমন কিছু ছিল না যাতে তার বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে কোনও বাধা সৃষ্টি হতো। অন্য কোনও মেয়ের তুলনায় তার মুখে কোন তারুণ্য বা লাবণ্য ছিল না। সে মুখে রুজ ব্যবহার করত। তাতে যে তার মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেত তেমনও নয়। তথাপি তার সহজ সারল্যের একটা আকর্ষণ ছিল। আর সেই সারল্য দিয়েই সে আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ভালবাসার প্রকাশ বাদে যে তার দিকে আমি তাকাতে পারতাম না, তা নয়। তবু তাকে ভাল না বেসে তাকে আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। এ থেকেই আমার মনে হয়, আমার প্রতি তার ভালবাসার প্রকাশ অপরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি তার প্রকাশ থেকে যেন ভিন্ন হতো। আমার প্রতি তার ভালবাসার প্রকাশ যেমন আচম্বিতে ঘটত তেমনি তার মধ্যে কোনও মালিন্যের ভাব যেমন থাকত না, তেমনি তার প্রকাশে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যাকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম না। তার অন্তরের প্রকাশে দৈহিকতার কোনও প্রাবল্য থাকত না। যে যেরূপ কোমলতার সঙ্গে আমাকে স্পর্শ করত, তাতে আমি বুঝতাম আমার প্রতি ওর দেহের দাবি যেমন ছিল তার চেয়েও অধিক ছিল আমার জন্য ওর মঙ্গল কামনা।...

সেই সময় আমরা যে এলাকাটাতে ছিলাম এবং তখনকার প্রাকৃতিক যে কোমলতা আকাশে বাতাসে ছিল তাতে অপরিসীম আনন্দ আমরা ভোগ করতাম। এমন জীবন ভোগে মারকুইসের কোনও বাধা ছিল না। তাই বলতে পারি সেই সময়টার আনন্দ আমরা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পেরেছিলাম। আমি তাদের শয়নকক্ষ পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারতাম। যদিচ মারকুইসের একটা চাকর ছিল যাকে আমার পছন্দ হতো না। তবু আমাদের শয়ন ঘরগুলোর ব্যবস্থাপনায় আমার অবস্থান মাদাম লারেন্সের শয়ন কক্ষের পাশেই ঘটত।...

তার জন্য আমার অনুভূতিতে ভালবাসার আধিক্য প্রকাশিত না হলেও সে আমার প্রতি যে মমতার প্রকাশ ঘটাত আমার আচরণেও তার স্বীকৃতির কোন অভাব ছিল না। আমাদের উভয়ের দৈহিক আচরণেও আনন্দ এবং মিলনের কোনও অভাববোধ হতো না। প্রকৃত ভালবাসার অনুভূতি আমার জীবনে একবারই ঘটেছিল। সে অবশ্য এই মেয়েটার সঙ্গে নয়। তাছাড়া মাদাম দা লারনেজের সঙ্গে আমার যে ভালবাসা ছিল তার কথাও বলছিনে। তবু এমন পার্থক্যের কথায় আমার যে অনুভূতির প্রকাশ ঘটছে তাও অন্য কিছুর সঙ্গে অতুলনীয়। মামার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ছিল তাতে সর্বদাই একটা দুঃখের ভাব ছিল। তাতে আমার অন্তরে একটা বেদনার ভাব থাকত। এই দুঃখবোধটাকে অতিক্রম করা আমার পক্ষে কঠিন ছিল। মাদামের সঙ্গে আমার দৈহিক সম্পর্কের একটা অদ্ভুত বৈপরীত্য বোধ থাকত। তাকে অধিকারে আমার যতটা না আনন্দবোধ হতো, তার অধিক তাকে পরাভূত করতে পারার জন্য একটা দুঃখবোধের সৃষ্টি হতো।

মাদাম দা লারনেজের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার ওপর আবার অধিকার প্রাপ্তিতে যথার্থ একটা গর্ববোধের সৃষ্টি হতো। আমার মধ্যে একটা পৌরুষবোধ জাগ্রত হতো। তাকে ভোগ করতে আমার আনন্দের যেন সীমা থাকত না। তার ওপর যে অধিকার আমি প্রয়োগ করতাম তাতে কোনও পাপ বা দুঃখবোধ থাকত না। যা থাকত তাকে আমি কেবল বিমল আনন্দই বলতে পারি। তাকে ভোগ করতে আমার কোনও দীনতার বোধ ছিল না। এবং তার পৌনপুনিকতাতেও আমার কোনও ক্লান্তি আসত না।

আমার ঠিক মনে নেই মারকুইস আমাকে রেখে গিয়েছিল। তবে এটা ঠিক যে আমরা যখন মান্টলিমার পৌঁছি, তখন আমরা একাকী ছিলাম। আর এখানে আসার পর মাদাম দ্য লারেঞ্জ তার দাসীটিকে আমার গাড়িতে যে পাঠিয়ে দিয়েছিল সেটি আমার মনে আছে। আমি তখন গাড়ীতে একাই ছিলাম। তবে তাতে আমার কোনও অসুবিধা ঘটেনি। ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে পল্ট দা গার্ড দেখার জন্য যেতে বলা হল। তার হুকুম মত আমি তাই করলাম। আর এই উপলক্ষে আমি এই প্রথম একটা রোম সৌধ দেখার ভাগ্য পেলাম।

এই সৌধটি দেখে আমি যথার্থই মোহিত হয়েছিলাম। আমার মনে প্রশ্ন না জেগে পারেনি এই সৌধের বিরাট পাথরগুলো ওরা কেমন করে খনির মধ্য থেকে তুলে এনেছিল।

এই সৌধটির তিনটি তলা আমি অতিক্রম করে উঠেছিলাম।

আমি এই সৌধের সিঁড়িতে পা রেখে যত উঠতে লাগলাম তত যেন অবিশ্বাস্য সেই কারিগরদের সঙ্গে যেন আমার সাক্ষাৎ দর্শন ঘটতে লাগল। একটা স্থানে যথার্থই আমি একটা রোমান এমপি থিয়েটারের দর্শন লাভ করলাম।

[আনন্দের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ কাটার পর রুশো মাদাম দা লারেঞ্জের সঙ্গ পরিত্যাগ করা ঠিক করল। তার মনে হল এর অধিক কাল অতিক্রম করলে মাদাম দা লারেঞ্জের ষোড়শী মেয়েটির মোহ থেকে সে মুক্ত হতে পারবে না।]

এখন এটা আমি এটা বুঝতে পারি কিছুকাল যদি কারো সঙ্গে পবিত্র জীবন যাপন করা যায় সর্বমোহ মুক্ত হয়ে, তাহলে আত্মার অবশ্যই একটা উন্নতি ঘটে। আমি সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন আর একটা মানুষে পরিণত হয়ে গেলাম। যেন আমার অধ:পতন থেকে একটা মুক্ত মানুষের অস্তিত্বে আমি প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হলাম। আমি সময় মতই ফিরে এলাম। আরো কিছু দূর এগুতেই আমার চোখ আর মন তাকে অন্বেষণ করতে শুরু করল। আমি যেন তাকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠলাম। আমি উঠানের চারদিকে তাকাতে লাগলাম। অথচ কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি যেন একটা অস্বস্তিতে ডুবে গেলাম। আমার একটা ভয় হতে লাগল, কিছু একটা ঘটেছে আমি আরও ভেতরে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম কয়েকটি লোক খাচ্ছিল। আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করছিল এমন কোনও আভাস পেলাম না। এই সময়ে একটি চাকরানী আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে উঠল। সে আমার আসাটা একেবারেই টের পায়নি। আমি তাকে পরোয়া না করে দোতলায় উঠে গেলাম।

অবশেষে আমি তাকে পেলাম যাকে আমি অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছিলাম। আমার ভালবাসার পাত্রীকে আমি পেয়ে গেলাম। ছুটে গিয়ে তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মামা এবার হেসে উঠল, 'কীরে বাচ্চা, তুই এতদিনে এলি? খুব তো ঘুরলি। কেমন লাগল, তুই আছিস কেমন?' মামার এই আদর আমাকে বিস্মিত করল। আমি মামাকে একটা চিঠিও লিখেছিলাম। সে চিঠিটা কি সে পায়নি। আমি জিজ্ঞেস করাতে সে বলল : ও! চিঠি পেয়েছিলাম তো। এর চাইতে আর বেশি কিছু বলল না। আমিও কিছু বললাম না। আমি দেখলাম তরুণ একটি ছেলে মামার গা ঘেঁষে বসে আছে যে, আমি বাড়িটা ছেড়ে যাওয়ার আগে ছেলেটাকে যে না দেখেছি, তা নয়। কিন্তু এখন দেখলাম সে আগের চেয়ে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। আমি বুঝলাম যেন এতদিনে আমি বেদখল হয়ে গেছি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ভালবাসার পাত্রীকে আমি পেয়ে গেলাম। ছুটে গিয়ে তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ছেলেটা কোন্ গ্রাম থেকে যেন এসেছিল। ও পরচুলা বানাবার কাজ করত। ওর বাবার নাম ছিল ভিনজেনরিড। লোকটা নিজেকে বলত চিলন দুর্গের রক্ষাকর্তা। ছেলেটা চলার পথে পরচুলা বানাত। ছেলেটা গ্রাম থেকে প্রথম যখন শহরে এসে মাদাম দা ওয়ারেনস এর সঙ্গে দেখা করে, তখন তিনি তাকে বেশ ভাল চোখেই দেখেছিলেন। তার স্বভাব এমনি ছিল। নিজের গ্রাম থেকে কেউ এলে মাদাম তাকে খাতিরই করতেন।

ছেলেটা যখন প্রথম এসেছিল তখন সে কাঠখোট্টা ধরনের ছিল। কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দরও ছিল। ছেলেটা বোকা মূর্খ ছিল বটে। কিন্তু অন্যদিকে ছেলেটা বেশ ভালই ছিল। এমনি একটা ছেলে আমার জায়গা দখল করে নিল। আমি চিন্তা করে বললে বলব, ছেলেটা একেবারে খারাপ ছিল না।

AMARBOI.COM

আর আমার চরিত্রও এতদিনে পাঠকদের কাছে নিশ্চয়ই কিছুটা পরিচিত হিয়ে উঠেছে। ফলে আমি ব্যাপারটাকে খুব ভাল চোখে নিতে পারলাম না। পরিস্থিতিটা আমার জন্য দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী। যে স্বপ্ন, সুখের স্বপ্ন আমি এতদিন নিজের জন্য দেখে আসছিলাম সেসবই এবার একেবারে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যে আমি আমার কৈশোর থেকে মামাকে বাদ দিয়ে আমার অস্তিত্বকে আদৌ কল্পনা করতে পারিনি, সেই আমি আজ একেবারে নি:স্ব এবং একেবারে সঙ্গীহীন হয়ে পড়লাম। এখন যে জীবন আমি যাপন করতে শুরু করলাম সে জীবন একেবারেই আনন্দহীন হয়ে দাঁড়াল। আমি তখনো কিশোর মনে এক তরুণ। কিন্তু একটি তরুণের মনে যে আনন্দ এবং উপভোগের একটা বোধ থাকে, যার মনে একটা আশার দীপ জ্বলে সে যেন চিরদিনের জন্য আমার জীবন থেকে নিভে গেল। তখন থেকে যাকে আমি জীবিত জীবন বলে মনে করতে লাগলাম সে যেন জীবন নয়, একটা অর্ধমৃত দেহে পর্যবসিত হয়ে গেল। আমার সামনে স্বাদহীন একটা জীবন বৈ আর কিছু অবশিষ্ট রইল না। এখন দু'এক সময়ে যদি-বা পেতাম, তবু একে আর আমি নিজের অস্তিত্বের কোনও প্রকাশ বলে ভাবতে পারলাম না। আমার মনে হল যাকে আমি আশা মনে করছি, এ আশা আদৌ আমার নয়।

আমি আমার বোধে এত সরল ছিলাম আবার নিজের বিশ্বাসে এত অনড় ছিলাম যে, যদি-বা নিজের মনে ক্ষণে ক্ষণে আশার আলো জ্বলে উঠত এবং যাকে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামারই অস্তিত্বের কিছুটা প্রকাশ বলে বোধ হতো এবং দেখতাম মামার সেই প্রকাশের আকর্ষণে কত না মানুষ তার দিকে ছুটে যেত, তবু আমি তার মধ্যে তার সেই অস্তিত্বকে আমি খুঁজে পেতাম না। কিন্তু একবার দেখলাম সে বিনা দ্বিধায় নিজের চরিত্রকে আমার চোখের সামনে তুলে ধরে আমাকে যেন একেবারে প্রাণশূন্য করে ফেলল। তার এমন প্রকাশে আমার যদি বিন্দুমাত্র শক্তি থাকত তবে রাগের আগুনে আমি জ্বলে উঠতাম। অথচ ব্যাপারটাকে কত-না সরলভাবেই নিল, বাড়িতে কখনও তার নিকটবর্তী হলে আমাকে বকুনিতে আর শেষ রাখত না। তবু আমি রেগে জ্বলে উঠে বললাম, মামা তুমি আমাকে এমন করে বকছ কেন? তোমার প্রতি আমার এমন ভালবাসার তুমি এমন প্রতিদান দিলে, এই তুমিই না তোমার ভালবাসা দিয়ে আমাকে কতবার জীবন দিয়েছ! আর সেই তুমি আজ আমার প্রতি এমন ব্যবহার করছ! তোমার এমন প্রতিদানে আমি মরে যাব ঠিকই। কিন্তু আমার মৃত্যু তোমাকে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই দিবে না।

আমার এমন কথাতেও সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। একেবারে শান্তভাবে সে বলতে লাগল : আরে বাচ্চা, এ তো কিছু না। তুইও মরবি না আর আমারও কিছু হবে না। আবার আমরা অন্তরঙ্গ হব। তোর প্রতি আমার মমতা একটুও কমবে না। এর কোনও শেষ হবে না। আমার জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এর কোনও শেষ হবে না। কী আশ্চর্য, নিরুদ্বেগে মামা এই কথাগুলো বলতে লাগল।

আমার মনে হলো মামা যেন বলছে, তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন। আমাদের কোনও পরিবর্তনই ঘটেনি। আর কারোর সাথে থাকলেও আমি তোর। তার এমন কথায় আমার নিজের অস্তিত্বকেই যেন হারিয়ে ফেললাম। এমন মমতাভরা কথা। এমন কী হতে পারে? যা আমাদের মধ্যে ঘটেছে তার পরেও! সেই মুহূর্তের মতো এমন মমতা মামার কাছ থেকে যেন আর কোনওদিনই পাইনি। আমি মামার পায়ে তক্ষুনি লুটিয়ে পড়লাম। আমার চোখ দিয়ে যেন সমুদ্রের স্রোত বইল। আমি তার হাঁটু জড়িয়ে ধরলাম। আমি বললাম, মামা তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তোমার ওপর আমি অন্যায় করেছি। তোমাকে আমার ভালবাসাতে কোনও সীমা নেই। তোমাকে আমি যেভাবে পেতে চাই, তোমাকে অপর কেউ এমনভাবে পাক, এ আমি কল্পনা করতে পারিনে। তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে, কখনও হ্রাস পায়নি। যেদিন থেকে তোমাকে আমি পেয়েছি, তারপর থেকে আমার সে ভালবাসার বিন্দুমাত্র হ্রাস ঘটেনি।

মামা তুমি আমার পূজ্য। আমি তোমাকে চিরকাল একইভাবে ভালবাসব। আমার হাজার বার মরণ ঘটুক, তবু যেন আমার হাতে তোমার কোনও অপমান না ঘটে। তোমার প্রতি আমার ভালবাসায় কোনও ঘৃণ্যতা থাকতে পারে না। এমন কথা আমি কল্পনা করতে পারিনে।

এটা সেদিন যথার্থই আমার অন্তরের কথা ছিল। এই আন্তরিকতা থেকে আমার বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটেনি। সেই মুহূর্ত থেকে আমি যেন যথার্থই আমার নিজের মায়ের একটি স্নেহের পুত্রতে পরিণত হয়ে গেলাম। যদিও একথা ঠিক যে তার মধ্যে আমার গভীর ভালবাসার প্রকাশ আর দেখিনি। তবু মামা আমাকে কখনও পরিত্যাগ করেনি। কখনও পরিত্যাগ করার কোনও প্রকাশ ঘটায়নি। তার আচরণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও নৈরাশ্যের আভাস পাইনি। কিংবা কোনও কপটতার প্রকাশ কখনও দেখিনি। মেয়েরা নানা কপটতায় অবশ্যই পটু। মেয়েরা নিজেদের না দিয়েও দান করার ভান করতে পারে। বরং এমন আচরণে পুরুষের পরাজয় মান্য করা ছাড়া উপায় থাকে না।

[মামা সম্পর্কে রুশোর এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তার মামার মনকে অধিকতর নিস্পৃহই করে তুলল।]

কিন্তু আমি নিজের উপর যতই আঘাত করলাম না কেন মামা আমার প্রতি তাতে এতটুকু নরম হলো না।
মেয়েদের বোধ হয় এমনি স্বভাব। তারা যা হারায় তার জন্য যত অপেক্ষা না করে তার অধিক তারা যা পায় না তার জন্য একটা অবাধ্যতার বোধ দ্বারাই তারা আক্রান্ত হয়। একজন দার্শনিক মহিলার কথাও যদি ধরা যায়, তার অপরাধ যদি ক্ষমতার অযোগ্যও হয়, তবু অন্য বিষয়ে সে নমনীয় হলেও এমন ক্ষেত্রে সে নত হতে চায় না। সেদিন থেকে আমি মামার মধ্যে আর তার পূর্বের মমতার সাক্ষাৎ পেলাম না। এরপর থেকে সে আর তার নিজের বুকের কামনা আর আমার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়নি। তখন থেকেই আমি এটা বুঝতে পারলাম, আমার ভাগ্য ভেঙে গেছে। সেদিন থেকে তার কাছে আমি যে ঋণে ঋণী ছিলাম, আমি স্থির করলাম, আর আমি প্যারিসে থাকব না। প্যারিসকে আমার ছাড়তে হবে। পরিশেষে আমার যা কিছু দক্ষতা ছিল তা নিয়ে আমি প্যারিস পরিত্যাগ করলাম।...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় খণ্ড
সপ্তম পুস্তক

হ্যাঁ, আগে যা বলেছি তারপর পুরো নিস্তব্ধতা এবং সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে পার করেছি। সন তারিখ এখন চলছে ১৭৪১।

আবার আমি কলম ধরেছি। প্রিয় পাঠক, আমার এমন আচরণের কারণের বিষয়ে আপনার বিচার আপাতত স্থগিত রাখুন।

এই ধরাধামে আমার আগমন ঘটেছে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে। সেই হিসেবে এখন ৬৬ বছরে পা দিয়েছি। কম ভাগ্য নয়। জন্মাবধি আমার পরিপার্শ্বকে বিচার করার ক্ষমতা কিছুটা আমার হয়েছে। আমাকেও আপনারা কিছুটা দেখতে পেয়েছেন। এবার আমার একটু বয়স হয়েছে একথা আমি বলতে পারি। এবার আমার একটু বিচার বুদ্ধি হয়েছে, একথাও আমি বলতে পারি। আপনারা আমাকে দেখেছেন। আমার যৌবন কেটেছে— তেমন কোনও হতাশাও যেমন ইতোমধ্যে ঘটেনি, তেমনি বিরাট কোনও ধন-সম্পদের মালিকেও আমি পরিণত হইনি। আর ভাগ্যের এ মাথায় এবং ও মাথায় চূড়ান্ত কিছু না ঘটার কারণ হিসেবে বলতে পারি, একদিকে রয়েছে আমার আবেগপ্রবণতা, আর অপরদিকে রয়েছে আমার ব্যবস্থাপনা। ফলে একদিকে যেমন আমি কোনও ধর্মের কাজ করিনি, তেমনি সাংঘাতিক কোনও অধর্মেও আমি পতিত হইনি।

কিন্তু আমি জানতাম না অচিরেই আমার কী দুর্ভাগ্য ঘটবে। প্রথম ত্রিশ বছর আমি যেভাবে কাটিয়েছি পরবর্তী ত্রিশ বছর যে কী দুর্ভাগ্য আমার ঘটেছে তা আমার বর্ণনারও অতীত।

আমার আত্মোক্তির প্রথম ভাগ আমি রচনা করেছি আমার স্মৃতি থেকে। আর তাতে আমার ভুলভ্রান্তির অন্ত থাকেনি। আর এই যে দ্বিতীয় ভাগে পা দিয়েছি সে ভাগেরও ভ্রান্তির অন্ত থাকবে না। আমার জীবনের সর্বোত্তম অংশ কেটেছে সুখে এবং আনন্দে। আমার জীবনের বাকি অংশেও আমার সুখ আর আনন্দের অভাব ঘটেনি। আমার স্মৃতিতে তার সবই আজ আমার মনে ভেসে উঠছে। পাঠক কিছুকালের মধ্যেই আপনারা দেখতে পাবেন কী বিপরীত ভাগ্য বা ঘটনার মধ্য দিয়ে আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। আর সে স্মৃতিতে বিষাদময় হয়ে ওঠে আমার জীবন। অবশ্য একটা ক্রেডিটও আমি নিজেকে না দিয়ে পারিনে। দুঃখ আর বিষাদ যতই হোক আমি দু'হাতে তাকে দু'পাশে সরিয়ে দিতেও পারি। বস্তুত তেমন স্মৃতিকে আমি যথার্থই বিস্মৃত হয়ে যাই : এমন বিস্মৃতি যে যদি দরকার তার কিছু স্মরণ করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন তার কিছুকে আদৌ আমি স্মরণ করতে পারিনে। সহজে এমন করে স্মৃতিকে বিস্মৃত হওয়ার ক্ষমতা আমার মনে একটা গর্বের ভাবই তৈরি করে। আমার স্মরণ করার যেমন ক্ষমতা, বিস্মৃত হওয়ার তেমনি ক্ষমতা। এতেই আমার মুক্তি। এতেই আমার সুখ আর আনন্দ।

আমার বিস্মরণের শূন্যতাকে পূরণ করার যে ব্যবস্থাই আমি করি না কেন তার সব আবার বিস্মরণের অতলেই তলিয়ে যায়। অবশ্য আমার একটা অনুগত শিষ্য আছে যার উপর আমি নির্ভর করতে পারি যে আমাকে উদ্ধার করে দেয় : স্মৃতির শেকল যেখানে ভেঙে যায় আমার এই অনুগত শিষ্য তাকে বিস্ময়করভাবে আবার জোড়া লাগিয়ে দেয়।

আমার দুর্ভাগ্যকে ভুলতে আমার কষ্ট হয় না। কিন্তু আমার বিচ্যুতিকে ভুলতে আমার কষ্ট হয়।...

আমার এই যে আত্মকথা তার আসল উদ্দেশ্য আমার অস্তিত্বের মূলকে বের করে আনা। কত যে আমার পতন ঘটেছে, তার কোনওটাকে আমি ভুলতে পারিনে। আমি স্থির করেছি আমার আত্মার অন্তরকে আমি একেবারে টেনে বের করে আনব। সেজন্য আমাকে আর অপর আর কোনও স্মৃতিকথার আশ্রয় নিতে হবে না।

আমি মনে করি না যে আত্মকথা বলার প্রতিশ্রুতি আমি আমার পাঠকদের দিয়েছি, তারা তা বিস্মৃত হবেন না। তারা যেন মনে না করেন যে আমি এর মাধ্যমে কোনও জবাবদিহি করছি : কোনও কিছুর জন্য আমি অনুতপ্ত বোধ করছি। আর পাঠক যেন এটাও মনে না করেন যে, সত্যকে আমি মিথ্যার আবরণে আবৃত করে দেব। সত্যের ব্যাপারেও আমি নিঃশব্দ থাকব না। যে সত্য আমার পক্ষে আসবে সে সত্যকে আমি অস্বীকার করব কেন?

আমার প্রথম ভাগের সঙ্গে এই ভাগের এই মিলটার কথা আমাকে বলতে হবে। এই ব্যতিক্রম ব্যতীত আর কিছুতে আমার এই ভাগ অপর ভাগ থেকে হীন হবে না।

আমার স্মৃতির প্রথম ভাগটা যখন আমি লিখি তখন আমার আনন্দের সীমা ছিল না। তখন যত স্মৃতিকে আমি স্মরণ করতে চেয়েছি তার সবই আমাকে আনন্দে ভরে তুলেছে। আর তাই তার প্রত্যেকটিতে প্রত্যাবর্তনে আমার আনন্দের আর সীমা থাকেনি। আমি বারবার এর প্রত্যেকটি ঘটনাকে আনন্দের সঙ্গে স্মৃতিরপটে তুলে ধরেছি।

এখন যা আমি শুরু করেছি, তা আমি করতে বাধ্য বলেই করছি। আমার দুঃখ, এখন আর আমার সেই পূর্বের স্মৃতিশক্তি নেই। তাই বলছিলাম, বর্তমানে আমি যা করছি তা একটা বাধ্যতাবশেই আমি করছি। আমার হৃদয় এখন বিষাদে ভরা। এখনকার স্মৃতিতে আমার দুঃখ ছাড়া কোনও সুখ নেই। এই জগতে যা কিছু দেয়ার আছে তা সবই আমি দিতে সক্ষম হব কেবল যদি সময়ের অন্ধকারে তার সবকিছু যদি আমি আবৃত করতে পারি। আমি যতই ব্যথিত বোধ করিনে কেন যা আমাকে বলতে হবে, তা আমি প্রকাশ করব। আমি জানি, আমার চারদিকে যে বাধার প্রাচীর দাঁড় করানো হয়েছে : মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, বিষাদময়তা এবং বিশ্বাসহীনতার প্রাচীর : তার থেকে আমার পরিত্রাণ নেই। যে ছাদের নিচে আমি আজ স্থাপিত তা থেকে বেরুবার কোনও পথ নেই। এই মুহূর্তে মাত্র কয়েকটা ছত্র আমি লিখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছি। এর কোনওটাকে পরিবর্তন করার আমার কোনও ক্ষমতা নেই। আমার এই আত্মকথাকে কেমন করে আজ আলোর মধ্যে তুলে ধরব? আমি জানি যে প্রয়াসে আমি আজ নিবদ্ধ হয়েছি, এখান থেকে উদ্ধারের আমার কোনও উপায় নেই।

[রুশো কিছু সময়ের জন্য লিয়নসে অবস্থান করেছিল। এখানে রোজিক নামে এক বন্ধুকেও সে লাভ করেছিল।]

আমি প্যারিসে এসে পৌঁছেছিলাম শরৎকালে, ১৭৪১ সালে। আমার পকেটে তখন মাত্র ১৫টি ফরাসি মুদ্রা। কাজেই এ দিয়ে কিছু জোগাড় করার মতো আমার হাতে তখন সময় আদৌ ছিল না। আমি তাই যথাশীঘ্র সম্ভব আমার যা কিছু পরিচয়পত্র ছিল তা কাজে লাগাবার চেষ্টা করলাম। আর পরিচয়পত্র বলতে আমার ছিল একখানা চেহারা। আর একটি সুন্দর চেহারা নিয়ে একটি তরুণ যদি প্যারিসে আসে এবং তার সে চেহারাকে পুঁজি করার চেষ্টা করে তবে তার সুন্দর পিয়াসীদের কাছ থেকে সংবর্ধনা পেতে কোনও অসুবিধা হয় না। আমার বেলাও তাই হলো। এতে আমার মনে বেশ আনন্দেরও সৃষ্টি হলো। কিন্তু আমার সুন্দর চেহারার পুঁজি খুব যে কাজে এল এমন নয়।

[তবে রুশোর সঙ্গে রুমার নামে এক ভদ্রলোকের পরিচয় ঘটে গেল। সে ভদ্রলোক একটি ব্যবস্থা করল যাতে রুশোর পক্ষে প্যারিসের বিজ্ঞান একাডেমিতে তার একটি প্রবন্ধ পাঠ সম্ভব হলো। এটা ১৭৪১-এর কথা। একাডেমির তরফ থেকে তার প্রবন্ধ পরীক্ষার জন্য তিনজন অভিজ্ঞকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁরা রুশোর প্রবন্ধের মূল্য কিছু বুঝতে না পেরে তার সম্পর্কে সাধারণ কিছু মন্তব্য পেশ করে ছেড়ে দিল।]

আমার এই ব্যর্থ পরিশ্রমের ক্লান্তিতে আমার কিছু বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আমি তাই নিজেকে হতাশার হাতে ছেড়ে না দিয়ে আমার স্বভাবগত প্রয়োজনীয় বিশ্রামের হাতে নিজেকে অর্পণ করে দিলাম। আর অপেক্ষা করতে লাগলাম দেখি ভাগ্য আমাকে কী দেয়। তেমন কিছু পরোয়া না করে লুইস মুদ্রার যে ক'টি তখনও বাকি ছিল সে ক'টিকে খরচ করতে কোনও কার্পণ্য করলাম না। আমার আমোদফুর্তি যে একেবারে ছেড়ে দিলাম, তা নয় তবে একটু সতর্ক হওয়ার চেষ্টা করলাম।

কাফেতে রোজ না গিয়ে একদিন বাদে পরের দিন যাওয়ার চেষ্টা করলাম। আর থিয়েটারের বেলাতেও সপ্তাহে দু'দিনের বেশি নয়। আর মেয়ে মানুষের ওপর টাকা খরচের ব্যাপারে আমার চিন্তার কোনও কারণ কখনও হতো না। কেবল একটা দিনে কিছু খরচ করতে হয়েছিল। সে সম্পর্কে একটু বলতে হবে। যেরূপ ঠাণ্ডা মাথায় এবং আনন্দে এই ব্যাপারটিতে আমি রত হলাম, সেটি আমার কাছেও বিস্ময়কর বলে বোধ হলো। এমন ফূর্তিতে মাতার মতো আমার হাতে তিন মাসের টাকাও ছিল না। আর সেজন্যই বলছি আমার চরিত্রের এটা ছিল একটা বেপরোয়া বৈশিষ্ট্য। যে সহানুভূতির আমি আকাঙ্ক্ষী ছিলাম সেটাই আমাকে উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সন্নিকটে আমার যাওয়াকে অসম্ভব করে তুলল। ফলে আমি একাডেমির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে আমার যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। অথচ একাডেমির ব্যক্তিদের সঙ্গে আমি ইতোমধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিলাম। কিছু সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। যাদের সাহচর্য আমি ছাড়লাম না তার মধ্যে কেবল ছিলেন : মারিভ-ম্যাবলির যাজক এবং ফন্টে ফন্তেনেলী মাত্র। 'নারসিসাস শিরোনামের' নাটকটিকে আমি মারিভ'কে দেখালাম। দেখলাম নাটকটিকে তিনি পছন্দ করলেন এবং তাকে একটু সংশোধন করে উন্নত করারও চেষ্টা করলেন। দিদেরতের সঙ্গও আমি পরিত্যাগ করিনি। দিদেরত তখনও খুব বৃদ্ধ হয়ে পড়েননি। তিনি তখনও আমার বয়সী। সঙ্গীতে তিনি আসক্ত ছিলেন। সঙ্গীতের কলা-কৌশল তিনি ভালই জ্ঞাত ছিলেন। আমরা উভয়ই সঙ্গীত নিয়ে পরিকল্পনাদির কথা আমাকে বলতেন। এর ফলে আমাদের দু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের এই অন্তরঙ্গতা অন্তত দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ স্থায়ী হয়েছিল। আমাদের এই অন্তরঙ্গতা আরও অধিককাল স্থায়ী হতে পারত। এর জন্য তথা এই বিচ্ছেদের জন্য আমরা উভয়ই দায়ী ছিলাম যেমন আমি তেমনি তিনি।

[এই সময়ে দেখা যায় যে, রুশো লুকাজমবার্গে ভারজিল অধ্যয়ন করতে শুরু করেছেন। দাবারও তিনি ভক্ত হয়ে দাঁড়ান। এই সময়ে তাকে কেউ মাদাম দা বুজেনভাল এর সঙ্গে পরিচিত করে দেন। বুজেনভালের একটি মিয়ে ছিল, তার সঙ্গেও রুশো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। মেয়েটির নাম ছিল মাদাম দা বখি।]

তখন প্রায় রাত ১টা। আমি বললাম, মাদাম, এবার আমি যাই। মাদাম বুজেনভাল বললেন, তোমার বাসা তো এখান থেকে অনেক দূর। তুমি বরং আমার এখানে থেকে যাও এবং এখানেই রাতের আহার কর। এমন প্রস্তাবের জন্য তাকে আর দ্বিতীয়বার বলতে হলো না। মিনিট পনের পরে আমি বুঝলাম যে ঘরে তিনি আমাকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন সেটি তার চাকরানির ঘর।
যদিও মাদাম দা বুজেনভাল নি:সন্দেহে একজন উত্তম মহিলা ছিলেন, তবু একথাও ঠিক যে তার বুদ্ধি-বিবেচনা কিছু কম ছিল। আমার ব্যাপারেও তিনি যতনা আমার আচরণে আমাকে বিচার করেছেন, ততটা আমার পোশাক-আশাকের প্রতি দৃষ্টি দেননি। আমার পোশাকে দারিদ্র্য ছিল ঠিকই তবু। তবু সে পোশাকের একটা সম্মানের ভাবও ছিল। আর সেই পোশাকে এমন কিছু ছিল না যাতে তিনি আমাকে চাকরানির টেবিলে ভোজের জন্য আহবান জানাতে পারেন। তার সেই বাসস্থানে তো আমি কম দিন থাকিনি। যা হোক আমার মনের বিরক্তি প্রকাশ না করে আমি মাদাম বুজেনভালকে বললাম, আমার ভুল হয়ে গেছে। একটা কাজে আমার চলে যেতে হবে। এই বলে আমি আবার চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। মাদাম দা ব্রগলি উপরে তার মার কাছে চলে গেল এবং তার কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল। আর তাতে ফলও ফলল। মাদাম দা বুজেনভাল নিজের আসন থেকে উঠে আমার কাছে এসে আমাকে তাদের কাছেই রাত্রি যাপন করতে বললেন। তিনি বললেন, তুমি আমাদের কাছে থাকলে আমরা সত্যই সম্মানিত বোধ করব। এবার আর আমি আপত্তি করলাম না। ভাবলাম তেমন করাটা আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাছাড়া মাদাম দা ব্রগলির সহৃদয়তা আমাকে যথার্থই অভিভূত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল। তাছাড়া এবার তাকে আমার কাছে সুন্দর বলেই বোধ হলো। আমি তাদের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গেই আহার করলাম। আমি ভাবলাম আমার সঙ্গে আর একটু অন্তরঙ্গ হলে সে আমাকে পছন্দ না করে পারবে না। লাযোগণন-এর প্রেসিডেন্টও আমাদের সঙ্গে আহার করলেন। তাকেও দেখলাম এই পরিবারের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। মাদাম দা ব্রগলির মতো তিনিও প্যারির বস্তির ভাষার সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন। আমি আবার কথাবার্তায় অধিক কোনও জালিয়াতির ভাব দেখাতাম না। আজ আমার এই আফসোস যে, সেদিনের মতো যদি সবসময় আবার বুদ্ধির পরিচয় দিতাম তাহলে যে দুরবস্থায় আজ আমি পড়েছি তেমন দুরবস্থায় আমাকে পড়তে হতো না।

আমার নিজের বোকামিতে আমার নিজেরই দু:খের অন্ত ছিল না। বিশেষ করে আমার দুঃখ হচ্ছিল যে মাদাম দা ব্রগলি আমার জন্য যা করেছেন তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতার কথা আমি বুঝিয়ে বলতে পারছিলাম না। আহারাদির পর আমি আবার আমার স্বভাবে ফিরে এলাম। আমার পকেটে ছিল কাব্যে রচিত একটি পদ্য। এটি আমি রচনা করেছিলাম আমার লিয়নসে অবস্থানকালে, পারিসটের জন্য। আমার এই পদ্যটিতে আমার অগ্নিক্ষরা আবেদনের কোনও অভাব ছিল না। আমার আবৃত্তির ধারায় আমার শ্রোতা তিনজনকেই অশ্রুসিক্ত আবেগে আপ্লুত করে তুলেছিলাম। আমি জানি না এ কথা আমার অহঙ্কার হবে না যথার্থ যে আমি মাদাম দা ব্রগলির অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যেন তিনি বলছেন, মা এই লোকটি তোমার সঙ্গে আহার করার যথার্থই উপযুক্ত ব্যক্তি। তোমার জন্য যে মহিলারা অপেক্ষায় রত তাদের চাইতে এই লোকটি অবশ্যই অধিক উত্তম। মাদাম ব্রগলি আবার তার মাকে বললেন, একথা আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম। ঠিক কী-না? মাদাম ব্রগলির এই কথা শোনার আগ পর্যন্ত আমার মনটা ভারী হয়েছিল। কিন্তু তার এই প্রশান্তি শোনার পরে আমার মন আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠল। অবশ্য মাদাম দা ব্রগলি আমার সম্পর্কে প্রশংসা একটু অধিক পরিমাণেই করে ফেলেছিলেন। যেন তিনি বিশ্বাস করলেন যে প্যারিসে আমি যথার্থই একটা হৈ চৈ ফেলে দেব এবং মেয়েরা আমাকে নিয়ে দস্তুরমতো লোফালুফি শুরু করে দেবে। আমার অনভিজ্ঞতাকে পূরণ করতে তিনি আমাকে কতেদা...র আত্মোক্তিখানা আমাকে উপহার দিলেন আর বললেন, বাছা, যে জগতে তুমি যাচ্ছ সেখানে এই বইখানা তোমার উপকারে আসবে। তুমি বইটিকে মাঝে মাঝে কাজে লাগিয়ো। তার উপদেশটি যথার্থ ছিল। মাদাম ব্রগলির এই পুস্তকখানা এর পর থেকে প্রায় বিশ বছর আমার বুকের কাছে রক্ষা করেছিলাম। এটি আমি করেছিলাম মাদাম ব্রগলির প্রতি তার সৌজন্যের জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে। যদিও তিনি মেয়েদের নিয়ে আমার কর্মক্ষমতার যে প্রশংসার কথা তিনি করেছিলেন তার স্মৃতিতে আমার হাসিই পায়। বইখানা পাঠ করার পরে মাদাম ব্রগলির প্রতি আমার আকর্ষণ যথার্থই বৃদ্ধি পায়। এবং একথা যথার্থ যে আমার বান্ধবীদের মধ্যে সত্যিকার বান্ধবী যদি কেউ থেকে থাকেন সে একমাত্র মাদাম ব্রগলি।

তার এই নতুন বন্ধুদের মাধ্যমে রুশো সঙ্গীত শিক্ষকের দায়িত্ব লাভ করেন। এভাবে তার মাদাম দা দুপিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। রুশো অনতিবিলম্বে তার সঙ্গীত শিক্ষার্থীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমে পতিত হন। কিন্তু তার প্রেমের প্রতিদানে হিমশীতল আচরণই মাত্র লাভ করেন। তাহলেও উচ্চস্তরের লোকজনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। মাদাম দুপিনের সৎপুত্রের সঙ্গে সে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। রুশো একটা 'অপেরা' রচনারও চেষ্টা করে। কিন্তু এ কাজে অধিক দূর অগ্রসর হতে পারার পূর্বেই মাদাম দা ব্রগলি তার জন্য ভেনিসের রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারির পদে নিয়োগটি সংগ্রহ করে দেন। এটা ১৭৪৩ সালের কথা। রুশো তার পদে যোগদানের জন্য যাত্রা শুরু করার পথেই তাকে জেনোয়ায় কোয়ারেনটাইন করা হয়। সে যা হোক তার নিয়োগে সে দক্ষতা অর্জন করলেন তার রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে নানা প্রকার দুর্ব্যবহার লাভ করতে থাকেন। রাষ্ট্রদূতের ঘনিষ্ঠ লোকজন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে। রুশোকে তারা নানাভাবে অপদস্থ করতে শুরু করে। ফলে রুশো তার নিজের পদ থেকে পদত্যাগ করে।
এরপরে সে যথার্থই সঙ্গীত শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করে এবং নানা প্রকার সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে ওঠে।]

আমার ভাললাগার যে বোধ তাতে সঙ্গীত হচ্ছে অপেরার সব চাইতে শ্রেষ্ঠ শিল্প। আর এর তুলনা, ইটালি বা অপর কোথাও পাওয়া যায় না। একে আমি বলি Scuole (স্কুলি)। এই স্কুলি এক ধরনের দাতব্য প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠা ঘটে সঙ্গতিহীন তরুণীদের শিক্ষা দানের জন্য। পরবর্তীকালে এদের সরকারের তরফ থেকেই বিভিন্ন স্থানে তাদের বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য প্রেরণ করা হয় অথবা একটা বিশেষ ধরনের আচ্ছাদিত উঠানে সময় কাটাবার জন্য। এদের চর্চার মধ্যে সঙ্গীতই প্রধান। এই 'স্কুলিতে' প্রত্যেক রোববার মঠের মধ্যে দক্ষ শিক্ষকরা এদের সঙ্গীতে দক্ষ করে তোলে। এদের গীত এই সঙ্গীতের চাইতে উত্তেজক আর কোনও সঙ্গীতের কথা আমি চিন্তা করতে পারিনে। ক্যারিয়ো আর ভেসপারায় এই সঙ্গীতের আসরে যেতে পারলে কখনও সে সুযোগকে হাত ছাড়া করতাম না। চার্চ প্রায় সব সময়েই এই মেয়েদের দ্বারা ভরা থাকত। একবার আমি যখন এ বিষয়ে মশিয়ে লা ব্রন্ডকে বলছিলাম, তখন তিনি বললেন এদের সম্পর্কে তোমার যদি এত উৎসাহ, আমি তোমাকে সহজেই ওদের কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। এই প্রতিষ্ঠানের আমি একজন পরিচালকও বটে।...
একথা শুনে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা পর্যন্ত তাকে শান্তিতে থাকতে দিলাম না। শেষপর্যন্ত তিনি যখন আমাকে এই সুন্দরীদের মেলায় যথার্থই নিয়ে গেলেন তখন তাদের দৃশ্যে আমার বুকে যে কম্পন জাগল তেমন কম্পন আমি ইতিপূর্বে কখনও বোধ করিনি। ম. লা ব্রন্ড এই সুন্দরীদের একটিকে আর একটির পরে আমার সামনে উপস্থিত করতে লাগলেন। কিন্তু সবগুলোকে যে আমার পছন্দ হয়েছিল তেমন না।...
মেয়েদের ব্যাপারে ভেনিস-এর মতো জায়গা মেয়েদের বর্জন করা যে কারোর পক্ষেই অসম্ভব। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে এদের সম্পর্কে তোমার আর কী বলার আছে। জবাবে বলব, হ্যাঁ, আমার নিশ্চয়ই কিছু বলার আছে। আর যা বলার আছে তা আমি নি:সঙ্কোচেই বলব।
সাধারণ দেহ ব্যবসায়ীদের আমার মোটেই পছন্দ হয় না। অথচ ভেনিসে এরা ছাড়া আমার সাধ্যের মধ্যে আর কিছুই ছিল না। যারা একটু বনেদি তাদের কাছে যাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো আমার কোনও অর্থ ছিল না। ম. লা ব্লভের মেয়েরা খুবই ভদ্র ছিল। কিন্তু খুবই গম্ভীর প্রকৃতির। তাদের মা এবং বাবার প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। আমি তাদের এমন সুন্দর মেয়েদের সম্পর্কে আমি অন্য কোনও কুচিন্তা করতেই পারতাম না। অবশ্য আর একটি মেয়ে ছিল। তার নাম ছিল মাদামসেল দা কাতানিও। তাকে আমার পছন্দ হতো। কিন্তু তার প্রতি কারিওর ভালবাসা ছিল। এমন কি দুয়ের মধ্যে পরিণয়ের কথাও হচ্ছিল। আর তাছাড়া কারিও ছিল বেশ সম্পদবান। আর আমার কোনও সম্পদই ছিল না। কারিওর মাসিক বেতন ছিল মাসে একশ' লুই, আর আমার ছিল মাত্র একশ' পিসতোলি। তাছাড়া কোরিও আমার বন্ধুও ছিল। একজন বন্ধুর মালের ওপর নজর দেয়ার আমার কোনও ইচ্ছা ছিল না। আমি জানতাম প্রেমের ব্যাপারে একের প্রেমের ওপর অন্যের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বিশেষ করে ভেনিসে বসে। তাছাড়া আমার নিজের কামনাকে নিবৃত্ত না করার কুঅভ্যাস আমি তখনও পরিত্যাগ করিনি। ভেনিসের আবহাওয়ার প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল তীব্র। আমি প্রায় এক বছর ভেনিসে কাটালাম যথার্থই পবিত্রতার সাথে, যেমন কাটিয়েছিলাম প্যারিসে। শেষপর্যন্ত আঠার মাস পর্যন্ত আমি মেয়েদের সঙ্গে কোনও কারবার না করে আমি ভেনিস ছেড়ে চলে এলাম। এর ব্যতিক্রম মাত্র দু'বার ঘটেছিল। একটা বিশেষ সুবিধা পাওয়ার কারণে। সে ঘটনার কথা আমি বলব।

এর প্রথম ঘটনাটা ঘটাল সম্মানিত ভিটালি। ইতোমধ্যে আমি তাকে তার অভিমতের জন্য আমার কাছে তাকে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছিলাম। আলাপ আলোচনা চলছিল ভেনিসের বিনোদিনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। টেবিলে যারা ছিল তারা আমাকে ভর্ৎসনা করল এই বলে যে আমি ভেনিসের আসল মালই দেখিনি। এই কথা বলে ভেনিসের মেয়েদের মোহনীয় আচরণের বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, আর কিছুই বুঝি না। ভেনিসের এই মেয়েদের তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও নাকি নেই। সে বলল, আমি নাকি ভেনিসের আসল মেয়েকেই দেখিনি। সে প্রতিশ্রুতি দিল সে আমাকে সেই মাল দেখাবে এবং তাকে দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারব না। তার এই কথা শুনে আমি তার এমন দয়ায় হাসতে শুরু করলাম। এমন হাসিতে বৃদ্ধ কাউন্ট পিকি আমাকে অপ্রত্যাশিত দিলখোলা ভাবে বললেন, বাছা, প্রস্তাবটা ছেড়ো না। দিয়েছেই যখন লুফে নাও। গিয়ে দেখো না! শেষপর্যন্ত আমি তার প্রস্তাবমতো যথার্থই সেই মালের কাছে গেলাম। দি প্যাডোনা বা যার বাড়িতে আমি গেলাম দেখতে সে ভালই ছিল। বলা চলে সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু তার সৌন্দর্যতে আমি ভুলতে পারলাম না। ডোমেনিকো যে আমাকে তার কাছে নিয়ে গিয়েছিল সে তার কাছে আমাকে রেখে চলে গেল। যাওয়ার সময়ে মেয়েটিকে আমাকে গান শুনতে বলল। তার গান শুনতে আধাঘণ্টা কেটে যাবার পর আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং একটি ডুবাট তথা স্বর্ণমুদ্রা তার টেবিলে রেখে চলে আসার উদ্যোগ করলাম। কিন্তু মেয়েটার একটা গুণ ছিল। সে তার করণীয় না করে আমার দেয়া সোনার মুদ্রাটি নিতে অস্বীকার করল। আর আমিও সে যা আমাকে করতে বলল, আমি তা করতে দ্বিরুক্তি করলাম না। এমন কর্ম থেকে ফিরে এসে আমার নিশ্চয়ই পক্স্ বা বসন্ত হয়েছে। সেই ভয়ে আমি ডাক্তারের জন্য লোক পাঠালাম। ডাক্তার এলে আমার অবস্থার কথা বলে আমি তার কাছে ওষুধ চাইলাম। তারপর প্রায় তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তাহ আমি মনমরা হয়ে রইলাম। অথচ আমার বসন্ত হয়নি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না যে মেয়েটার সঙ্গে আমার মিলনে কোনও রোগ হয়নি। তবু ডাক্তার বুঝাতে লাগলেন যে আমার কিছু হয়নি। আমি তখনই যে বিশ্বাস করলাম, তা নয়। তবু এ পর্যন্ত আমার শরীরে কোনও রোগের লক্ষণ দেখা দেয়নি তাতে আমার বিশ্বাস হলো হয়তো যথার্থই আমার কোনও রোগ ওই মেয়েটার সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে ঘটেনি। তবুও বলব যদিও আমার তেমন কোনও রোগ হয়নি, তবু আমি ওই কাজে কখনও ব্রত হইনি— সে কথাও আমি বলতে পারিনে।

আমার অন্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে আর একটি মেয়ের সঙ্গে কারবারটিও উল্লেখযোগ্য। এ মেয়েটার ধরন ছিল আলাদা : যেমন তার মূলের দিকে তেমনি তার কারবারের শেষ আচরণেরও। আমি যখন ভ্রমণের জাহাজের আরোহণ করলাম তখন স্পেনের দূতাবাসের মেয়ে সেক্রেটারিটিকেও সঙ্গে নিলাম। আমি মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যখন জাহাজে উঠলাম তখন ভেবেছিলাম জাহাজের ক্যাপ্টেন আমাকে সংবর্ধনা জানাবে। কিন্তু আমার সে আশা সে পূরণ করল না। তার এমন আচরণে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি এজন্য আমার বিরক্তি গোপন করতে পারলাম না। ফলে আহারাদির আয়োজন উত্তম থাকলেও আমি তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারলাম না। ফলে আমি আহারও যেমন যথেষ্ট পরিমাণ করতে পারলাম না; এবং খাবারের টেবিলে তেমন আত্মপ্রকাশ করাও আমার পক্ষে সম্ভব হলো না।

আহার শেষে কোনও বাহবাও জুটল না। ব্যাটা ক্যাপ্টেনও আমার এই বিপর্যয়কে খুবই উপভোগ করতে লাগল। আমাকে বুড়ো খোকা মনে করে আমাকে নিয়ে খুব ঠাট্টা তামাশা করতে লাগল। আহারের অর্ধাধিক সময়ে দেখলাম একটি গন্ডোলা এগিয়ে আসছে। তা দেখে আমাদের ক্যাপ্টেন চিৎকার করে উঠল : তোমরা সাবধান হও ভয়ানক একটা গন্ডোলা কিন্তু এগিয়ে আসছে। আমি যখন তার এমন ভয়ার্ত চিৎকারের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম তখন সে আমার দৃষ্টি একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়েলোকের দিকে আকৃষ্ট করল। আমি দেখলাম সুন্দরীটি দেখতে না দেখতে লম্ফ দিয়ে আমি একটু সরে বসার আগেই আমার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। সুন্দরীটির বয়স বিশের মতো ছিল। সে ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলতে পারত। তার কথার যে উচ্চারণ ছিল তাতেই আমার মাথা ঘুরে যেতে পারত। খেতে খেতে সে যখন কথা বলছিল তখন তার দৃষ্টি আমার ওপরই কেবল নির্দিষ্ট ছিল। তারপর সে হঠাৎ বলেও উঠল : আহা আমার সুন্দর, কতদিন পরেই না তোমার সাথে আজ আমার সাক্ষাৎ ঘটল! সে মুহূর্তের মধ্যে আমার মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং তার পা দিয়ে আমার পা আটকে ধরল। তার বড় বড় কালো চোখ যেন আমার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে তুলল। আমি প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গেলেও মেয়েটা আমাকে কখন একেবারে গিলে খেল। অবশ্য তার কাম স্পৃহা চূড়ান্ত হওয়ার পরে সে আমাকে তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি দিল। অবশ্য সে আমাকে শেষ করার পরে বলল, বাছা, তোমাকে দেখতে আমার ঠিক সেই মশিয়ে দা ড্রেমন্ডের মতো মনে হয়েছিল। টাসকান কাস্টম হাউজের সে ছিল একজন পরিচালক। সে বলতে লাগল তাকে আমি এখনও ভালবাসি। কিন্তু কী করব, লোকটা আসলে ছিল বোকা আর তাই আমি যে কী, তা সে বুঝতেই পারেনি। তার মতো তুমি দেখতে বলেই আমি তোমার কাছে এসেছি। সে বলল, আমার সেই লোকের মতো তুমি আমাকে ভালবাসবে, যতক্ষণ আমি চাইব, ততক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তোমাকে ছাড়ব না। আসলে তাই হলো। সে আমাকে যা করতে বলল, আমি তাই করলাম। আমার মাথায় তার টুপি পরিয়ে দিল। হাতের গ্লোভ আমার হাতে দি। ইতোমধ্যে দেখলাম, হঠাৎ সে আমাকে ছেড়ে আর একটা লোকের কাছে চুপিসারে বহুক্ষণ যাবৎ কী যেন আলাপ করল এবং তারপর আবার আমার কাছে ফিরে এসে বলল : দেখ বাপু, আমি ফরাসি কায়দার ভালবাসা পছন্দ করি না। কারণ ফরাসি কায়দার ভালবাসায় আমার কোনও লাভ হয় না। আমাকে যখন তুমি শেষ করতে পারবে তখন তুমি চলে যেয়ো, তাতে আমার কোনও দুঃখ হবে না। তবে একটা সাবধান বাণী তোমাকে শুনাচ্ছি। যা করবে শেষপর্যন্ত করবে। মাঝখানে ছাড়বে না। সে বেপরোয়াভাবে তার টাকা পয়সা ওড়াতে লাগল তাতে মনে হলো যেন টাকা পয়সার জন্য সে কোনও চিন্তাই করে না। সে যখন আমার কাছ থেকে তাকে ব্যবহারের জন্য টাকা চাইত তখন তার ভাবটিও ছিল এমন যে আমি যা দেব তাতেই সে খুশি। সে খুশি আমার টাকার জন্য নয়, আমাকে সে যে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পেরেছে তার জন্য। অপর সবার ক্ষেত্রেও তার ভালবাসার আচরণ এমনিই...

সে মুহূর্তের মধ্যেই আমার ভিতর ঢুকে পড়ল এবং তার পা দিয়ে আমার পা আটকে ধরল

আমার জীবনে এমন যদি কিছু থাকে যা আমার চরিত্রকে উত্তমরূপে প্রকাশ করে তবে সেটি হবে সেই বৈশিষ্ট্যটি যা আমি এখন বিবৃত করব। আমার এই বই লেখার উদ্দেশ্যকে আমি এই মুহূর্তে যেমন গভীরভাবে স্মরণ করছি, তাতে আমার বর্তমান বর্ণনা কোনও সংকোচ বা বাধাকেই গ্রাহ্য করবে না। পাঠক আপনি যেই হোন না কেন, আপনি যদি একটা লোকের অন্তরাত্মাকে যথার্থভাবে জানতে চান তবে সামনের গোটা দুই পৃষ্ঠা পাঠ করার সাহস যেন আপনি ইতোমধ্যে সংগ্রহ করে থাকেন।

মেয়েটার ঘরে আমি ঢুকে পড়লাম– যেন মেয়েটার মধ্যে আমি ভালবাসার স্বর্গ আবিষ্কার করে ফেলব, এমন বিশ্বাস আমার ছিল। মেয়েটাকে আমি দেখলাম : আমি কল্পনা করলাম মেয়েটার দেহে সুন্দরের স্বর্গ আছে এবং যদি আমি কিছু হারাই সেই ভয়ে তাই আমি বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে তার দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমি ভাবছিলাম এই মেয়েটা সুন্দর এবং সৌন্দর্যের সেরা। সে যেমন উদার তেমনি সুন্দর। পৃথিবীর সুন্দরতম পুরুষ তার দাস বৈ আর কিছু হবে না। অথচ মেয়েটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল কী অসীম করুণার পাত্রী। রাস্তার মেয়ে। যে কোনও পুরুষের কাছে বিক্রিত হওয়ার জন্য সে আকুল। একটু আগে সে ছিল কোনও একটা ব্যবসায়ীর অঙ্কে। আমার ওপরও সে ঝাঁপ দিল। যদিও সে জানত আমি ধন-ঐশ্বর্যের মালিক ছিলাম না। আমার মান মর্যাদা সম্পর্কে সে কিছুই জানত না, তবু কোনও কিছুর চিন্তা না করে সে আমার বাহু বন্ধনে ধরা দিল। তার নির্বাধ আচরণটাই আমাকে বিস্মিত করল। এমন কেন হলো। হয় আমার আত্মা মেয়েটার ব্যাপারে আমাকে একটা মূর্খে পরিণত করে ফেলেছে, নয় আমার সকল সৌন্দর্যবোধকে বিনষ্ট করে ফেলেছে, কিংবা কোনও অজানা মন্ত্র আমার আত্মার মধ্যে ঢুকে একটা ঘৃণ্য মেয়ের বন্ধনে আমাকে আবদ্ধ করে ফেলেছে। আমার আত্মার দুর্বলতাকে আমি অন্বেষণ করতে লাগলাম। কিন্তু তাতে কোনও ফল হলো না। এই মেয়েটার সঙ্গে সহগামীতে যে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারি তাও আমি ভুলে গেলাম। আমারই বরং চিন্তা জাগল আমি মেয়েটার উপযুক্ত হব তো? আসলে আমি যে মেয়েটার জন্য অনুপযুক্ত এমন চিন্তা আমার মনে আদৌ ঢুকল না। মেয়েটার জন্য আমার এমন কল্যাণ চিন্তা বরং মেয়েটার দুর্দশার চিন্তায় আমার চোখে পানি এনে দিল। আমার আচরণে, জুলিয়েটাও (মেয়েটার এই নামই ছিল) যেন অভিভূত হয়ে পড়ল। ঘরের আরশিতে সে নিজেকে ভাল করে দেখল এটা বোঝার জন্য, আমার এমন আচরণের কারণ কী। সে কি তার সৌন্দর্যের কোনও ঘাটতির জন্য? তার সামনের আরশিতে তার চোখে আমার চোখের জলও বোধ হয় ধরা পড়ল। মেয়েটা যেন বুঝতে পারল তার সৌন্দর্যের অভাব আমার এমন অদ্ভুত আচরণের কারণ নয়। আমি মেয়েটাকে আমার কোলে তুলে নিলাম। যেন সে অসুন্দর নয়, যেন সে একটি দেবী। আমি নিজের মধ্যে কোনও ত্রুটি খুঁজে পেলাম না। অথচ মেয়েটা দেখতে যথার্থই একটা ডাইনিবৎ ছিল। তবু মেয়েটাকে আমার বাহুর মধ্যে ধরে রাখলাম। ওকে ডাইনি বলে সম্বোধনও করলাম। মেয়েটা তাতে রাগ না করে খুশি হলো। হাসতে লাগল এবং খুশিতে নাচতে লাগল। তার নাচুনি সত্ত্বেও আমার ভালবাসার কোনও ঘাটতি হলো না। তবু একথাও ঠিক আমার আচরণের অস্বাভাবিকতা মেয়েটা যেন ধরতে পারল। শেষপর্যন্ত দেখলাম মেয়েটা তার পরনের কাপড় পারিপাটি করার চেষ্টা করল এবং বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এবার আমিও মেয়েটার পাশে গিয়ে একটু দাঁড়ালাম। ওর পাশে বসার চেষ্টা করলাম। মেয়েটাকে দেখলাম মেয়েটা আমার পাশ থেকে একটু সরে বসল। দেখলাম মেয়েটা একটা কোচে বসল। আবার বসা থেকে সে উঠে দাঁড়াল, নিজেকে পাখা দিয়ে হাওয়া করল এবং আমার কাছে ঘেঁষে বলল : বাপু, তুমি মাইয়া মানুষ ছাড়। মাইয়া লোকের বদলে নিজের অঙ্ক পাঠে মন দাও। আমি তাকে ছেড়ে আসার পূর্বে মেয়েটাকে বললাম, কাল একবার আসি, সে তার মুখে একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়ে বলল, কাল না, পরশু এসো। আগামীকাল একটু বিশ্রাম কর। তার কথা মতো পরের দিনটা আমি বাদই দিলাম। পরের দিনটা আমাকে ছটফট করে কাটাত হলো। আমার মনে মেয়েটার সৌন্দর্যের চেয়ে মেয়েটার নম্রতা ভেসে উঠতে লাগল। মেয়েটার আচরণে কোনও অসৌজন্যতা ছিল না। কোনও খারাপ আচরণ ছিল না। তাই আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটাকে আদৌ খারাপ ভাবতে পারলাম না। আমি নিজের আচরণের দিকে চেয়ে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। মেয়েটার কাছে যাওয়ার যে ভাগ্য পেয়েছিলাম, সেই ভাগ্যকে আমার এমন আচরণে নষ্ট করলাম। নিজেকে ধিক্কার দিলাম : আমি এমন খারাপ কেমন করে হলাম? আমি কেবল ভাবতে লাগলাম আমার কৃত এমন অপরাধের পরিশোধ আমি কেমন করে করি? আসলে মেয়েটা তো আমার জীবনে সবচাইতে মমতাময় একটি সুন্দর মুহূর্তকে সম্ভব করেছিল। অথচ আমি কীভাবে সময়টাকে ব্যবহার করলাম। আমি কেবল ভাবতে লাগলাম, কেমন করে আমার দুর্ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করি। ও আমাকে একদিন পরে যেতে বলেছিল। আমি কোনওরকমে দিনটা কাটালাম। তারপরই প্রায় ছুটে গিয়ে ওর ঘরে উপস্থিত হলাম। আমি জানি না আমাকে ফিরে পেয়ে সে কতখানি খুশি হয়েছিল। আমি নিজের মনে কেবল ভাবতে লাগলাম কেমন করে ওর প্রতি আগের সত্যকার আত্মাকে প্রকাশ করব।

কিন্তু আমার কোনও কিছুই প্রকাশ করা লাগল না। যে লোকটিকে আমি আগেভাগে যাব বলে খবর পাঠিয়েছিলাম, সে ফিরে এসে বলল : মেয়েটা আগের রাতেই বাসা ছেড়ে ফ্লোরেন্সের দিকে চলে গেছে। এখন আমার দৃষ্টি দিয়ে বুঝলাম যথার্থই আমি ওকে কী ভালই না বেসেছিলাম। একেই বলে মূর্খের ভালবাসা। মূর্খের ভাল এমন মূর্খের মতোই হয়? মূর্খের কাছে বিনয় আর মমতার কী মূল্য? এই ঘটনার দুঃখ আমার জীবনে আর বিস্মৃত হতে পারিনি। যদি মেয়েটাকে আবার পেতাম তাহলে আমি বিশ্বাস করি ওর মন থেকে আমার আচরণের গ্লানি আমি দূর করে দিতে পারতাম। আমি আবার সেদিনের আচরণের জন্য দুঃখবোধ করি। ও আমার আচরণে যে দুঃখবোধ নিয়ে গেল তার পরিশোধের কোনও সুযোগ আমি পেলাম না। এটাই আমার দুঃখ। আমি ওকে আমার আচরণ দিয়ে বুঝতে পারলাম না, আমি ওকে ঘৃণা করিনি। আমি ওকে যথার্থই ভাল বেসেছিলাম।

আমি যখন মেয়েটাকে আমার বুকের মধ্যে পেয়েছিলাম, তখন যদি ওকে যথার্থই ভালবাসতে না পেরে থাকি এখন মেয়েটা যখন আমার আয়ত্তের বাইরে হারিয়ে গেল তখন তাকে ভালবাসার জন্য আমার মনে হাহাকার জেগে উঠল। আমার এই মূর্খ দু:খের বোধ আর আমি এ জীবনে বিস্মৃত হতে পারলাম না। আহা, কী বিনয়ী ছিল মেয়েটা। এমন দৃষ্টিতে যখন আমি ওকে দেখেছিলাম, তখন এই বোধটা আমার থাকলে আমি ওর প্রতি এমন আচরণ করতাম না। আমি সত্যকার ভাবে ওকে ভালবেসে বুঝতে পারতাম আমি আসলে খারাপ লোক নই। কিন্তু এখনতো আর কোনও প্রতিশোধের উপায় নেই। আমার প্রতি যে ঘৃণাপূর্ণ মন নিয়ে মেয়েটা আমার কাছ থেকে আমার এমন আচরণের কারণে হারিয়ে গেল এখন কোনওভাবেই তো আমার এই অপরাধের কোনও প্রতিশোধ আমি করতে পারব না।

আমার এই জীবনের এই দু'টি কাহিনীর কথা আমার পাঠকদের শোনালাম। যে আঠারটা মাস আমি ভেনিসে ছিলাম সে সময়টাকে এর অধিক আর কিছু আমার বলার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, ভালবাসার চেষ্টা যে আমি না করেছি তা নয়। ক্যারিওর কথা বলতে পারি। তারও মেয়েলোকের ওপর লোভের সীমা ছিল না, তারও লোভ থাকত অন্যের হাতের মেয়েলোকের ওপর : অপরের কোনও একটাকে সে নিজের মালিকানাতে রাখতে চাইত। সে আমাকে একবার বলেছিল, এস আমরা দু'জনে একটা ভাগ করে লই। কিন্তু বহু খুঁজেও এমন একটাকে পেলাম না যেটাকে দু'জনে ভাগ করে ভোগ করতে পারি।

একবার একটা এগার কিংবা বার বছরের মেয়ে যোগাড় করেছিল। মেয়েটার নির্মম মা মেয়েটাকে কারোর কাছে বিক্রি করে দিতে চাচ্ছিল। আমরা দু'জনেই মেয়েটাকে দেখতে গেলাম। সে দেখতে বেশ সুন্দরী ছিল। একটি অল্প বয়সের মেষ শাবকের মতো মেয়েটা নরম ছিল। কিন্তু তাকে কেউ ইটালির মেয়ে বলে বোধ করতে চাইত না। ভেনিসের খাই খরচ তেমন বেশি ছিল না। আমরা মেয়েটার জন্য ওর মাকে কিছু টাকা দিলাম। মেয়েটার থাকার জন্য একটা জায়গারও ব্যবস্থা করলাম। মেয়েটার গানের গলা বেশ ভাল ছিল এবং মেয়েটাকে গান শেখাবার জন্য একজন মাস্টারও যোগাড় করলাম। এসবের জন্য আমাদের মাসে ফরাসি দুই সিকুইনস-এর অধিক লাগত না। অন্য খরচ কমিয়ে আমরা হাতে কিছু টাকাও জমিয়ে ফেললাম। কিন্তু মেয়েটাকে ভোগ করার জন্য আরও সময়ের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হলো। মেয়েটাকে দেখে আমার ভাল লেগেছিল। যেমন সুন্দর তেমনি একটি মেষ শাবকের মতো নরম। যাই হোক দেরি হলেও আমরা রাজি হলাম। মেয়েটা একেবারেই বাচ্চা। বাচ্চাটার সাথে আমরা খেলা করতাম। কিন্তু মেয়েটাকে ভোগ করতে অধিকতর সময় আমাদের ব্যয় করতে হবে তাতে আমরাও অশান্ত হয়ে উঠছিলাম। আসলে আমরা যখন কোনও একটা মেয়েতে আসক্ত হয়ে পড়ি সেটা যতটা না যৌন আচরণের জন্য, তার অধিক মেয়েদের সঙ্গে একটা নৈকট্য লাভের অনুভূতির জন্য। মেয়েটার নাম ছিল অ্যানজোলেটা। কিন্তু মেয়েটার সাথে আমার আচরণে যতটা না যৌন তৃষ্ণা প্রকাশ পেত তার প্রতি আমার পিতৃস্নেহ অধিক প্রকাশিত হতো। আমি মেয়েটাকে আমার মেয়ের মতো ভালবাসতে লাগলাম। ফলে মেয়েটা যত বড় হতে লাগল, যৌন আকর্ষণে এবং যৌন আচরণের চাইতে তার প্রতি আমার পিতৃস্নেহসুলভ আচরণই প্রকাশ পেত। আমার সঙ্গীর অজান্তেই মেয়েটার সঙ্গে তার ব্যবহার আমার মতো হতে লাগল। আমরা দু'জনেই মেয়েটার সঙ্গে যৌন মিলনের কামনার চাইতে ছোট্ট একটি মেয়ের সঙ্গে খেলা করার ভাব দেখাতাম।

ফলে আমরা উভয়ই ওকে আমাদের একটি ছোট মেয়ের মত দেখতে লাগলাম। কাম এবং ভোগের বস্তু হিসেবে নয়। একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে খেলাধূলার আকর্ষণ এবং আনন্দই আমাদের বেশি ছিল। তাই তার কোনও ক্ষতি করার চাইতে, কোনও ক্ষতি থেকে তাকে রক্ষা করার বোধটিই আমাদের মধ্যে প্রবল হতে লাগল।

সমাজের এই অবস্থা আমার মনে ঘৃণার জন্ম দিল। চলতি সমাজ ব্যবস্থা আসলে সত্যিকার ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করে দেয়। চলতি সমাজ ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য হলো সব সততাকে বিনষ্ট করে দুর্বল অত্যাচারীর ওপর সবল অত্যাচারীর কৃত অপবাধকে ন্যায্য বলে তুলে ধরা। তার ফলে সমাজ ব্যবস্থা মূলেই ধসে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার আমরা যেখানে এলাম সেখানে একজন নতুন মালিকের দেখা পেলাম। এ মহিলা তার নিজের কাজের সুবিধার জন্য গ্রাম থেকে একটি মেয়েকে জোগার করে এনেছিল। এর বয়স ২২ কি ২৩-এর মতো ছিল। এই মেয়েটি বাড়ির মালিকের মতো আমাদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করত। এই মেয়েটির নাম ছিল থেরেসি লা ভাসিউর। একটি সম্মানজনক পরিবার থেকে এসেছিল। তার বাবা একটা অফিসে কাজ করত, তার মা একটি ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ওদের পরিবারের আকারটি বৃহৎই ছিল। কিন্তু বাবার অফিসটি বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। ফলে তারা তিনজনেই জীবন ধারনের উপায় বার করার জন্য প্যারিস শহরে এসে উঠল। মেয়েটি, তার মা এবং বাবা এই তিনজনে কোনওক্রমে সংসার চালাত।

এই পরিবারের মেয়েটির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে প্রথমে ওদের খাওয়ার টেবিলে। আমার প্রথম দর্শনেই মেয়েটিকে আমার ভাল লেগেছিল। এ যেমন সুন্দর তেমনি সে কথায় এবং আচরণও বেশ সুন্দর ছিল। মেয়েটিকে সবদিক দিয়ে আমার কাছে তুলনাহীন বলে বোধ হলো। এই সঙ্গটির মধ্যে কেবল আমিই ফরাসি বলতে পারতাম। আমি দেখলাম মেয়েটার ওপর দলের অন্য লোকেরও দৃষ্টি পড়েছিল। আমাদের এই দলের গিন্নীর আচার-আচরণও তেমন ভাল ছিল না। সৎ ব্যবহারের দিক দিয়ে আমিই বোধহয় একমাত্র ভদ্র কিসিমের ছিলাম। বাকি সকলে মেয়েটাকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করত। মেয়েটির প্রতি ওদের আচরণ দেখে আমি যেই মেয়েটির পক্ষ নিলাম, অমনি ওরা আমার বিরুদ্ধে লাগল। আমি মেয়েদের প্রতি আচরণে সব সময়ই ভদ্র ছিলাম। কাজেই এই মেয়েটিকে অপরে হয়ত মিশ্রভাব হতে দেখে আমি মেয়েটাকে ওদের আচরণ থেকে রক্ষা করার ভূমিকা গ্রহণ করলাম। আমি দেখলাম আমার এমন সহানুভূতিপূর্ণ আচরণে মেয়েটা আমার প্রতি খুশি হলো। আমি দেখলাম আমার প্রতি সে তার মনের ভাব প্রকাশ করার সাহস পাচ্ছে না। তাতে মেয়েটিকে আমার আরও ভাল লাগল।

আমার দিকে চাইতে ওর চোখ মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠত। আমারও নিশ্চয়ই তেমনি হতো। আমাদের উভয়ের এই ব্যবহারে কোনও গোপনতা ছিল না। বাড়ির গিন্নীর চোখে আমাদের এই ব্যাপারটা এড়াল না। ফলে গিন্নী আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। গিন্নীর এমন রূঢ় ব্যবহারে আমার প্রতি মেয়েটির আকর্ষণ যেন বৃদ্ধি পেল। মেয়েটাকে সঙ্গ দেয়ার আর কেউ ছিল না। ফলে মেয়েটা চাইত না যে আমি ওকে ছেড়ে বাইরে যাই। কিংবা গেলেও আমি যেন তাড়াতাড়ি ওর কাছে আবার ফিরে আসি। এই ছিল ওর আচরণের ভাবটি। ফলে মেয়েটা যেন আমার মধ্যে তার একমাত্র একজন রক্ষককে আবিষ্কার করতে পারল। আমি একবার প্রকাশ্যে ওর কাছে বলে ফেললাম, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। তার প্রকট ভয় ছিল এরূপ যে সে আমার কাছ থেকে যা আশা করে আমি তাকে দিতে পারছিনে। তার এই ভয়ের জন্য আমার মনেই বেদনা জাগতো বেশি। আমার সঙ্গে মিলনের পূর্বে তার আচরণে সে তার নিজের মনের বেদনার কথা প্রকাশ করতে চাইত। ওর এমন আচরণের কারণ আমি অনুধাবন করতে না পেরে মনে করতাম হয়ত মেয়েটার মনে আমার চাইতে অপর কারোর প্রতি অধিকতর ভালবাসা আছে। অথচ ওর সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর ওপর এমন বিচারের অধিক অন্যায় বিচার আর কিছুই হতে পারে না। এই মনোভাব থেকে ওর জন্য আমার মনের বেদনা আরও বৃদ্ধি পেত। আসলে আমাদের কেউ অপরকে বুঝতে পারতাম না। তার মনে হতো যে আমি আসলেই পুরো একটা পাগল এবং আমাকে ওর কী ভাবে দেখতে হবে এটা ও বুঝতে পারত না। পরে আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারলাম। একদিন ও চোখের পানিতে বলল: আমার ছোটকালে একটা বদলোক আমাকে বলাৎকার করেছিল। আমি যখন ওর অবস্থা বুঝতে পারলাম তখন আমি আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম : তুমি আমার লক্ষী মেয়ে! আমি বললাম, তুমি দুঃখ করো না। প্যারিস জায়গাটা খারাপ নয়। তোমার বিশ বছর বয়সে তোমার জন্য একজনের ভাল লাগতে পারে। তাতে অন্যায় কিছু নেই। তুমি আমার প্রিয় থেকো। আমি তোমাকে পেয়ে আমার জীবনের ভালবাসাকে পেয়েছি। এমন ভালবাসার কথা আমি জীবনে চিন্তা করতে পারিনি।

আমার এই জীবনের গ্রোড়াতে একটি মেয়েকে মনে করতাম একটা খেলার পুতুল বলে। এই ঘটনার পরে আমি দেখলাম, একটা মেয়েকে আমি আগে যদি একটা ভোগের দ্রব্য বলে মনে করতাম, আমার কী ভাগ্য যে, আমি এখন যথার্থ একটি সঙ্গীনিকে লাভ করেছি। এই মহৎ মেয়েটির সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা আমি লাভ করলাম, তখন ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করে আমি দেখলাম যে, এই মেয়েটি আমাকে যথার্থ সুখের সন্ধান দিয়েছে। আমি এতদিন মেয়েদের কাছে যে কামনা পোষণ করতাম তার জায়গাতে আমি যে যথার্থ ভালবাসার আবিষ্কারে সক্ষম হলাম। শুধু মেয়ে লোক নয়, আমি উপলব্ধি করলাম আমার প্রয়োজন একজন যথার্থ সঙ্গী। এক কথায় যে আমাকে নিয়ে এতদিন আমি অভিভূত ছিলাম, তার স্থানে আমার প্রয়োজন একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী। যার মধ্যে যেমন আমি আনুগত্য লাভ করতে পারব, তেমনি লাভ করতে পারব মমতা। আমার নিজেকে পর্যবেক্ষণ করলাম। আমি যখন একাকী থাকতাম এবং চিন্তা করতাম তখন মনে হতো আমার ভেতরে যেন একটা শূন্যতা বিরাজ করছে। আমার মনে হতো আমার এই রকম অন্তর যেন আমি আর এক জনের মধ্যে লাভ করতে পারি। তাহলেই আমরা দু'জনে এক অনুভূতির হব : আমরা দু'জনে একজন হয়ে যাব। আমার ভাগ্যই আমারে আমার আকাঙ্ক্ষিত দ্বিতীয়

থেরেসিকে উন্নত করার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্ত্বা থেকে পৃথক করে ফেলেছে। সেই বিচ্ছেদের বেদনাই আমার মধ্যে জাগে। এক দ্বৈতসত্তার বোধ আমাকে কাঁদায়, থেরেসি মেয়েটার মধ্যে যেন আমি আমার আকাঙ্ক্ষাকে লাভ করেছিলাম। থেরেসিকে আজও আমি ধন্যবাদ জানাই। বাস্তব পরিস্থিতিতে যতটুকু সম্ভব থেরেসি আমার সে অভাব পূরণ করে দিত। ওর সঙ্গে আমি যতদিন ছিলাম আমি যথার্থই সুখী ছিলাম। আমি ওর মানসিক বোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করলাম। ও গুণতে জানত না আমি তার চেষ্টা করলাম। ও অক্ষর চিনত না, ওকে আমি অক্ষর চেনাবার চেষ্টা করলাম। হয়ত আমি তাতে সফল হতাম না। তবু ওকে উন্নত করার চেষ্টা আমার একটা কাজ হয়ে দাঁড়াল। আমি যখন বাড়ি বদল করে আর একটাতে গেলাম তখন দেখলাম আমার এই নতুন বাড়ির জানালায় বিপরীত দিকে একটা দেয়াল ঘড়ি আছে। সে ঘড়ি দিয়ে ওকে সময় গণনা না করার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। কিন্তু তেমন ব্যর্থতাতে আবার সুখ ছাড়া দুঃখ হতো না। আমি বুঝতাম যে ক্ষমতা ওর নাই তা আমি কেমন করে সৃষ্টি করব। ওকে টাকা পয়সা গণনার কায়দাটাও আমি শেখাতে পারলাম না। বারের নাম শেখাবার চেষ্টা করলাম। তাতেও আমি সক্ষম হলাম না। ও যে শব্দ করতে পারত না, তা নয়। কিন্তু আমি দেখতাম ও যা বুঝতে চায় ও তার বিপরীত শব্দ ব্যবহার করে। যা ওকে বুঝতে আমাকে সাহায্য করত না।

থেরেসি যে সব শব্দ উচ্চারণ করত, আমি একবার তার একটা অভিধান বানালাম। আমি দেখলাম, তার বোধবুদ্ধি যাই থাকুক বা না থাকুক, সে আমার বিপদে-আপদে যে পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করত তার সেই চেষ্টাই ছিল আমার বুদ্ধির অধিক যথার্থ। আর তাই আমি বলি ওকে যতো মূর্খই আমি মনে করতাম না কেন ওর আত্মার গভীরে এমন একটা নির্বাস চেতনা ছিল যে চেতনা দিয়ে সে আমার মঙ্গল কামনা করত এবং যথার্থ সুপরামর্শ দিতে সক্ষম হতো।

যাকে আমরা খ্রিস্টীয় নৈতিকতা বলে অভিহিত করি তার যদি অস্তিত্ব নাও থাকত তবু আমি মনে করি আমার এই সরল মেয়েটি যার নাম থেরেসি, সে খ্রিস্টীয় নৈতিকতার সবটাই সে পালন করত। সে তার আচরণে আচরণে অজানিতভাবে খ্রিস্টীয় নীতির প্রত্যেকটিই পালন করত।

কাজের মধ্যে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয় সেগুলোর ব্যাপারে তার কোনও অমান্যতা ছিল না।...তবে তার সব নৈতিকতার লক্ষ্য ছিল, মলিয়ে দ্য অ্যাভেলকে খুশি করা। সে একই দিনে ২০টা পুরুষের শয্যা সঙ্গিনী হতে পারত, তাতে তার বিবেকের কোনও দংশন ঘটত না। আমি এমন সব ধর্মীয়পুরুষকে জানি যারা এ বিষয়ে এর চাইতে অধিক কোনও বিবেকবোধে বিদ্ধ হয় না। থেরেসির ব্যাপারটা ছিল...

আমরা যখন আমাদের ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে মিলিত হই, তখন আমাদের অনুভূতি কেবল যে আমাদের মনকেই নিয়ন্ত্রণ করে তা নয়, আমাদের অনুভূতি আমাদের হৃদয়কেও স্পর্শ করে। থেরেসির সঙ্গে আমার ভালবাসার সম্পর্ক আমার কলপনারও অধিক বলে আমি মনে করতাম। মানুষের মধ্যে ওকে আমি অতিমানুষ বা জিনিয়াস বলে গণ্য করতাম। আমার সারা জীবনটাই আমি ওর সঙ্গে কাটাতে পারতাম। এক বিকেলে আমি ঘরে ঢুকে একটি পত্র দেখতে পেলাম।...

আমি এর আগে কিছু বই কেনার কথা বলেছিলাম। এর মধ্যে কিছু বই আমি পড়েও ছিলাম। অবশ্য তাতে আনন্দের চাইতে আমি পরিশ্রম বোধ করেছি বেশি। পৃথিবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে আমার ভুল ধারণার ফলে আমি মনে করলাম যে, আমার সংগৃহীত বই এর কোনও একটিকে যথার্থভাবে বুঝতে হলে আমাকে বুঝতে হলে, যে-বই আমি পাঠ করেছি সেই বই-এর লেখক বিশ্ব সম্পর্কে কোন্ ধারণার ভিত্তিতে এমন তিনি রচনা করেছেন। কাজেই এর কোনও একটি বইকে বুঝতে হলে সে বই-এর মূল ভিত্তিকে আমার বুঝতে হবে। যে বইটি আমি পড়ছি তার লেখক নিজেও যে তার বইতে উল্লিখিত সত্যসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ এমন কথা আমি ভেবেছি, তেমন হয়ত নয়। তবু তাকেও যে নানা বই থেকে তার বিশ্বাসকে সংগ্রহ করতে হয়েছে, এ বিশ্বাসে আমার পৌঁছা ছাড়া উপায় থাকেনি। এটা আমার মূর্খতা হতে পারে। তবু একখানার মূল উদ্ধার করতে কেবল দশখানা নয় আমাকে দশ দশটা তথা ১০০টা গ্রন্থাগার আমাকে তছনছ করতে হয়েছে। এই পাঠ পদ্ধতির ফলে আমাকে কেবল যে সময় নষ্ট করতে হয়েছে তাই নয়। এমন পরিশ্রমে দশ পৃষ্ঠা শেষ করার আগেই আমার মাথা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। আমার এমন পদ্ধতি ছিল দস্তুর মতো মূর্খতা বিশেষ। ফলে বই-এর রাজ্যে আমাকে এক বই থেকে অপর আর এক বইতে ছুটতে হয়েছে। তবু পাঠের এমন পদ্ধতি আমি পরিত্যাগ করতে পারিনি। এমন মূর্খতার ফলে আমি কোনও কিছুর জ্ঞানই অর্জন করতে পারছিলাম না। ভাগ্য ভাল এক সময় আমি এমন মূর্খতার নিষ্ফলতাকে বুঝতে পেরে ওই পদ্ধতি আমি পরিত্যাগ করতে সক্ষম হলাম।

আসলে পরিশেষে আমি বুঝতে পারলাম যে, কেউ যদি কিছু শিখতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমে এটা বুঝতে হবে যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি অপরটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই সংশ্লিষ্টতাই তাকে একটি থেকে আর একটিতে আকৃষ্ট করে। একটি জ্ঞান আর একটির জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে। মোটকথা তাকে এটা বুঝতে হবে জ্ঞানের রাজ্যে কোনও একটি জ্ঞান অপর একটি জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, কারোর পক্ষে সমগ্র বিষয়ের জ্ঞানকে আয়ত্ত করে সম্ভব নয়। তাকে কোনও একটি নিয়েই শুরু করতে হয়। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে যদি তার সংশ্লিষ্টতার বিশ্বাস না থাকে তবে দেখা যাবে যে পাঠক যা নিয়ে শুরু করেছে সে বিষয়টির ব্যাপারেও সে একেবারে অন্ধকারে ডুবে আছে। আমি বুঝতে পারলাম আমার লক্ষ্য বা ইচ্ছাটা খারাপ নয়, কিন্তু আমার শিক্ষার পদ্ধতিটি আমাকে পরিবর্তন করতে হবে।

এবার যথার্থই আমি আমার পদ্ধতি পাল্টালাম। এবার শুরুতে আমি এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ ধরে শুরু করলাম। আমি অনুভব করলাম, সব এক সাথে শুরু না করে বিষয় হিসেবে আমাকে জ্ঞানের রাজ্যকে বিভক্ত করা উচিত নয়। এবার আমি তাই এক একটি বিষয় ধরলাম। আমি বুঝলাম, আমি যে বিষয়টি ধরেছি, তার শেষ না দেখা পর্যন্ত আমার কোনও বিষয়ান্তরে যাওয়া উচিত নয়। এভাবে আমি বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারটি কিছুটা ধরতে পারলাম। এবার জ্ঞানের জায়গাতে আমার অবস্থান হলো ধ্যানের ক্ষেত্রে। আমার এই চিন্তাটা আমাকে বেশ পরিমাণে সাহায্য করল। এবার আমি বুঝলাম আমি বাঁচি কিংবা মরি, সময় নষ্ট করার কোনও সময় আমার নেই। না, আমি দমিত হলাম না। এ কথা আমি বুঝলাম ২৫ বছর বয়সেও আমি যথার্থই কিছু জানিনে। তবু আমাকে জানতে হবে, সবকিছুকে জানারই আমার ইচ্ছা থাকতে হবে। তার পরিণতি তাতে আমার জন্য যাই হোক না কেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পদ্ধতির অনুসরণে আমি যথার্থই লাভবান হলাম। এবার আমি আমার সময়ের বৃথা ব্যয় না করে, আমি এবার আমার সময়ের সদ্ব্যবহার করতে শিখলাম।...

এবার আমি দেখলাম, কোনও একটাতে অনির্দিষ্টকাল আছে থাকার পরিবর্তে বিষয়ের পরিবর্তন আমাকে কোনও একটাতে আবদ্ধ থাকার একঘেয়েমি থেকে যেন মুক্তির পথ নির্দিষ্ট করে দিল।

এতদিন যখন আমি কোনও একজন লেখকে আবদ্ধ থাকতাম তখন একটু পরেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম।

এবার দেখলাম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করার আমার এ এক লাভ হলো যে; কোনও একটা বিশেষ বিষয়ে আবদ্ধ থাকার ক্লান্তি থেকে যেন আমি মুক্তি পেলাম। আমার পাঠের পদ্ধতির এই পরিবর্তন আমাকে উৎসাহিত করল। এবার বাড়ির বা বাগানের কাজকর্মকে যেন আমার পাঠের অংশ হয়ে দাঁড়াল। আবার আমার পাঠের আগ্রহ যত বৃদ্ধি পেল, আমি পড়াশোনার জন্য অধিকতর সময় ব্যয় করার কৌশলও আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়ে উঠতে লাগলাম।

আমার পাঠের এই যে খুঁটিনাটি আমি আমার পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। আমি জানি আমার পাঠকবৃন্দ এতে বিরক্ত না হয়ে পারেন না। আর সব যে খুলে বলছি, তাও নয়। কিছুটা রাখঢাক আমাকে করতেও হচ্ছে। আর যা আমি বলছিনে তার যদি একটু উল্লেখ আমি না করি তাহলে আমার পাঠকরা আদৌ বুঝবেন না যে আমার গোপন করারও কিছু আছে। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, আমি যখন কোনও কারণে আমার পুস্তকাদি পাঠ একেবারে বন্ধ করে দিতাম সেই সময়টায় যে যন্ত্রণা আমি বোধ করতাম, এমন যন্ত্রণার তুলনা আমার জীবনে আর আমি খুঁজে পেতাম না। আমার জীবনের এই পর্যায় যেভাবে আমার সময়কে ভাগ করে ব্যয় করতাম, আমার সেই কৌশলকে আজ স্মরণ করতে আমার মনে অপার আনন্দের সঞ্চার হচ্ছে। আমার মনে কোনও কারণে আমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেলে আমার মনে এমন অলসতা আর আবদ্ধতা এবং একঘেয়েমির একই বোধ সৃষ্টি হত যার তুলনাও আমার জীবনে খুব কমই খুঁজে পেতাম। এমন পর্যায়েই আমার শরীর ভেঙে পড়ত সবচেয়ে বেশি। আমার জীবনের নিজস্ব ধারাকে অনুধাবন করার চেষ্টায় মাঝে মাঝেই দুই মাস এমন কি তিনমাসও নষ্ট হয়ে যেত। আমার উল্টা-পাল্টা জীবন যাপনে আমি যে কেবল কষ্টই পেতাম, তাও না। এমন ধারায় আমি যেন জীবনের অজানা আর একটা দিককে ভোগ করে আনন্দও লাভ করতাম। কাজেই কেবল কষ্ট নয়, একটা বিশেষ আনন্দময় সামাজিকতাবোধও যেন আমি আমার এমন উল্টাপাল্টা জীবন-যাপন থেকে লাভ করতাম। আমি মনে করতাম আসলে জীবনটা যথার্থই এত খারাপ নয়, যতটা খারাপ আমি মনে করি। আর তাই বলি শেখার কষ্টকর চেষ্টাও আমার বিত্রস্ত জীবনকে আনন্দে পূর্ণ করে তুলত।

আমার এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা এবার বরং বাদ দিই। এদের বাদ দেয়া ছাড়া আমার উপায়ও নেই। কারণ এগুলো প্রকৃতিগতভাবেই অবর্ণনীয় রূপে সরল ছিল। আসলে জীবনের যথার্থ আনন্দ একেবারেই অবর্ণনীয়। এটা কেবল যার জীবন সেইই উপলব্ধি করতে পারে। অপর কেউ নয়। আর এই উপলব্ধির প্রকৃতি যত শক্তিশালী হয়, তাকে বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার পক্ষে বটেই, ভুক্তভোগী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপর যে কারোর পক্ষেই বর্ণনার অতীত এবং আর কিছু নয়। আমি নিজে এমন অনুভূতিকে যেমন বিস্মৃত হতে পারিনে তেমনি যতবার ইচ্ছা ততবার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে মনের মধ্যে তুলেও আনতে পারিনে। শেষপর্যন্ত যখন দেখলাম আমার পরিবর্তনশীল এমন বোধ ক্রমান্বয় একটা নির্দিষ্ট আকার যেন লাভ করছে, তখন আমার জীবনের সময়ের বিভাগটাকে আমি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করতে পারি। প্রত্যেক দিন সকালে সূর্য ওঠার আগে আমি শয্যা ছেড়ে উঠতাম এবং কাছের একটা বাগানের আঙ্গুর বাগানের মধ্য দিয়ে চেম্বারি বলে অভিহিত পার্বত্য জায়গাটিতে উঠতাম। সেখানে উঠে আমি আমার প্রার্থনার কাজ সম্পন্ন করতাম। আমার সে প্রার্থনা কেবল আমার ওষ্ঠদ্বয়ের সঞ্চারণে সীমাবদ্ধ থাকত না। আমার প্রার্থনা নিবেদিত হতো স্রষ্টা আমার চোখের চারপাশে সৌন্দর্যের যে আকর তৈরি করে রেখেছেন আমার প্রার্থনা নিবেদিত হতো তারই উদ্দেশে। আমি কোনও ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে আমার প্রার্থনা সম্পন্ন করতাম না। তেমন হলে চারপাশের ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র সৃষ্টিসমূহ যেন আমার অস্তিত্ব এবং ঈশ্বর এই দু-এর মধ্যখানে এক ব্যবধানের সৃষ্টি করত। আমার ঈশ্বর বলে যদি কিছু থাকে তবে আমি তাকে তার সৃষ্টির মধ্যেই কল্পনা করতে ভালবাসি। তখন আমার আত্মা আমার সেই ঈশ্বরের প্রতি উদ্বাহু হয়ে যেন উত্থিত হয়। আমি লোক যাই হই না কেন এ কথা বলতে আমার সঙ্কোচ নেই যে, স্রষ্টার প্রতি আমার প্রার্থনায় কোনও কৃত্রিমতা থাকতো না। আর সে কারণে আমি যে কাউকে বলতে পারি আমার প্রার্থনার উচ্চারণকে আবার শ্রবণ করতে হবে। আমার নিজের কথা বলতে যেন, আমার জন্য তেমনি আমার ভালবাসার পাত্রীর জন্য আমার প্রার্থনা অঙ্কিত একটি পবিত্র জীবনেরই কামনা করতাম। একটি পবিত্র এবং প্রশান্ত জীবন। একটি বিশুদ্ধ জীবন সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট, দুষ্টতা, অভাবের আর্তিহীন এক জীবন। আমার প্রার্থনা হতো যেন আমি এবং আমার ভালো পাত্রী দু'জনেই ন্যায়ের জীবনের অন্তিমে পরকাল বলে যদি কিছু থাকে তবে সেখানে গমক করতে পারি। এছাড়া আমার প্রার্থনার মধ্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোনও পার্থিব বস্তু থাকত না। কারণ আমার এই বিশ্বাস ছিল যে, আমার সকলের জন্য যিনি তার দেয়কে দিয়ে থাকেন তা তিনি আমাদের নয়, তা আমরা লাভ করি আমরা তার উপযুক্ত বলে তিনি মনে করেন বলে বাইরের এই প্রার্থনা এবং প্রত্যাবর্তন ঘটত আমার নানা পথে। ফিরে আসার সেই পথেও আমি প্রকৃতি সৌন্দর্যবোধে আমার কোনও শেষ থাকত না। একটু দূর থেকে আমার চোখের অন্বেষণের প্রশ্ন থাকত, আমার মাতৃবৎ আমার মামার দরজাটি খোলা কী-না এবং যদি আমি দেখতাম তার দ্বার উন্মুক্ত তাহলে আর আমার অবধি থাকত না। আমি তাকে লক্ষ্য করে ছুটে যেতাম। তা তার দরজা যদি খোলা না থাকত তবে পেছনের বাগানের মধ্য দিয়ে দেখতে চাইতাম। মামার দরজা তখনও মুক্ত হয়েছে কিনা। তার দরজা না উন্মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আমি সতৃষ্ণ নয়নে তার দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

তার দরজা যখন খুলে যেত আমি তখন ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়তাম? হয়ত তখনও তিনি শয্যায় শায়িত থাকতেন–তবু তার অর্ধমুক্ত চোখ দুটোকে আমার ভালবাসার চুম্বনে ভরে দিতাম। আমার সে চুম্বন ছিল যে কোনও প্রকৃতির ঊর্ধ্বে শ্রদ্ধায় পূর্ণ। আমরা সাধারণত সাদা কফি দিয়ে প্রাতরাশ সমাপ্ত করতাম। তখন আমাদের হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য সময়ের চেয়ে অধিকতর সময় মিলত। আমরা সকলে মিলে গালগল্পে মেতে উঠতাম। এই সময় থেকেই প্রাতরাশের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। তুলনা করলে আমাদের এমন প্রাতরাশ-এর চাইতে ইংল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ডে প্রচলিত প্রাতরাশ উত্তম ছিল। ইংল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ডে সকালের ব্রেকফাস্ট দস্তুর মতো একটা ভোজনের মতো ছিল। এমন খাবার টেবিলে গৃহের সবাই এসে উপস্থিত হতো। এটা আবার ফরাসিদের কায়দার চাইতে একেবারে ভিন্ন হতো। ফরাসিরা সকালের নাশতা যার যার ঘরে বসে একা একা সম্পন্ন করত। অনেক সময়ে ফরাসিদের মধ্যে প্রাতরাশের কোনও প্রথারই প্রচলন দেখা যেত না।

প্রাতরাশের আড্ডার গাল-গল্প শেষ করে আমি আমার পড়ার ঘরে চলে যেতাম এবং সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজ পর্যন্ত আমার সময় কাটাতাম। এই পর্যায়ে আমি আমার পাঠ শুরু করতাম দর্শন দিয়ে। এর মধ্যে থাকত পোর্ট রয়াল-এর লজিক, জনলকের 'এসে' বা নিবন্ধে, লাইবলিজ অথবা দেকার্ত। এদের নাড়াচাড়া করতে করতে আমি দেখলাম, এরা কেউ কারোর সঙ্গে মেলে না : এদের প্রত্যেকে যেন অপর সকলের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে। তাদের এমন পারস্পরিক ভিন্নতা দেখে আমি ভাবতাম, আমি দেখি না এদের সবাইকে আমি ঐক্যবদ্ধ করতে পারি কী-না। আমার এমন চিন্তা আসলে অবান্তরই ছিল আর এমন চেষ্টায় যেমন নিষ্ফলভাবে আমার পরিশ্রম ব্যয় হতো তেমনি আমার সময় নষ্ট হতো। তাছাড়া এর ফলে আমার মাথা ঘুরতে থাকত আর আমি আমার এমন কাজে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হতে পারতাম না। শেষপর্যন্ত আমি আমার এমন চেষ্টা করা ছেড়েই দিলাম। এরপরে বরং আমি একটা ভাল পদ্ধতির সন্ধান পেলাম। এর ফলে আমার তেমন বিদ্যা-বুদ্ধি না থাকলেও আমি নিষ্ফল হলাম না। এ কথা অবশ্য বলার অপেক্ষা রাখে না যে পড়াশোনায় আমার তেমন দক্ষতা কখনই ছিল না। এবার আমার পদ্ধতি হলো সকলকেই আদ্যোপান্ত পাঠ করা এবং কারোর সঙ্গে তর্কাতর্কি বা ঝগড়া-বিবাদ না করা। আমি বরং তাদের প্রত্যেককে আপন আপন বিশ্বাসে বিশ্বাসী থাকতেই উৎসাহিত করতাম, সকল প্রকার বিতর্ক পরিত্যাগ করে। আমার পদ্ধতিটা ছিল এরূপ যেন আমার পুঞ্জিভূত সকল পন্ডিতকে একত্র করে তাদের প্রত্যেককে বলা : হ্যাঁ, আপনারা যে যা বলছেন, সবই ঠিক বলছেন। আসুন আমরা ঝগড়া ছেড়ে দিই এবং প্রত্যেকে প্রত্যেককে স্বীকার করি। আমি তাদের সবাইকে লক্ষ্য করে বলতাম, এতে আমার কী ক্ষতি। আমার এমন পদ্ধতি বা কৌশলের যে সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি বা কৌশলের যে সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল না তা নয়। এ কথা আমি বুঝি। তবু এর লাভেরও একটা দিক তো ছিল। আমার পাঠের একটা গতি সৃষ্টি হতো। কোথাও তো আমি নোঙর গেড়ে বসে থাকতাম না। এর আগে তো কতো পন্ডিতকে আমি পাঠ করেছি, আমি সবাইকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি : অবশ্য তাদের কারোর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক না করে, যুক্তির ক্ষেত্র বিচার না করে।

আমি দেখলাম, আমার আত্মশিক্ষার এই কৌশল বিফল হয়নি। আমার প্রাণের ভাণ্ডার যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাও আমি বুঝলাম। এমন ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে আমার আর অপর কোনও পন্ডিতের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ল না। তারপরে আমার স্বোপার্জিত জ্ঞান ভাণ্ডারকে যুক্তির পাল্লায় পরিমাপ করার চেষ্টা করলাম এবং এদের মধ্যে এবার আমি পছন্দ-অপছন্দতেও দক্ষ হয়ে উঠলাম। কাউকে ভাল বললাম, কাউকে যুক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাল্লা থেকে শ্রেফ ছুড়ে ফেললাম। আমি এই পদ্ধতিতে হিসাব করে দেখলাম, এতে আমার কোনও লোকসান হয়নি। আমার বিশ্লেষণের দক্ষতার কোনও হ্রাস ঘটেনি। আসলে আমার নিজস্ব এই পদ্ধতিটি অনেক আগেই গ্রহণ করা দরকার ছিল। হ্যাঁ, আরম্ভটা দেরিতে হয়েছে। কিন্তু তাতে ক্ষতিটা কী ঘটেছে? এবং আমার এই জ্ঞান ভাণ্ডার যখন প্রকাশ করলাম তখন যে যাই বলুক না কেন, কেউ এমন কথা বলতে পারল না যে অপর কারো চিন্তাকে আমি নকল করেছি বা চিন্তার ক্ষেত্রে কারোর দাসত্বপনা করেছি। আমি পিথাগোরাস হইনি যিনি তার গুরু তথা শিক্ষক থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। তার গুরু যা বলেছেন তিনিও অবিকল তাই-ই বলেছেন।

*

তথ্য সূত্র

১. এমিলি : রুশোর আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এমিলিতে যে বিষয় হচ্ছে শিক্ষার ব্যাপারে রুশোর দর্শন।

২. ইনকুইজিশন : মধ্যযুগের ধর্মীয় বিচার : যার পরিণামে অভিযুক্তকে খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হতো।

৩. SA Angustine (A. D. 354-430) : খ্রিষ্ট ধর্মের সন্ত বা ঋষি।

৪. St. Svegory : খ্রিষ্ট সন্ত বা ঋষি : pope (৫৪০-৬০)।

৫. *এমিলি : শিক্ষার ওপর রচিত রুশোর অপর একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ।*

৬. *Alphens and Arethusa.*

৭. Horace 65-08Bc : খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সমাপ্তিকালে রোমান সাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত, অনূদিত এবং বিশেষভাবে উদ্ধৃত কবি।

৮. রুশো তার এবং মাদামের এই বনবাসের সময়ের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন : ১৭৩৬। রুশোর জন্ম হয়েছিল জেনেভায় ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে। তাই কাহিনীর উল্লিখিত সময়ে রুশোর বয়স ছিল ১৭১২-১৭৩৬।

৯. পিথাগোরাস (৫৮০-৫০০ খ্রি: পূ:) পাইথাগোরাস বা পিথাগোরাস : একজন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক। অঙ্ক এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিকাশে পিথাগোরাসের অনুসারীদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পিথাগোরাসের মতে, বিশ্ব অস্তিত্বের মূল হচ্ছে সংখ্যা।

১০. জ্যাকোবাইট : ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমস-এর সমর্থক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~